বুদ্ধদেব গুহ

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বন্দনা ও বাসুদেব রায়কে

গুণমুগ্ধ বুদ্ধদেব

লেখকের অন্যান্য বই

ঋভু
সাজঘরে, একা
সবিনয় নিবেদন
কোজাগর
বাজা তোরা, রাজা যায়
ধুলোবালি
মহড়া
পারিধী
সোপর্দ
চবুতরা
স্বগতোক্তি
প্রথম প্রবাস
প্রথমাদের জন্যে
লবঙ্গীর জঙ্গলে
জলছবি, অনুমতির জন্যে
আয়নার সামনে
বুদ্ধদেব গুহর শ্রেষ্ঠ গল্প
দূরের দুপুর
দূরের ভোর
জঙ্গল মহল
সুখের কাছে
জঙ্গলের জার্নাল
যাওয়া-আসা
ঝাঁকি-দর্শন
রিয়া
কোয়েলের কাছে
একটু উষ্ণতার জন্যে
বিন্যাস
দু নম্বর
অ্যালবিনো
নগ্ন নির্জন বাতিঘর
মহুলসুখার চিঠি
পারিজাত পারিং

ইলমোরাণদের দেশে
পঞ্চপ্রদীপ
খেলা যখন
ঋভুর শ্রাবণ
টাঁড়বাঘোয়া
গুগুনোগুম্বারের দেশে
মউলির রাত
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
ওয়াইকিকি
বনবিবির বনে
হলুদ বসন্ত
নাজাই
পলাশতলীর পড়শী
ভাবার সময়
ভোরের আগে
ইলিশ
আলোকঝারি
মহুয়ার চিঠি
শালডুংরি
সন্ধের পরে
সাসানডিরি
পুজোর সময়ে
জেঠুমণি এণ্ড কোং
ল্যাংড়া পাহান
রুআহা
বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
বাংরিপোসির দু'রাত্তির
পহেলি পেয়ার
মাধুকরী
অন্বেষ
হাজারদুয়ারী
নিনি কুমারীর বাঘ
বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে
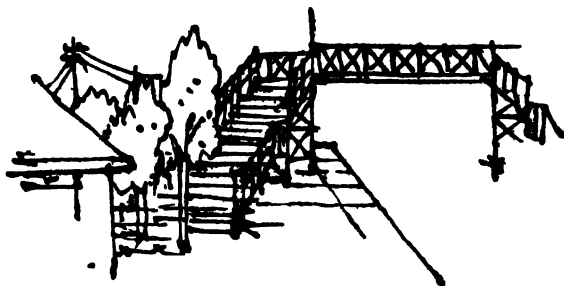
ট্রেন থেকে নামতে না নামতেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এলো। বৃষ্টির তোড় এমন কিছু নয়। কিন্তু ঝড়ের দাপটে শাড়ি সায়া উড়ে যাবার উপক্রম হলো। অবশ্য প্রায় আধ ঘন্টাটাক আগে থেকেই রেল লাইনের দু'পাশে ঝাটি-জঙ্গলে আর উদোম টাঁড়ে বিদ্যুতের চাবুক চমকে চমকে পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছিলো।

ট্রেনটা যদি জংশানেই এতোখানি লেট না করতো তবে নিদপুরা স্টেশনে তো ওরা সন্ধে লাগার আগেই পৌঁছে যেতো। চেয়েও ছিলো তাই। অচেনা অজানা জায়গা। রুবীর কাকার মুখে গল্প শুনেই এই নিদপুরাতে আসা ওদের।

ট্রেনটার পেছনের লাল বাতিটা মিলিয়ে যেতেই কলি আর পর্ণার ভয় ভয় করতে লাগলো। অচেনা স্টেশনটিতে আলো নেই তেমন। বেশ নির্জনও।

কিছু সাঁওতাল মুণ্ডা মাঝি-মেঝেন নেমেছিলো। একজন মাঝবয়সী দাড়ি-ওয়ালা গম্ভীর ভদ্রলোক। একটা কালো কুকুর বৃষ্টিতে ভিজে ওভারব্রিজের তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। তার ভেজা-গা থেকে বিচ্ছিরি একটা কুকুর-কুকুর বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছিলো। খচর খচর করে পা দিয়ে গা চুলকোচ্ছিল কুকুরটা।

একজন পাগলমতো মানুষ। মতো নয়; পাগলই। হাতে গাঁজার কল্কের মতো একটি কল্কে নিয়ে; মতো নয়, গাঁজাই, জোরে দম্ মেরে বললো: ব্যোম্ শঙ্কর!

চমকে উঠলো ওরা দুজনেই। এমনিতে তো ভিজে গিয়ে কাঁপছিলোই তার উপর এই হঠাৎ চিৎকারে আরও ভয় পেয়ে গেলো। ওভারব্রিজের ওপরের আলোটা ঝোড়ো হাওয়াতে দুধারে দুলতে থাকাতে, প্ল্যাটফর্মে, ওভারব্রিজের সিঁড়িতে আলোছায়ার খেলা চলতে থাকলো। গা-ছম্ছম্ করে উঠলো ওদের।

পর্ণা বললো, কই রে? তোর 'মন্দার' হোটেলের লোক কোথায়? চিঠি পৌঁছেছে তো! না পৌঁছলেই তো চিত্তির! অচেনা অজানা পান্ডববর্জিত

জায়গা ! কি হবে ?

তাই তো দেখছি।

তারপর বললো, নাঃ চিঠি নিশ্চয়ই পৌঁছবে। রুবীর কাকা কার মারফত যেন হাতেই পাঠিয়েছিলেন। ডাক বিভাগের ভরসায় থাকলে অবশ্য কিছুই বলা যেতো না। দেশে একটি বিভাগই ছিলো ভদ্রলোক, তাও গেছে। এখন সব সমান।

মায়ের কথাগুলি মনে পড়ে গেলো পর্ণার : 'এটা বিলেত আমেরিকা কী না ! জানা নেই, শোনা নেই, বন্ধুর কাকার কথাতে নেচে উঠলেন ! সঙ্গে একজন পুরুষ বন্ধু-টন্ধু গেলেও না হয় নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। তোমার মতো বুদ্ধি আর কার ! জীবনে যা কিছুই করলে সবকিছুর পরিণতিই তো চমৎকার' !

কলি হেসেছিলো, পর্ণার মায়ের কথাতে।

বলেছিলো, আমাদের যেসব পুরুষ বন্ধু আছে তাদের সবাইকে দেখলে আপনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন মাসীমা। ফুঁ দিলেই উড়ে যায়। মিনমিন করে কথা বলে। আধুনিক কবিতা লেখে। ষাঁড় অথবা কুকুর দেখলে পালিয়ে পথ পায় না। থার্ড ক্লাস। তাদের চেয়ে আমাদের গায়েই জোর অনেক বেশি।

গায়ের জোরই তো সব নয় রে। এখনও এদেশে পুরুষমানুষের দামই আলাদা।

বিরক্তির গলায় মাসীমা বলেছিলেন।

কলি বুঝেছিলো যে, মাসীমার বাক্যটা সরল নয়। তার ভিতরে পর্ণার প্রতি খোঁচাও ছিলো। মেয়েটা এমনিতেই মরমে মরে আছে তার ওপর নিজের মা হয়ে মাসীমা যে কী করে এমন দুঃখ দিতে পারেন, তা মাসীমাই জানেন।

ভেবেছিলো, কলি।

এমন সময় ওভারব্রিজ দিয়ে তিন-চারজন মানুষ দৌড়ে নেমে এলেন। যাঁরা উঠে চলে যাবার, তাঁরা তো চলে গেছিলেনই ততক্ষণে। চেকার দাঁড়িয়ে ছিলেন কালো কোটের কলারটা কান অবধি উঠিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া থেকে বাঁচতে।

যাঁরা নামলেন তাঁদের মধ্যে একজন যুবক। প্রায় ছ'ফিটের মতো লম্বা। মাজা রঙ। কাটা কাটা নাক চিবুক। উল্টো করে ফেরানো চুল। জিনস্ পরা। উপরে ছাইরঙা একটি হাফ-হাতা গেঞ্জি। চোখে চশমা। কাঁচের আড়ালে উজ্জ্বল দুটি চোখ ঝকঝক করছে।

কাছে এসেই, হাত জোড় করে বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই মন্দার হোটেলে…।

হ্যাঁ। সেইরকমই তো কথা ছিলো। আপনারা এতোক্ষণ ছিলেন কোথায় ? ভিজে ঝোড়োকাক হয়ে গেলাম যে।

বিরক্তির গলায় বললো পর্ণা।

ভেরী সরি!

ক্ষমা চাওয়া গলায় ভদ্রলোক বললেন, গাড়িটার চাকা পাংচার হয়ে গেছিলো।

বলেই, বললেন, কই কালিদা! ছাতা? ছাতা দাও এঁদের। একেবারেই ভিজে গেছেন যে! দাঁড়িয়ে দেখছোটা কি হাঁ করে?

কালি যার নাম, সেই ধুতি-শার্ট পরা, রোদে পোড়া প্রৌঢ় গ্রাম্য মানুষটি বগলের নিচে রাখা দুটি প্রায় বিবর্ণ ছাতা বের করে তাড়াতাড়ি ওদের দুজনের হাতে দিলো।

কলি বিরক্তির গলাতে বললো, এই দামাল হাওয়াতে ছাতা কি থাকে? উড়ে যাবে যে! ওয়াটার-প্রুফ আনতে হতো আপনাদের।

যুবক প্রতিবাদ করলো না। বোঝা গেলো যে, ওসব নেই।

বললো, চলুন, এগোনো যাক।

চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে কলি বললো, আপনার পরিচয়টা?

আমিই মন্দার হোটেলের ম্যানেজার। 'পরিচয়' বলতে দেবার মতো আর বিশেষ কিছু নেই। আপনাদের খিদ্‌মদ্‌গার। এইটুকুই পরিচয়।

ওঃ।

কলি বললো।

আর এই কালিদা। আপনাদের দেখাশোনা করবে। আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্টও আছেন। তাঁর নাম প্রণয়। কুক আছে রহিম। আপনাদের জাতপাতের বাতিক নেই নিশ্চয়ই?

পর্ণার মনে হলো, বেশি কথা বলেন মানুষটি। প্রথম দর্শনে তো ভালোই লেগেছিল। শিক্ষিত বলেও মনে হলো কিন্তু এতো কথা বললে তো আর!

এই তো হয়। কত কুশ্রী স্ত্রী ও পুরুষ কথা বলার পর যে কত সুন্দর শ্রীময়-শ্রীময়ী হয়ে ওঠেন তা ভাবা পর্যন্ত যায় না। আবার কত সুন্দর মানুষ মানুষী কুশ্রী। কথা, মানুষের ব্যক্তিত্বের এক মস্ত দিক।

প্রণয় আবার নাম হয় নাকি কারো?

কলি বললো ওভারব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে।

কী করবে। বাবা-মায়ের দুর্মতি। তবে ও ঐ নামে নিজেকেও ডাকতে দেয় না কাউকেই। ও নিজেই পাল্টে দিয়েছে।

নিজেই?

হ্যাঁ, নিজেই।

এ তো দেখছি পূর্ব-আফ্রিকার মাসাইদের দেশের ব্যাপার হলো!

সে-রকমই প্রায়!

ওভারব্রিজটার ঠিক ওপরে যখন উঠেছে ওরা হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দ ছাড়াই এমন বিদ্যুৎ চমকালো একবার যে মাইলের পর মাইল ওভারব্রিজের দুটি পাশ পরিষ্কার দেখা গেলো এক ঝলক নীলচে-সবুজ কোটি কোটি ওয়াট্-এর

ক্ষণিক আলোয়। পাহাড়, জঙ্গল, কাঁচা রাস্তা, খড়ের বাড়ি এবং দূরের পাহাড়ের প্রায় পা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিশাল প্রাসাদের ছাইরঙা সিল্যুট চোখে ভেসে উঠলো চকিতে ওদের দুজনেরই। পরক্ষণেই অন্ধকার।

সেই মুহূর্তেই জায়গাটাকে ভালো লেগে গেলো পর্ণার।

ফিসফিস করে কলিকে বললো, দারুণ! নারে?

কলি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে বললো, হুঁ।

তারপরই বললো, আস্তে বল। শুনতে পেলে, ম্যানেজার হোটেলের রেট বাড়িয়ে দেবে।

ম্যানেজার কিন্তু ছিলো ঠিক ওদের পেছনেই। কথা শুনতে পেয়ে হেসে বললো, কোনো ভয় নেই। রেট এক পয়সাও বাড়বে না। আপনারা খুশি থাকলেই আমরা খুশি।

কলি ভাবছিলো, শেষের বাক্যটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ছিলো। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই এডিটিং যে কত বড় প্রয়োজনীয় তা যদি সকলেই জানতো!

পর্ণা বললো, কেন? আমাদের খুশি নিয়ে আপনার এতো মাথা ব্যথা কিসের?

মাথা ব্যথা নেই? আপনারা খুশি হলেই না অন্যদের গিয়ে বলবেন, তাঁরাও আসবেন এখানে বেড়াতে। আমাদের হোটেলের বাড়-বাড়ন্ত হবে।

ও!

কলি বললো।

আপনাদের হোটেলের ভালোমন্দের চিন্তাতে যেন আমাদের ঘুমই হচ্ছে না।

পর্ণা বললো।

আসলে, ভিজে যাওয়াতেই ওদের দুজনের ব্যবহার এমন রুক্ষ হয়ে উঠেছিলো।

ম্যানেজার বললো, সত্যিই তো! ইসস্, একেবারে চুপচুপে হয়ে ভিজে গেছেন দুজনেই! আলোর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবেন কি করে! নানা বাজে টাইপের লোক আছে স্টেশনের ওদিকটাতে।

রাগে গাল লাল হয়ে গেলো কলির। কী বলবে ভেবে পেলো না।

ম্যানেজার কলির উষ্মার খোঁজ না নিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বললো ও কালিদা! তুমি দিদিদের কাছেই থাকো। আমি বরং গাড়িটা ব্যাক করে একেবারে গেটের সামনেই নিয়ে আসছি। গাড়ি আনলেই দিদিদের নিয়ে নেমে এসে তুমি ওঁদের গাড়িতে তুলে দিও। নিজেও উঠতে ভুলো না আবার।

পর্ণা এবং কলি কিছু বলবার আগেই ম্যানেজার তরতরিয়ে নেমে গেলো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। তার দৌড়ে নেমে যাবার যৌবনময় ভঙ্গীটি ভারী সপ্রতিভ মনে হলো। এই 'মন্দার হোটেল'-এর ম্যানেজার আগে নিশ্চয়ই খেলা-ধুলো করতো।

একটু পরেই ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে রং-চটা একটি পুরোনো ফোর্ড

গাড়ি এসে দাঁড়ালো। কত পুরোনো যে, তা কে জানে! কলকাতার 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান'-এর ভিনটেজ কার র‍্যালীতে নাম দেবারও যোগ্যতা এ গাড়ির নেই। ডিজেলের এঞ্জিন বসিয়ে নেওয়াতে সে গাড়ির মৃত্যু-পথযাত্রী শরীরে যেন অন্তিম শ্বাস উঠেছে। কলকাতাতে এমন গাড়ি আজকাল দেখাই যায় না।

কালিদা দরজা খুলে দিতেই ওরা দুজনে পেছনের সীটে উঠে পড়লো। সীট ভিজে গেলো ওদের শাড়ি সায়া জামার জলে। ডানদিকের পেছনের দরজার কাঁচটা ওঠেই না। জলের ছাট আসছিল সেদিক দিয়ে। পর্ণা বললো, বাঁ পাশে সরে আয় কলি।

গাড়ি এগোলো। তখনও দম্‌কা দম্‌কা হাওয়া আর বৃষ্টি চলছিলো। শীতে হি হি করছিলো ওরা। জানলার কাঁচ তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পর্ণা বললো, গাড়ি বটে আপনার। একে কি গাড়ি বলে!

ম্যানেজার চাপা গলায় বললো, আসলে বৃষ্টিটারই কোনো কনসিডারেশান নেই। শুক্লা পঞ্চমী আজকে। এপ্রিল মাস। জ্যোৎস্নায় চারধার ফুটফুট করার কথা ছিলো। এ সময়ে যে এমন ··

সবই আমাদের কপাল।

কলি বললো, কপালের কথা কে বলতে পারে

মানে?

না, বলছিলাম যে, কপালের কথা কি অত চট্‌ করে বলা যায়? তাছাড়া আপনারা কপাল মানেন না কি?

ঠ্যালাতে পড়লে না মেনে উপায় কি? এখন সে সব প্রসঙ্গ থাক। কোথাও এক কাপ চা পাওয়া যেতে পারে কি? গরম? ঐ তো চায়ের দোকান সামনেই।

পথের চা তো ভালো হবে না। আপনাদের যোগ্য হবে না। পাঁচ মিনিট কষ্ট করুন। হোটেলে পৌঁছেই চা খাবেন।

আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনি তাহলে ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহ হয়েছেন বলুন?

ঠাট্টা উপেক্ষা করে স্মার্ট ম্যানেজার বললো, মোটামুটি।

গ্রেট।

পর্ণা বললো।

এই সব এক্সপ্রেসান-অফিসের কলিগদের কাছে শিখেছে। বই পড়ে বা স্কুল কলেজে আর কতটুকুই বা শেখা যায়! সত্যি, কলি ওর পরিবর্তন দেখে নিজেই নিজে অবাক হয়ে যায়। তবে পরিবর্তনটার রকম ভালো না মন্দ তা ওর জানা নেই।

তারপরই বললো, দূরে যে একটি বিরাট প্রাসাদ মতো দেখলাম বিদ্যুতের আলোতে এক ঝলক? ওটি কি? কোনো রাজার বাড়ি?

না, না রাজা-টাজার বাড়ি নয়। ও বাড়িরই একতলাতে 'মন্দার হোটেল'।

ওরে বাবা! অত বড় বাড়িতে আমরা মোটে দুটি প্রাণী। ভয়েই মরে

যাব যে।

মরবেন না। মরতে যাবেন কেন? তাছাড়া, আরো তো জনা চারেক অ্যাডাল্ট গেস্টস আজও আছেন। এবং দুটি বাচ্চা। গুড ফ্রাইডের আগে হোটেল একেবারে ভরে যাবে। তাছাড়া আমরা অনেকগুলি প্রাণী তো ও-বাড়িতেই থাকি। বড় বাড়ি হলে কী হয়; শীত করবে না, ভয় লাগবে না; উষ্ণতাও আছে। ভালোবাসা।

তাই?

বলেই, পেছনের সীটের অন্ধকারে পর্ণা, কলির হাঁটুতে চিমটি কাটলো।

মনে মনে বললো, ডায়লগ ঝাড়ছে। ভালো পাল্লাতেই পড়েছি।

অতর্কিতে চিমটি খেয়ে কলি বলে উঠলো, উঃ!

কী হলো?

নাঃ। কিছু হয়নি। তবে মনে হচ্ছে, হতে পারে।

পর্ণা বললো।

কালিদা নামক মসীবর্ণ ব্যক্তি মুখ ঘুরিয়ে একবার পেছনে চাইলো। হয়তো 'উঃ'-র উৎস সম্বন্ধেই সরেজমিনে তদন্ত করতে।

গাড়িটা লালমাটির কাঁচা পথের বাঁদিকে দাঁড় করিয়ে ম্যানেজার একটি সিগারেট ধরালো। বৃষ্টিভেজা কাঁচামাটির পথ থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছিলো। লাইটারের আগুনে পাশ থেকে তার মুখ ভালো করে দেখলো এবারে কলি। কে জানে কেন! ধক্ করে উঠলো ওর বুক। ইচ্ছে হলো বলে, আমাদের আবার স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসুন এক্ষুনি। আমরা যাবো না। ঐ মুখে কিছু একটা দেখলো কলি যা আগে কারো মুখেই কখনও দেখেনি। লক্ষ লক্ষ পুরুষের মুখ দেখেছে, কিন্তু···মানুষটা কী খুনী? অথবা গুণী? কিন্তু এমন মানুষ আগে কখনই দেখেনি, দেখেনি, দেখেনি। ও হলপ করেই বলতে পারে।

প্রকাণ্ড লোহার ফটকের মধ্যে দিয়ে,উঁচু বাউণ্ডারী দেওয়া গাছ-গাছালিতে ভরা সেই প্রাসাদোপম বাড়ির ড্রাইভে যখন গাড়িটি ঢুকে পড়লো তখন পর্ণার মনে হলো সেই পুরোনোদিনের, বইয়ে-পড়া, ইংল্যাণ্ডের মধ্যযুগীয় কোনো ভূস্বামীরই বাড়িতে ঢুকছে যেন। হাওয়াতে ভেজা গাছপালা আন্দোলিত হচ্ছিল। সেই হাওয়াতে গাছ-গাছালি ফুল পাতার গায়ের সবে চান-করে-ওঠা গন্ধ ভরে ছিলো। চমৎকার লাগছিলো ওদের।

গাড়িটা এসে থামলো পর্চ-এ। মস্ত রিসেপ্শান। বোঝাই গেলো, আগে এটিই এ-বাড়ির বসবার ঘর ছিলো। দেওয়ালে দেওয়ালে বাঘ, ভাল্লুক, বুনোমোষ, নীলগাই, বাইসন, চিতা, শম্বর, বারাশিঙা হরিণ ইত্যাদির মুখ মাউন্ট করা। তার নিচে কাঠের ফ্রেমের উপরে পেতলের প্লাক্ এর উপরে সন, তারিখ সব লেখা। কবে কবে এবং কোথায় শিকার করা হয়েছিলো তাদের। কে শিকার করেছিলো। সবচেয়ে বড় বাঘ যেটি, সেটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কলি। দেখলো, তার নিচে লেখা আছে স্নিগ্ধ রায়চৌধুরী, টেবো, উনিশশো পঁয়ষট্টি, ছেইশে ডিসেম্বর।

প্লীজ। এবারে আপনারা ঘরে চলে গিয়ে চেঞ্জ করুন। আমি পরে যাচ্ছি খোঁজ নিতে। এখুনি কি খাবেন?

না না। ন'টা নাগাদ খাবো।

ফাইন।

ডিনার ন'টাতেই তৈরী থাকবে। আপনারা রিল্যাক্স করে নিন একটু। চেঞ্জ করার পর, চা খান।

পর্ণা একবার ম্যানেজারকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে কালিদা নামক মানুষটির সঙ্গে প্রকাণ্ড চওড়া মার্বেলের করিডোর দিয়ে হেঁটে চললো নিজেদের ঘরের দিকে।

এই যে। কালিদা বললো, একশো আঠারো আপনাদের ঘরের নম্বর।

বলেই, তালা খুলে দিয়ে বললো, আসুন। কারুকাজ করা সেগুন কাঠের বিরাট দু'পাল্লার দরজা। দরজা খুলতেই ঘর ও আসবাবপত্র দেখে চমকে উঠলো ওরা দুজনেই।

কলি, আজকালকার মেয়ে হলেও খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। ওর অনেক বন্ধুরাই সাতটা-আটটা অবধি ঘুমোয়। পর্ণাও তাই।

ও যখন উঠেছিলো, সূর্য তখনও ওঠেনি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। চারদিকে এক আশ্চর্য নরম রঙহীন সুগন্ধি সকালবেলার আলো। নানারকম পাখি ডাকছে। বাড়িটা এতোই বড় যে, তার বাগানটিকেই মনে হচ্ছে জঙ্গল। কত রকমের বড় ছোট গাছ। কত পাখি! ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছে একটা। রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়লো : 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া'। এই হাওয়া কলকাতায় যে কোথায় থাকে!

ঘরের মধ্যে দুটি চেয়ারের উপরে শুকোতে দেওয়া দুটি ফুল-স্লিভস সোয়েটার দেখে ভারী লজ্জা হলো ওর। একটির রঙ ছাই। অন্যটির মেটে-লাল। এ দুটি ম্যানেজারেরই দেওয়া। শালকরের দোকান থেকে কাচিয়ে এনে রাখা ছিলো দেরাজে। ন্যাপথলিনের গন্ধমাখা। কাল, পাছে ওদের ঠাণ্ডা লেগে যায় তাই ঐ দুটিকে এনে দিয়েছিলো। মনে হয় এ বাড়িতে কোনো মহিলা নেই। থাকলে শাল বা কার্ডিগানই পাওয়া যেতো হয়তো। এবং শোবার সময়ে দু'গ্লাস গরম দুধ দিয়েছিলো এক চামচ করে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে।

কত চার্জ করবেন এর জন্যে?

এটা ভালোবাসা না ব্যবসা? তা জানবার জন্যে পর্ণা শুধিয়েছিলো। যদিও ভালোবাসা আর ব্যবসার মধ্যে ব্যবধান খুবই কম আজকাল। প্রায় প্রান্তিক। অনেক সময়েই ব্যবধানটা এতোই ক্ষীণ যে, বোঝা পর্যন্ত যায় না।

নাথিং।

ম্যানেজার উত্তর দিয়েছিলো।

কলি বলেছিলো, ঘুমের ওষুধটষুধ মিশিয়ে দ্যাননি তো আবার!

সে তো এমনিতেই দেওয়া যেতো। দামী ব্র্যান্ডির কি দরকার ছিলো?

কে জানে! এক সন্ধেরই তো আলাপ! তারপর হোটেলের ম্যানেজার বলে কথা! দুজন অবলা নারী আমরা, কত কথাই তো মনে হয়। মনে হতে পারে।

অবলা ভাবলেই অবলা। অবলা যে নন আপনারা, তা খুব ভালো করেই জানেন। কোনো নারীই অবলা নন। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু জানেন না যে, তাঁদের বলটা কোথায়? তাছাড়া, পুরুষের যেটা দুর্বলতা, নারীর তো সেটাই বল! তাই না?

বাঃ! বেশ তো কথা বলেন মশাই আপনি!

কলি বলেছিলো।

কী করব! কথা বেচেই যে খাই। হোটেলের ব্যবসা! মিষ্টি কথা, নত মাথা, হাসি মুখ। এই সবই তো মূলধন।

একটি কথা ভেবে কলির হাসিও পাচ্ছিলো আবার লজ্জাও করছিলো। সোয়েটার দুটো দিয়ে কাল ম্যানেজার বলেছিলো, ভাগ্যিস! স্বাস্থ্যবান পুরুষদের আর দুর্বল মহিলাদের বুকের মাপ একই হয়। নইলে কি আর শীত থেকে বাঁচাতে পারতাম আপনাদের! বাইরে যখনি আসবেন তখনই সামান্য গরম কাপড়-চোপড় আনবেন। এখানের প্রকৃতি তো আপনাদের কলকাতার মতো কণ্ডিশানড-প্রকৃতি নয়!

এবারে পর্ণাকে ঘুম থেকে তুললে হয়। খুবই মিস করবে ও। শঙ্খ ঘোষের ছেলেবেলার স্মৃতির একটি বই আছে: 'সকালবেলার আলো'। ভারী সুন্দর নাম। এই সকালটিও সেই রকমই। কলি ভাবছিলো।

পর্ণা। এই পর্ণা।

ডাকলো কলি ওকে।

পর্ণা উঠলো না। পাশ ফিরে শুলো।

কলি বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ হাত ধুয়ে দরজাটা ভেজিয়ে বাইরে বেরোলো। কী বড় বড় ঘররে বাবা। কত উঁচু-উঁচু সীলিং। পুরোনো দিনের উঁচু পালঙ্ক। এতোই উঁচু যে পালঙ্কে ওঠার জন্যে কাজ করা কাঠের টুল রয়েছে। এতো বড় মশারী যে, তার নিচে দশজন মানুষ স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি শুতে পারে। আর মখমলে-মোড়া কোলবালিশ। এমনই কেঁদো কোলবালিশ যে, পাশে শুয়ে পর্ণাকে দেখা পর্যন্ত যাচ্ছিলো না রাতে। উঠে বসলে, তার পরই কথা বলতে পারা যাচ্ছিলো। রাজার বাড়িই ছিলো বোধহয় আগে এটি। কিন্তু বিছানা, রাজবাড়ির বালিশ পর্যন্ত পেয়ে গেলো এই ম্যানেজার কোন্ সুবাদে? এই বাড়ির মালিকই বা কে?

বাইরে বেরোতেই দেখা হয়ে গেলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। ম্যানেজারেরই বয়সী হবেন। তবে, ব্যক্তিত্বে একেবারেই আলাদা। পায়ে হাওয়াইয়ান চপ্পল। গায়ে চকরা-বকরা একটি হাওয়াইয়ান শার্ট।

নমস্কার। সুপ্রভাত! নিশ্চয়ই প্রাণটা খুব চা-চা করছে। আপনি বাগানের ঐ দোলনাতে গিয়ে বসুন। কালিদাকে দিয়ে চা পাঠাচ্ছি, আমি।

আপনি?

আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। কাল বাড়ি চলে গেছিলাম তাড়াতাড়ি।

তারপরই বললো, বুঝেছি। এখনও আপনাদের ম্যানেজারের নাম জিগ্যেস করার সুযোগ হয়নি বুঝি?

না। এখনও নাম জিগ্যেস করা হয়নি। ও। আপনার নাম তো প্রণয়? তাই না?

আজ্ঞে! সেইটেই আমার লজ্জা। তবে ম্যানেজারের নাম স্নিগ্ধ। তাই আমি নিজেকে বলি রুক্ষ। রুক্ষ রুদ্র। আমার নাম। একে রুক্ষ, তায় রুদ্র। বুঝতেই পারছেন। আমার ব্যক্তিত্বকে জানতে হলে এই পাথুরে পাহাড়ে জায়গাতে মে মাসের শেষ বা জুনে আসবেন। 'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি' কাকে বলে বুঝতে পাবেন।

অন্যেরাও তাই বলে নাকি? মানে, আপনার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে?

হ্যাঁ। সকলেই আমাকে রুক্ষবাবু বলেই ডাকে। কেউ কেউ রুদ্রবাবু বলেও ডাকে। এবারে আপনি এগোন। আমি চা পাঠাচ্ছি। আপনার বন্ধুর চা কি করবো? এখন পাঠাবো ঘরে? না পরে?

আপনি আমার সঙ্গেই পাঠান। একই টি-পটে। জানলা দিয়ে ডেকে নেবো ওকে।

জানলা দিয়ে ডাকবেন কি করে? কত উঁচু জানলা দেখেছেন? প্রায় দু'মানুষ সমান। এ-বাড়ির ভিতই তো দু'মানুষ সমান। আমি বরং পুঁটিকে পাঠিয়ে ওঁকে ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছি। দরজা ভেজানো আছে তো? না লক্ করা?

হ্যাঁ। ভেজানোই আছে। কিন্তু পুঁটি কে?

ঐ। মহিলাদের দেখাশোনা করার জন্যে পরিচারিকা। কালিদাদার মেয়ে হয়। পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি। চায়ের সঙ্গে কি পাঠাবো? টোস্ট না বিস্কিট?

যা হয়। আমরা চায়ের সঙ্গে বিশেষ কিছু খাই না।

ঠিক আছে।

বাগানের দোলনাটাও এতোই বড়ো যে, পাশাপাশি বারোজনে বসে দোলনা চড়া যায়। ছ'জন মানুষ পাশাপাশি ঘুমোতে পারে। একটি মস্ত কদম গাছে টাঙানো দোলনাটা। তার পাশেই একটি প্রাচীন চাঁপা গাছ। কাঁঠালি-চাঁপা। চাঁপাফুল নিচে এমন সংখ্যাতে ঝরে পড়েছে যে, মনে হচ্ছে যেন কেউ ফিকে হলুদ গালচে পেতে দিয়েছে। প্রজাপতি উড়ছে। ভ্রমর উড়ছে। মৌমাছি। বাড়ির ছাদের কাছে কোথাও বড় মৌচাক আছে নিশ্চয়ই। আমলকি গাছ, শিশু গাছ, সোনাঝুরি, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, রাধাচূড়া, অনেক নাম-না-জানা বিদেশী ফুলের গাছ। ফিকে বেগুনি, ফিকে গোলাপি, ফিকে হলুদ সব ফুল ফুটে আছে। কোকিল ডাকছে শিহর তুলে তুলে। হলুদ বসন্ত-পাখি এ-ডাল থেকে ও-ডালে হুটোপুটি করছে। বুলবুলি শিস দিচ্ছে। মৌটুসকি পাখিরা কিস্-কিস্ করে কী সব বলছে স্বগতোক্তির মতো।

ভোরের গন্ধ, পাখির গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ঘাসের গন্ধ, শিশিরের গন্ধ, দূরের মৌন পাহাড়ের গায়ের গন্ধ সব মিলেমিশে ঘোর ঘোর লাগছিল কলির। ভাবছিলো, ভাগ্যিস রুবীর কাকার কথা শুনে চলে এসেছিলো। কলকাতার এতো কাছে যে এমন একটি জায়গা থাকতে পারে সত্যিই তা অভাবনীয়। আর এই সামান্য চার্জে এতো সব সুযোগ সুবিধা! স্টেশন থেকে পিক্-আপ করে

'নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সোয়েটার ধার দেওয়া, ব্র্যান্ডি মেশানো দুধ খাইয়ে নাক দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীকে হেজিয়ে-মজিয়ে দেওয়া ! আজকাল কে এমন করে ? কোথায় করে ?

চা এলো একটু পরই। ট্রে-তে বসানো চায়ের পট, টি-কোজিতে মোড়া। দুধ-এর পট, তাও কোজিতে মোড়া, একটি আলাদা পট-এ গরম জল। যেমন সব ফাইভ-স্টার হোটেলে দেয়। আলাদা করে জল দেয় চা যদি কড়া মনে হয় তো পাতলা করে নেবার জন্যে বা কোয়ান্টিটি বাড়াবার জন্যে। চমৎকার বোন্চায়নার প্লেটে বিস্কিট। ছাঁকনি স্টিলের, আলাদা বসানো। পুরো সিটটিই বোন্-চায়নার। ইংলিশ। এও বোধ হয় এই রাজবাড়িরই সম্পত্তি। অ্যান্টিক আইটেম হয়ে গেছে এখন। বাঃ ! বেশ মজা তো ম্যানেজারের !

ভাবলো, কলি।

কালিদা বললো, আপনার বন্ধু মুখ ধুচ্ছেন। আসছেন এক্ষুনি।

ঠিক আছে !

বললো কলি।

ও ভাবলো, পর্ণা এলেই চা ঢালবে। এমন সময়ে একটি বছর চারেকের মেয়ে খালি পায়ে নাইটি লুটোতে লুটোতে কলির পাশে এসে দাঁড়ালো। কলি দেখলো, ওর হাতে চকোলেটের বার।

ওমা ! তুমি চকোলেট কোথায় পেলে ? কে দিলো এই সাত সকালে ?

কপট ঔৎসুক্যর সঙ্গে শুধোলো কলি।

ছিঁগদো কাকু দিয়েছে।

ছিঁগদো কাকুটি কে ?

আহা ! ছিঁগদো কাকু ! চেনোনা তুমি ?

না তো !

তোমার নাম কি ?

চড়াই।

তুমি কার সঙ্গে এসেছো ?

বাবা মা আর দাদা।

দাদা কোথায় ?

ছিঁগদো কাকুর কাছে বাংলা পড়ছে।

মনে মনে কলি বললো, বাবাঃ ! এতো দেখছি বিচিত্রবীর্য ম্যানেজার !

তোমার মা বাবা ?

ঘুমুচ্ছে। এখানে ঘুমুতে যে খুব মজা ! মা বলে

তাই ? কোথায় থাকো তোমরা ? কলকাতায় ?

না গো ! জামশেদপুরে।

জামশেদপুরের কোথায় ?

নীলডিতে। তুমি গেছো ? আমরা থাকি দল্মা রোডে ? আর পিয়ালি মাসি থাকে গোলমুড়ি রোডে। সবই কাছাকাছি। এই, এট্টু এট্টু দূরে।

পাকা বুড়ির মতো কথা বলছে। আজকালকার মেয়ে। চোখে মুখে

বুদ্ধি ঠিক্রোয় !

এরকম মেয়ে দেখলে হঠাৎ মন কেমন করে ওঠে। আগে বিয়ে হলে ওর এরকম মেয়ে থাকতে পারতো একটি। যদি···।··যাকগে যাক। যদি যাক নদীতে।

ও। বাবা ওখানেই কাজ করেন বুঝি ?

হ্যাঁ। টেল্কোতে। বাবা তো ডি. জি. এম.।

সেটা কি ?

তাও জানো না ? ডেপুটি জেনারাল ম্যানেজার।

ও বাবাঃ। তাই ? তুমি তো অনেকেই জেনে ফেলেছো দেখছি।

হ্যাঁ।

তা, তোমরা ক'দিন এসেছো ?

তিনদিন।

কেমন লাগছে ?

কুউব ভালো।

তোমার ছিঁগদো কাকু কি তোমাদের আত্মীয় হন ?

আত্মীয় মানে ?

এই মরেছে ! ভাবলো কলি।

আত্মীয় মানে কি ?

চড়াই শুধোলো।

ও বললো, স্বগতোক্তির মতো, আত্মীয় মানে···মানে···

কোনো পুরুষ কণ্ঠ বললো, মানে, যে আত্মার কাছে থাকে। সেই তো আত্মীয় ! তাই নয় ?

পরক্ষণেই চম্কে চেয়ে কলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো, ম্যানেজার ; থুড়ি, স্নিগ্ধ, তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে।

স্নিগ্ধ হেসে বললো, সে অর্থে চড়াই আমার অবশ্যই আত্মীয়। তবে চলিতার্থে নয়।

বলেই বললো, চড়াই-এর মা-বাবা দশটা অবধি ঘুমোন কারণ তাঁরা বলেইছেন যে, তাঁরা সেকেণ্ড হানিমুনও এসেছেন। কিন্তু আপনার অবিবাহিতা বন্ধু দেখছি বড়ই ঘুম-কাতুরে। এতোই ঘুমোবেন তো আমাদের এই সুন্দর জায়গাটি দেখবেন কখন ? অনুমতি দ্যান তো কাল থেকে অ্যালার্ম দিয়ে ঘড়ি দিয়ে দেবো ঘরে। নয়তো ভোর পাঁচটাতে চৌকিদারকে বলি ডেকে দিতে ? কি ? বলবো ?

আপনাদের জায়গার নামই যে নিদপুরা। কেউ কেউ নিদপুরালে ক্ষতি কি ?

তারপরই বললো কলি, ঐ যে, তিনি আসছেন। ওকেই বলবেন। তাছাড়া আমরা যে বিবাহিত নই তাই বা আপনি জানলেন কি করে ? আজকাল তো বাইরে থেকে কিছুমাত্রই বোঝার কথা নয়। শাঁখা পরি না আমরা, সিঁদুর দিই না কপালে, নামের আগে লিখি M. S.।

সরি, সেটা ঠিক। অন্যায় হয়েছে। আপনার বন্ধু কিন্তু ভারী রাগী মানুষ। তাছাড়া আমার এখন অনেক কাজ। আমি চলি। গুড্ মর্নিং টু বোথ অফ উ্য।

আমি যাবো ছিঁগদো কাকু তোমার সঙ্গে।

চড়াই বললো।

না, এখন তুমি বাবা-মায়ের কাছে যাও। নয়তো দাদার কাছে।

চলে যেতে যেতে পর্ণার মুখোমুখি পড়াতে স্নিগ্ধ বললো, সুপ্রভাত।

পর্ণাও নাইটি পরে ছিলো কিন্তু কলিরই' মতো উপরে হাউসকোটও পরা ছিলো। অসভ্য দেখাচ্ছিলো না।

পর্ণা একবার তাকালো আপাদমস্তক স্নিগ্ধর দিকে। ঢোলা পায়জামা। উপরে ফিকে সবুজ-রঙের খদ্দরের পুরো হাতা পাঞ্জাবি। এক হাতের হাতাটি গোটানো। উস্কোখুস্কো চুল, ঘাড় অবধি নেমে এসেছে। ছেলেবেলায় ওরা যাকে বলতো 'কেয়ারফুল-কেয়ারলেস বিউটি' সে রকম আর কী! গা থেকে একটি মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। কিসের গন্ধ কে জানে! ব্যক্তিত্বর গন্ধ কি? কোনো জানা পারফ্যুমের নয়। সেই গন্ধটা, বাগানের মিশ্র ফুল-পাতার আর সকালবেলার আলোর অন্য সব গন্ধকে ছাপিয়ে গেছে। অথচ সেটা তীব্র আদৌ নয়।

স্নিগ্ধ শুধোলো পর্ণাকে, ব্রেকফাস্ট কখন খাবেন?

কথাটার জবাব না দিয়ে পর্ণা বললো, এই পোশাকে বাইরে একটু হেঁটে আসতে পারি? অসভ্য দেখাবে না তো? থ্যাঙ্ক উ্য ফর এভরীথিং উ্য ডিড ফর আস লাস্ট নাইট।

প্লীজ ডোন্ট মেন্শান। হ্যাঁ, বাইরে যেতে পারেন। স্টেশনটা আমাদের আয়ত্বাধীন নয়। কিন্তু এদিকে যতদূর চোখ যায়, এই বাড়ি যাঁর তাঁরই জমি, তাঁরই এলাকা। এছাড়া উনি আর ওঁর ছেলে যা পুণ্য সঞ্চয় এ অঞ্চলে করে গেছেন এবং এতো সব ভালো ভালো কাজ করে গেছেন গত পঞ্চাশ বছরে; তা ক্ষালন করতে হলে মহাবলী খারাপ মানুষের দরকার। অন্যদের বা আপনাদের দ্বারা তা হবে বলে মনে হয় না।

তারপরই বললো, ঠিক আছে। বেরিয়েই আসুন, এসে একবার প্রণয়কে অথবা কালিদাকে বলে দেবেন। ডাইনিং রুমে আসবেন, না ঘরে পাঠাবো ব্রেকফাস্ট?

ঘরেই পাঠাবেন। কলির আবার একটা বদভ্যাস আছে। ব্রেকফাস্ট সেরেই তারপরে চানে যায়।

যেমন খুশি। আমাদের কোনোই অসুবিধে নেই। আমি একটু বেরোলাম। রাতে কোনো কষ্ট হয়নি তো আপনাদের?

হয়েছে।

পেছন থেকে কলি বললো।

কি?

এতো বিরাটত্বে অভ্যস্ত নই আমরা।

ঘরের কথা বলছেন ?

না।

তাহলে ? পালঙ্কের কথা ?

না তাও নয়।

পাশ বালিশ ? তাই হবে। নিশ্চয়ই পাশ বালিশ।

বলেই, হেসে বললো, সত্যিই প্রিহিস্টরিক। স্বীকার করছি।

উঁহু। তাও নয়।

মনের কথা। আপনার উদার হৃদয়ের কথা।

কলি বললো।

বলেই ভাবলো, যাত্রা যাত্রা শোনালো না কি কথাটা ?

স্নিগ্ধ এবারে হেসে ফেললো। একেবারে 'ডিসআর্মিং স্মাইল' যাকে বলে। গতরাতে, লাইটারের আলোয় দেখা ম্যানেজারের সেই রহস্যময় মুখটির কথা মনে পড়ে গেলো। মানুষটির অনেকগুলি মুখ আছে। একেক কোণ থেকে একেকটি মুখ চোখে পড়ে। মুখেরই মতো, হয়তো মনও আছে অনেকগুলি। কে জানে! ইন্টারেস্টিং মানুষ। আসলে, কলকাতাতে কলি এতোই কর্ম ব্যস্ত থাকে যে, এমন মানুষ সেখানে থেকে থাকলেও লক্ষ্য করার সময় হয় না। অবকাশ, অবসর, মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে।

কলি ডাকলো, আয়রে! চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

যাই।

পর্ণা বললো।

দারুণ জায়গাটা। না রে!

পর্ণা স্বগতোক্তির মতো বললো।

চোখ মুখ নাচিয়ে কলি বললো, দারুণ।

শুধু জায়গাটাই নয়, বাড়িটাও, হোটেলটাও। এবং··

উঁ-হু-হু করে গলা খাঁকারি দিলো একবার পর্ণা।

কলি ইশারাটা বুঝে, হেসে ফেললো।

এমন সময়ে দোতলার বারান্দা থেকে কোনো বৃদ্ধ যেন কেশে উঠলেন। মনে হলো। তারপরই মনে হলো, কে যেন দোতলার বারান্দা থেকে ওদের লক্ষ্য করছে। কিন্তু মুখ তুলে চাইতেই ছায়া সরে গেলো।

এখানে একখানা ঘর ভাড়া পেলে বেশ ভালো হতো! বেশ উইক-এন্ডে উইক-এন্ডে চলে আসতাম ওভারনাইট জার্নি করে। কী বল ?

ওভারনাইট কেন ? অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরুলে তো সেদিনই পৌঁছনো যায়। আরও একটি ট্রেন তো আছে। রাত দশটা নাগাদ পৌঁছোয়।

তার ওপরে স্টেশনে যদি তোর স্নিগ্ধ থাকে গাড়ি নিয়ে তবে আর চিন্তার কী! এমন বন্দোবস্তর কথা তো ভাবাই যায় না কোথাওই। আর ড্যামেজ বলতে, দিনে তিনশো টাকা, তাও দুজনের। সবকিছু ইনক্লুডেড। আজকাল-কার দিনে সত্যিই ভাবা যায় না। স্নিগ্ধতম বন্দোবস্ত। সবকিছুই স্নিগ্ধ।

বাঃ! চা-টাও দারুণ। খেয়ে দ্যাখ্।

দেখি। দুধ বেশি দিসনি তো? এই চায়ের ব্যাপারে মায়ের কাছ থেকে ভীষণ খুঁতখুঁতানি পেয়েছি। খারাপ চা, মোটে খেতে পারি না।

বলেই, চুমুক দিয়ে বললো, বাঃ! দার্জিলিং আর ডুয়ার্স দুই-ই ব্লেন্ড করা। যে-ই এসব দেখাশোনা করুন না কেন, একেবারে কনোস্যার। রুচি আছে বলতে হবে। পয়সার সঙ্গে রুচির সহাবস্থান বড় তো একটা দেখা যায় না, লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর সহাবস্থানেরই মতো।

যা বলেছিস।

ভাবছি, বিয়ে করার মতো মূর্খামি যদি কখনও হয় তবে এখানে এসেই হ্যানিমুনটা কাটাবো। কোনো বিখ্যাত জায়গা নয়, অথচ কী ভালো? না?

সত্যি।

বলেই পর্ণা একটু উদাস হয়ে গেলো।

লক্ষ্য করলো কলি, তার ছেলেবেলার বন্ধুকে।

বললো, তোর কী হলো আবার! তোকে নিয়ে আর পারি না। ডিভোর্স যেন আর কারোরই হয় না। এই নিয়ে যদি Broodই করবি তাহলে ডিভোর্স চাইলি কেন? সুবর্ণ তো চায়নি। ভদ্র ছেলে। আহত হয়েই দিয়ে দিলো। কনটেস্ট পর্যন্ত করলো না। এই ডিভোর্স নিয়ে তোর তো মন খারাপ হবার কথা নয়!

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে পর্ণা বললো, না তা নয়। তবে কী জানিস, কেবলি মনে হয়, সুবর্ণর প্রতি অন্যায় করলাম না তো! মানুষ তো ভুলও করে!

যাইই হোক! এখন তা নিয়ে মন খারাপ করার কোনো মানে হয় না। এলিজাবেথ টেইলর আর রিচার্ড বার্টনের কতবার পুনর্মিলন হয়েছিলো ডিভোর্সের পরে? তেমন হলে, তোদেরও আবার পুনর্মিলন হবে। নিদপুরাতে এসে এমন ওয়েল-ডিসার্ভড হলিডেটাকে সুবর্ণর জন্যে কেঁদে ককিয়ে নষ্ট করার প্রয়োজনটা কি? আমাদের কম খাটনি যায় অফিসে, বল? তাছাড়া সেও কি আর পা ছড়িয়ে কাঁদছে? সে কি আর আজ রাতে সি.সি.এফ.সি.-তে Booz সেরে ওবেরয় গ্রান্ডের পিংক-এলিফেন্টে কাউকে নিয়ে নাচতে যাবে না? ছাড় তো! পুরুষের ভালোবাসা, মুসলমানের মুরগি পোষা! চল্। চা খেয়ে ব্রেকফাস্ট করে তারপর বেরিয়ে পড়ি। জায়গাটা সার্ভে করে আসি।

এখনও এখানের ওয়েদার কেমন প্লেজেন্ট আছে দেখেছিস?

হুঁ। রাতে নিশ্চয়ই কম্বল রোজই লাগে। নইলে বিছানাতে পায়ের কাছে কম্বল রাখা থাকবে কেন? কাল ঝড়-বৃষ্টির জন্যেই দিয়েছিলো ভেবেছিলাম আমরা। আসলে তা নয়।

হবে।

অন্যমনস্ক গলায় বললো পর্ণা।

সব গেস্টরাই প্রায় বেরিয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ গেছেন সাইকেল-রিকশাতে করে। কেউ চান্ডিল থেকে প্রাইভেট ট্যাক্সি আনিয়েছেন এখান থেকে ফোন করে। কেউ বা হেঁটেই বেরিয়ে পড়েছেন।

নীলডির চাটুজ্যে সাহেবরা তো প্যাক-লাঞ্চ নিয়েই বেরিয়েছেন, সঙ্গে 'চিকনডিহ্ গ্রামের একটি ছেলেকে পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে। জলের বোতল শতরঞ্চি, লাঞ্চের প্যাকেট এবং থার্মোফ্লাস্কে কফিও নিয়ে। চিরচিরি ঝিলের পাশের শাল-জঙ্গলের মধ্যে পিকনিক করবেন। দুপুরটা গাছতলায় শুয়ে শুয়ে বই পড়বেন।

বড় গাছ ওদিকে বেশি নেই। শাল গাছে তেমন নিবিড় ছায়াও হয় না। সূর্য হেললেও ছায়া সোজাই থাকে। তাই প্রণয় বলে দিয়েছে, চিকনডিহ্‌র ছেলেটিকে, একটি প্রাচীন আম গাছের কথা। তার নিচেই যেন শতরঞ্চি পাতে। বেশ উঁচুও আছে জায়গাটা। আধোশোয়া হয়েও ঝিল চোখে পড়বে। তবে লাল পিঁপড়ে আছে অনেক। একটা মৌচাকও আছে বহুদিনের পুরোনো। প্রণয় এও বলে দিয়েছিলো মিসেস চাটুজ্যেকে: 'বৌদি, নিচে ধুঁয়ো-টুঁয়ো দেবেন না আর কড়া সেন্ট মেখে যাবেন না। দাদায় সিগার খাওয়া চলবে না মৌচাকের ধারে কাছে।'

মিঃ চ্যাটার্জী হেসে বলেছিলেন, তাহলে ঐ দুপুরে যখন লম্বা হবো তখনই যাবো আমতলিতে। অত মানার কথা কে মনে রাখবে?

তাই ভালো।

প্রণয় বলেছিলো।

পর্ণারাও বেরিয়ে পড়েছে। দূরের চিকনডিহ্‌র আদিবাসী গ্রাম দেখিয়ে বলেছিলো স্নিগ্ধকে, আমরা ঐদিকে যাবো? একেক দল বেরিয়েছে একেক দিকে।

অনেক দূর কিন্তু।

কেন? পাহাড়টাতো বেশ কাছেই মনে হচ্ছে।

ওরকম মনে হয়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'-তে পড়েননি, বাঙালিদের পাহাড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের কথা?

না তো!

যাই হোক। তিন মাইল হবে কম করে। পাহাড়ের পায়ের কাছেই তো গ্রাম।

পাহাড়টার নাম কি?

ঐ। একই নাম। চিকনডিহ্।

যাই! ঘুরেই আসি। এসে অনেক খাবো কিন্তু। ভীষণ খিদে পাবে।

স্নিগ্ধ বলেছিলো হেসে, 'সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।'

শেষমেষ বেরিয়েই পড়েছে দুই বন্ধুতে। যারা পরিশ্রম করে না তারা ছুটির মজাই জানে না। যার পরিশ্রম যত কঠোর তার ছুটিও তত মধুর। অনেকই পরিশ্রম করতে হয় ওদেব দুজনেরই। তাই ভারী ভালো লাগছে ছুটিতে এসে। রোদের তেজ তো নেইই বরং কাল রাতের ঝড়-বৃষ্টি-জনিত ঠাণ্ডা একটা হাওয়া আসছে পাহাড়ের দিক থেকে। চিরচিরি ঝিলটা পাহাড়ের উল্টো দিকে। যে ক'জন গেস্ট এখন এই হোটেলে আছেন তাঁদের বেশির ভাগই গেছেন ঝিল-এরই দিকে। ওদের পাহাড়ের দিকে যাবার আসল কারণ সেইটিই।

বাঙালিদের মতো ইন্কুইজিটিভ জাত বিধাতা তো আর দুটি সৃষ্টি করেননি পৃথিবীতে। বড় ঈর্ষা, দ্বেষ, ধোঁয়া, ধুলোয় মলিন নাগরিক-মানুষে একটু একলা হওয়ার জন্যে, নিজের পরিবেশ, অনুষঙ্গ, দৈনন্দিনতা, সব থেকে বিযুক্ত হওয়ার আশাতেই বাইরে আসে দুদিনের জন্যে। অথচ গড়পড়তা বাঙালির অভ্যেসই হচ্ছে সেই একাকীত্ব-খোঁজা অন্য বাঙালির ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার নাড়ি-নক্ষত্রর কথা জানা। তারপরই চেনা লোক বেরুবে, চেনা অফিস, চেনা বাড়ি। জানা যাবে নতুন করে যে, পৃথিবী খুবই ছোট্ট জায়গা। এবং তারপরই শুরু হবে বাঙালি যা খেয়ে বেঁচে থাকে, যার চেয়ে মুখরোচক তার কাছে আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; সেই পরনিন্দা আর পরচর্চা!

বাইরে এলেই তাই পর্ণা আর কলি বাঙালি দেখলেই পালায়। নইলে ইচ্ছে করেই ইংরিজিতে কথা বলে। লোকে ট্যাঁশ ভাবলে ভাবুক, নাক-উঁচু ভাবলে ভাবুক; নিজেদের প্রাণ তো তাতে বাঁচে!

শালবনের মধ্যে মধ্যে পথ। এখন রুখু রুখু ভাব এসেছে। চৈত্রের শেষ। তবে কালকের বৃষ্টি, রুক্ষতা ধুয়ে মুছে নিয়েছে। পাহাড় থেকে যে হাওয়াটা আসছে তার সঙ্গে মহুয়া, আমের বোল, কাঁঠালের মুচির গন্ধর সঙ্গে করৌঞ্জের গন্ধ ভেসে আসছে। পর্ণা আর কলি এই সব বনজ গন্ধ চেনে। জঙ্গল পাহাড়ে ওরা বহুদিনই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছুটি পেলেই জঙ্গলে ছোটে। পর্ণা বলে কলিকে, বিভূতিভূষণের বই-ই তোকে চিরদিনের আরণ্যক করে দিলো। ভদ্র-সভ্য নাগরিক হবার সম্ভাবনা নেই তোর আর কোনো!

কলি হাসে। বলে, তোকেও বুঝি করেনি! তারপরেই বলে, জঙ্গলমে মঙ্গল। যারা জানে, তারা জানে।

বাড়িটার নাম 'রায়চৌধুরী লজ'। দেখলি? বলেছিলাম তোকে আগেই।

হ্যাঁ।

স্নিগ্ধ, মানে এই মন্দার হোটেলের ম্যানেজার নিশ্চয়ই কিছু হয় মালিকের। তার পদবীও তো রায়চৌধুরী। তাই ধর!

হঠাৎ তুই মন্দার হোটেলের ম্যানেজারকে নিয়ে রিসার্চ শুরু করলি?

এমনি। কেন? বেশ তো মানুষটা!

একদিনেই কি মানুষ চেনা যায়। তুই তো দু বছর কোর্টশিপ করলি তারপর দেড় বছরের বিবাহিত জীবন, তাও তো বলিস যে, সুবর্ণকে চিনতেই পারিসনি।

সে তো অন্য ব্যাপার।

বিরক্তির গলায় বললো পর্ণা।

প্রসঙ্গটা এড়াতে চায় ও।

অন্য ব্যাপার মানে? এর মধ্যে আবার অন্য···

কী ব্যাপার সেটা?

ও তো-পার্ভার্টেড। এমন এমন জিনিস করতে বলতো যা তোকেও আমি বলতে পারবো না। এখনও ভাবলে গা ঘিনঘিন করে···

থাক। আমি শুনতেও চাই না। কিন্তু তুই জানলি কি করে যে সুবর্ণ যা-যাই করতে বলতো, তা-ই সুস্থ স্বাভাবিক দম্পতির স্বাভাবিক চাওয়া নয়, একে অন্যের কাছ থেকে? তুই তো এর আগে অন্য কারো সঙ্গে ঘরও করিসনি, কারো সঙ্গে শুসওনি। কি? বল?

তুই ঠিক বুঝবি না।

একবরে···

তুই এসবের কি জানিস?

কেন, তোকে তো বলেইছি যে একবার আমার হয়েছিল।···

শারীরিক সম্পর্ক! জানি। সেটা ধর্তব্যর মধ্যেই নয়! সে তো তোর দূর-সম্পর্কের এক ভাইয়ের সঙ্গে। বিয়েবাড়ির গণ্ডগোলের মধ্যে···। একেবারেই আকস্মিক দুর্ঘটনা। তাকে ঠিক শারীরিক সম্পর্ক বলে না। যৌবনের অসীম উদগ্র আদিম ঔৎসুক্যের বহিঃপ্রকাশ তা, এক ধরনের 'রেপ'ই বলতে পারিস। তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সুস্থ, নির্ভয়, নিশ্চিন্ত মিলনের সম্পর্কই নেই কোনো।

থাক! সুবর্ণর কথা এখন থাক। ওসব কথা তোমারই তোলা উচিত হয়নি।

মিষ্টি-রঙা রোদের মধ্যে ওরা হেঁটে যাচ্ছিলো।

শালগাছের নিচে নিচে লাল লাল ফুল ফুটেছে। ফুল-দাওয়াই বেগুনে-রঙা জারুল। দূরে দূরে পলাশ, শিমুল। লালে লাল হয়ে আছে প্রকৃতি। এদিকে গাছে গাছে কিশলয় এসেছে। কচি-কলাপাতা-সবুজ। পাহাড় থেকে ছুটে-আসা দামাল হাওয়াটা, কামুক পুরুষের অবাধ্য, অধৈর্য, অস্থির হাতের মতো শাড়ি-জামার আড়াল ভেদ করে ওদের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ঝকঝকে রোদের মধ্যে হিমেল পরশ দিয়ে যাচ্ছে। আঁচল উড়ছে সিল্কের শাড়ির। লাল আর হলুদ প্রজাপতি উড়তে উড়তে, হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ঘুরপাক খাচ্ছে

ওদের মাথার উপরে। পাহাড়ের সবুজ অন্ধকার কোল থেকে তিতির পাখি ডাকছে শিহর তুলে তুলে।

কলি ভাবছিলো, পার্থকে চিঠি লিখতে হবে একটা। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর। এই জায়গাটার কথা লিখবে। অবসর, বিশ্রাম, আরাম বোধহয় সব মানুষকেই রোম্যান্টিক করে তোলে। বন্ধু তো কতই আছে কলির। কিন্তু বিয়ে করতে পারে এমন বন্ধু ওর একজনও নেই। পার্থও তেমন বন্ধু নয়। তাছাড়া, বিয়ে করার জন্যেই বিয়ে করার পক্ষপাতিও নয় কলি। এই তো পর্ণাই তেমন করেছিলো। কী হলো! পার্থ কলির বন্ধু। জাস্ট, বন্ধুই।

পর্ণার মনটা খারাপ লাগছিলো। ভাবছিলো, সুবর্ণর যদি তার শরীরের উপর অমন উদ্ভট উদ্ভট দাবী না থাকতো তবে হয়তো ও সুবর্ণর সঙ্গেই এখানে আসতে পারতো। এই অখ্যাত অথচ সুন্দর জায়গাতে। কোনো খেলনা গড়ার কথা ভাবতো।

ডিভোর্সের পর পর্ণা একটি কুকুর পুষেছে। পর্ণার মায়ের দু'চোখের বিষ ছিলো আগে কুকুর। মা এবারে আর আপত্তি করেননি। বাবা থাকলেও হয়তো করতেন না। মায়ের কথার উপরে বাবা কোনোদিনও কথা বলেননি। হয়তো শান্তি রক্ষার কারণেই। বাবা থাকতে সে-কথাটা পর্ণা বোঝেনি। তখন সব ব্যাপারে মাকেই সাপোর্ট করেছে। বাবাকে অপমান পর্যন্ত করেছে মায়ের পক্ষ নিয়ে। বাবা আজ নেই বলেই বাবাকে আজকে বোঝে।

পর্ণা ভাবছিলো, কলির পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে যে, ওদের মা-বাবাদের জেনারেশানে শরীরটাতো অতখানি ইমপর্ট্যান্ট ছিলো না। তাছাড়া, বিরাট বিরাট যৌথ পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনকে কতক্ষণই বা পেতেন? এখনকার দম্পতিদের একে অন্যকে কাছে-পাওয়ার সময় যতই বেড়েছে, একা থাকা, আলাদা থাকার সুযোগ; ততই গণ্ডগোলও বেড়েছে। একে অন্যের কাছ থেকে চাহিদাও বেড়েছে। চাহিদাটা স্বাস্থ্যকর, বা ন্যায্য বা রুচিসম্মত কি-না তা নিয়ে মাথাব্যথাও কমেছে। অন্য দশটি আধুনিক অল্পবয়সী দম্পতি যা করছে, অন্যরাও দেখাদেখি তাই করছে। পোশাকে, মানসিকতায়, জীবনযাত্রায় সবাই 'প্রোটোটাইপ' হয়ে গেছে। 'ওরিজিনালিটি' শব্দটিই খারিজ হয়ে গেছে এখন।

মুখে কথা না বলে হাওয়ার সঙ্গে নিরুচ্চারে কথা বলতে লাগলো পর্ণা। হাঁটতে হাঁটতে।

সুবর্ণ শেষের দিকে বলতো পর্ণাকে, একটি ভিডিও ক্যাসেট এনে দেখাবে ও। সেই ক্যাসেটটি দেখলেই পর্ণা বুঝতে পারবে শরীরের মধ্যে কত আনন্দের উৎস লুকোনো আছে। শরীরের আলো জ্বালাবার সুইচগুলি ঠিকঠাক দিতে জানা চাই। আর তা জানলে, নারী ও পুরুষের তীব্র আনন্দ দ্বৈত উৎসারে একই সঙ্গে উৎসারিত হবে।

সুবর্ণ বারে বারেই জোর দিয়ে বলতো ;THE BODY IS EQUALLY IMPORTANT IN MARRIAGE। তোমাদের টিপিক্যাল মিডলক্লাস বেঙ্গলি ন্যাকামির দিন চলে গেছে। উ্য হ্যাভ টু মুভ উইথ দ্যা টাইম। অর গো টু হেল!

কিন্তু সেই ক্যাসেট দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি পর্ণা। এখন ভাবে, করলেই পারতো। কে বলতে পারে? মে বী, সুবর্ণ হ্যাড আ পয়েন্ট টু মেক।

কি ভাবছিস?

শুধালো কলি।

তুই?

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো পর্ণা।

কিছু না। কী ভাববো তাই ভাবছি।

ওদের কথার মধ্যে হঠাৎই চিকনডিহুর দিক থেকে উড়ন্ত অজগরের মতো একটি দমকা হাওয়ার ঝড় ধেয়ে এলো। ফুঁড়ে তেড়ে এলো। তার মাথা এগিয়ে আসতে লাগলো এদিকে আর ল্যাজ রইলো জঙ্গলের বুকে, পাহাড়ের কোলে। সড়সড় মচ্‌মচ্‌ শব্দে সেই হাওয়ার অজগর তার শরীরের মোমেন্টামের সঙ্গে শয়ে শয়ে শুকনো পাতা উড়িয়ে আনতে লাগলো নিচু দিয়ে। অজগরটা তাদের মাথার ঠিক উপরে এসে চকিতে ঊর্ধ্বপানে উঠে গেলো।

মন্ত্রমুগ্ধ, বিস্ময়াহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পর্ণা আর কলি।

অজগর সোজা হুস্‌হুসিয়ে উড়ে উঠে চক্কর কাটতে লাগলো। ওদের মাথার উপরে লাল ধুলো, শুকনো পাতা, খড়-কুটো মাথার উপরে ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো। কয়েকমুহূর্ত রইলো ঘূর্ণীটা। তারপরই সাপ নেতিয়ে পড়লো মাটিতে, মাথা লুটিয়ে; মাটির সঙ্গে, লালমাটির পথের সঙ্গে, রুখু লাল হয়ে-যাওয়া ঘাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলো। মুরগি ডেকে উঠলো চিকনডিহ্‌ গ্রাম থেকে—কক্‌র কু-অ-অ-। ছাগল ডাকলো ব্যা-এ-এ-করে। জননী ডাকলো সন্তানকে, আবে তিবুয়া-আ-আ হো-হো-ও-ও-ও।

ওরা দু'জনে যেন সংবিৎ ফিরে পেলো।

দারুণ অভিজ্ঞতা! এর আগে কখনও ঘূর্ণিঝড় দেখিনি। তুই দেখেছিলি? পর্ণা?

কলি বললো।

না সত্যিই দারুণ। তবে আমি নদীতে জলের ঘূর্ণী দেখেছিলাম একবার। ইছামতী নদীতে।

পর্ণা বললো।

কতদূর এলাম রে আমরা?

অনেক দূর চলে এসেছি। ঐ তো দূরে গ্রামের মাটির বাড়িগুলোর সাদা দেওয়ালে কালোরঙে আঁকা সব ছবি। দেখতে পাচ্ছিস না? এখন তো ছবিগুলো বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। তার মানে, অনেকটাই এসে গেছি।

কতগুলো ছবি, লাল আর হলুদ রঙেরও আছে। তাই না? দ্যাখ।

পর্ণা হঠাৎ হেসে বললো, কী মনে পড়ে যাওয়াতে; ছোড়দাটা কেবলই বলতো, ছোট বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হলেই, 'আমার কী! আমি চলে যাবো। একটি চাহিদাহীন আদিবাসী মেয়ে বিয়ে করবো। নিকোনো তক্‌তকে উঠোন, ঝকঝকে বাড়ি, মাটির দেওয়ালে ছবি আঁকা থাকবে। সে মেয়ের তোমার মতো সর্বগ্রাসী চাহিদা থাকবে না। সে নিজে হাতে খিচুড়ি রেঁধে দেবে। শীতকালে

বুকে জড়িয়ে ওম্ দেবে। গরমে শীতল পাটির উপর শুইয়ে পাখার বাতাস করবে। মাসে 'আনন্দবাজার'-এ একটি গল্প ছাপা হলেই যে হাজারটা টাকা পাবে, তাতেই আমার মাসের খরচ চলে যাবে। এতো অশান্তি আমার ভালো লাগে না।'

কিন্তু সবই তো আকাশ কুসুম! করলো কই? ছোড়দা তোর?

কলি বললো।

যারা করে, তারা অত তড়পায় না। কোয়ায়েট্লি কেটে পড়ে। বুঝলি! আসলে, যে-মানুষ অন্যকে দুঃখ দিতে না পারে, এই সংসারে তার সুখী হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। দুঃখের সঙ্গেই তার হাতকড়া। সারাটা জীবনই।

কি করছেরে ছোড়দা এখন? তোর জ্যাঠতুতো দাদা না? আমার দারুণ লাগে ভদ্রলোককে। লেখেনতো বটেই, কী ভালো ছবিও আঁকেন!

হ্যাঁ জ্যাঠতুতো দাদা। আমারও দারুণ লাগে। বোনেদের কাছে আইডিয়াল ছিলো, আমাদের সব কাজিনস্দের কাছেই।

কি করছে? সেই চাকরিই? চাকরিটা তো মস্তই বড় তাই না? অত্যন্ত রেসপনসিবিলিটিরও!

হ্যাঁ যা করছিলো মস্ত চাকরি। নিজেকে নিরন্তর অভিশাপ দিচ্ছে। এই রকমহ আল্টিমেটাম্ দিচ্ছে রোজ রোজ, আর ছোট বৌদির জন্যে চাঁদ, তারা, বৃহস্পতি, বুধ সব সাপ্লাই করে যাচ্ছে। মানুষটা ছবি আঁকতে পারে বলেই এখনও বেঁচে আছে। ইজেলের সামনে দাঁড়ালেই সব ভুলে যায়। সব দুঃখ-কষ্টের কথা। ছোটবৌদির আমার দাবীরও শেষ নেই। সত্যি! কিছু মানুষ থাকেন সংসারে, যাঁরা গোছগাছ করতে করতেই জীবন শেষ করে দেন; বাঁচার জন্যে সময়ই করতে পারেন না একমুহূর্তও। তারপরে একদিন সাজানো ফ্ল্যাট, সখের ক্রকারি, সখের কাট্লারি, অ্যান্টিক ফার্নিচার, যামিনী রায় থেকে গণেশ পাইন, প্রকাশ কর্মকার থেকে সুহাস রায়দের ওরিজিনাল ছবি—সব রেখে একবস্ত্রে ইলেকট্রিক ফার্নেসে ঢুকে যান। বখা ছেলে, দাম্ভিক পুত্রবধূ, চালিয়াত জামাই বা উদাসীন মেয়ের হাতে সব তুলে দিয়ে। জীবনে বেশি বাড়াবাড়ি রকমের সংসারী বা গোছালো স্বভাবের মানুষদের বাঁচার সময় প্রায়ই হয়ে ওঠে না।

কথাটা ছোটবৌদিকে বুঝিয়ে বলিস না কেন?

ওসব মানুষ এক্সেনট্রিক। আধা-পাগলা হয়। বোঝাতে গেলে কামড়েও দিতে পারে। তাছাড়া, সেই মানুষটির নিজের গুণও তো কম ছিলো না। শিশিরকণা ধরচৌধুরীর কাছে শিখতো। অমন বেহালা কম মানুষই বাজাতে পারেন। যদি শুনিস, তো শুনলে, তোর চোখে জল এসে যাবে। গুণী মানুষেরা একটু ক্ষ্যাপাটে হনই!

ছোড়দাও ক্ষ্যাপাটে তোর। বেশ ক্ষ্যাপাটে। বললে কী হয়। আমি তো দেখেছি কাছ থেকে!

তা ঠিক। তবে ছোড়দাকে তো চাকরিটা অবহেলা করলে চলে না। পুরো

দস্তুর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিনে দশ ঘণ্টা চাকরি করে তারপরই তাকে নিজস্ব সখের কাজ করতে হয়। তার কষ্টটা আমি বুঝি। অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় রে মানুষটাকে! তার উপরে একমুহূর্তেরও শান্তি নেই। যে-কোনোদিন চলে যাবে। দেখিস। শরীরও ভালো নয়।

সেটা কোনো কথা নয়। ছোটবৌদিও আগে যেতে পারেন। যাওয়ার কথা কেউ বলতে পারে? কে আগে গেলেন, কে পরে গেলেন সেটা অবান্তর। জীবনে যদি বাঁচাই না হলো একটু শান্ত হয়ে বসে, একটু মিষ্টি কথা, একটু ভালো গান বাজনা, ভালো খাওয়া-দাওয়া, তবে এই লড়াই-এর প্রয়োজনটাই বা কি? জীবিকাই যদি জীবনকে গ্রাস করে ফেলে, জীবনের জন্যে একফালি জমিও যদি উদ্‌বৃত্ত না থাকে, তবে তোর ছোড়দার উচিত সত্যি সত্যিই চলে যাওয়া। আদিবাসী মেয়ে বিয়ে করেই থেকে যাওয়া বাকি জীবন। জীবন তো আর অনন্ত নয়। এতো বোঝেন, এতো জ্ঞানী মানুষ; আর এটুকু বোঝেন না? 'এই করবো' 'সেই করবো' করতে করতেই তো জীবন শেষ হয়ে যাবে।

হয় না রে। অত সোজা নয়। যারা ভুল বুঝতে পেরে সাত তাড়াতাড়ি ঝামেলা চুকিয়ে দেয় তারাই বুদ্ধিমান। বেশিদিন হয়ে গেলে, অভ্যেসে জড়িয়ে গেলে; ছেলেমেয়ে এসে গেলে; তখন বোধহয় নিষ্ঠুর হওয়া আর যায় না। সব কষ্ট নিজের বুকে নিয়েই বাঁচতে হয় আজীবন, এই সংসারের কারাগারে। কত মানুষকে দেখলাম এ-পর্যন্ত! কত জ্ঞানী গুণী। নিজের জীবনে সেই জ্ঞান তো প্রয়োগ করতে দেখলাম না কাউকেই। তাছাড়া, এ কারাগারে ফটক থাকে না, গরাদ থাকে না, কিন্তু এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কোনো কারাগারই দেয় না।

আসলে, আমার মনে হয় কি জানিস? সংসারে দুজন গুণীর কখনও বিয়ের মধ্যে যাওয়াই উচিত নয়। আমি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। সেই সব সম্পর্ক হয় ছিঁড়ে যায়, নয়তো বড় কষ্ট করে টিঁকিয়ে রাখতে হয়। একজন গুণী হবে; অন্যজনে তার গুণগ্রাহী। সেই দাম্পত্যই সব চেয়ে সুখের দাম্পত্য।

আমার কেবলই ভয় হয়, ছোড়দাটা সুইসাইড-ফুইসাইড না করে বসে। ওর মধ্যে সুইসাইডাল টেনডেন্সি আছে। কাউকে বলিস না, একবার মরতে গেছিলোও বছর দুয়েক আগে।

সে কী রে। ভারী দুঃখ হলো শুনে। ওদের মতো মানুষদের কাছে আমাদের কত কী প্রত্যাশার আছে, কত দীর্ঘদিন ধরে ওঁরা আমাদের কতকিছু দেবেন। ওঁরা কেন এমন করে যেতে যাবেন? চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবেন?

এমন সময়ে পেছন থেকে সাইকেলের বেল বাজলো কিরিং কিরিং করে।

পর্ণা বললো, বাঁ দিকে সরে আয়। কলকাতা থেকে এসে সাইকেলে চাপা পড়ে হাত-পা ভাঙলে লজ্জার শেষ থাকবে না আর।

কিন্তু সাইকেলের আরোহী তাদের পেরিয়ে না গিয়ে তাদেরই ঠিক পেছনে নেমে পড়ে বললো, দেড় ঘণ্টায় দু' মাইল। বেশ ভালোই স্পীড বলতে হবে।

মিল্‌খা সিং-এর চেয়ে বা পি. টি. উষার চেয়ে অতি সামান্যই কম।

ওরা একই সঙ্গে পেছন ফিরে দেখলো, প্রণয়। চরণে বাথরুম স্লিপার। পরনে সেই হাওয়াইন শার্ট আর জিনের ট্রাউজার।

কলি, পর্ণার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো।

বাঃ! আমি তো দেখেছি ওঁকে রিসেপ্‌শানে। আজ সকালেই। তা এদিকে কী করতে?

আপনাদের ম্যানেজারসাহেব কি আমাদের এসকর্ট করে নিয়ে যেতে পাঠালেন নাকি আপনাকে?

প্রণয় হাসলো। হাসলে, ওর কুচকুচে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কালো গালে টোল পড়ে। চোখ দুটি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, ঝকঝকে। মাথা ভরা চুল। কোঁকড়ানো ভাব আছে একটু।

আসলে আমার মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কাল তো সেজন্যেই রাতে তাড়াতাড়ি চলে গেছিলাম। আপনারা স্টেশন থেকে আসা অবধি অপেক্ষা করতে পারিনি। তাই স্নিগ্ধ বললো, 'একবার দেখে আয় মাকে, ওষুধ-পথ্য দিয়ে আয়।'

ওষুধ-পথ্য আপনি দেবেন কেন? বাড়িতে আপনার স্ত্রী নেই? এদিকে কোথায় বাড়ি আপনার?

চিকনডিহ্‌তেই। স্ত্রী যে সকলেরই থাকতেই হবে তার মানে কি? তাছাড়া সময়ও তো আছে অঢেল।

প্রণয় হাসিমুখেই বললো। সবসময়েই হাসে মানুষটা।

চিকনডিহ্‌ তো আদিবাসীদের গ্রাম!

হ্যাঁ। আমিও তো আদিবাসীই। মানে, আমার মা আদিবাসী, বাবা বাঙালি। স্নিগ্ধর বাবার যিনি হেড ড্রাইভার ছিলেন, তিনিই আমার মাকে বিয়ে করেন। তাঁর নাম ছিলো বাঁটু রুদ্র। আমার বাবা।

তাই?

বিস্ময়ে বললো ওরা দুজনে, সমস্বরে।

তা আপনি এগিয়ে যান।

না, না। ঠিক আছে। রাতে মা ভালোই ছিলেন। ঐ স্নিগ্ধটার কচ্‌কচানিতেই আসতে হলো। চলুন, আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই। আপনাদের যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে কোনো।

আপত্তি? আমাদের? বাঃ রে। আপত্তির কি থাকতে পারে?

স্নিগ্ধবাবুর বাবা কি করতেন? ওঁরা কি এখানকারই মানুষ?

কলি শুধোলো।

ওরে বাবা! পুরো জেলাতে অতবড় উকিল ছিলেন না আর কেউই। দিনে দশ হাজার রোজগার ছিলো তখনকার দিনে। তার মধ্যে সাত-আট হাজার তো দাতব্যই করতেন। কত গরীব ঘরের ছেলে এ বাড়িতে ও জামশেদপুরে থেকে মানুষ হয়েছে যে, তার লেখাজোখা নেই। ওরকম মানুষ কমই হয়।

'রায়চৌধুরী লজ' কাদের বাড়ি ?

স্নিগ্ধদেরই বাড়ি।

তাই ?

বলেই, পর্ণা এক ঝলক তাকালো কলির মুখে। ভাবটা, কীরে! বলেছিলাম না ?

মালিক কে ?

ঐ মালিক। মানে, স্নিগ্ধই। তবে যতদিন দাদু বেঁচে আছেন ততদিন 'দাদুর দেখাশুনো তো ওকেই করতে হবে! যদিও দাদু সব ওকেই লিখে দিয়েছেন। বাড়িটা আর কি দেখছেন ? এতো হোয়াইট এলিফ্যান্ট। ওদের কত সম্পত্তি যে আছে তার হিসেব এখনও করারই সময় হয়নি। দাদু চলে গেলে তখন জামশেদপুরের নীলু উকিল বলেছেন, ঠাণ্ডা মাথায় সব করবেন।

বলেই বললো, আমি যে এসব বলেছি স্নিগ্ধকে বলবেন না যেন। আমার চাকরিটাই "নট্" হয়ে যাবে তাহলে।

ওরা দুজনেই প্রণয়ের কথার ভঙ্গীতে হেসে উঠলো।

আপনার কথা তো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। যার এতো আছে সে কি-না এই ছাতার হোটেল চালায় ?

প্রণয় হাসলো। বললো, অমন করে বলবেন না। ওর না হয় অনেক থাকতে পারে। কিন্তু আমার যে ঐ ছাতার হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারী ছাড়া আর কিছুই নেই।

তারপর বললো, শুধু যে রোজগারের জন্যেই চালায়, তা নয়। পিতৃ-প্রপিতামহর আদি বাসটি যেন বসবাসের অযোগ্য না হয়ে ওঠে সেই জন্যেই ঘরে ঘরে আপনাদের মতো মানুষদের রাখা।

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটাতে হাত বদল করে প্রণয় বললো, বাথরুমের মার্বল-এর বাথ্‌টাবটি দেখেছিলেন ? ঐ ঘরে স্নিগ্ধর দিদি, স্মিতা থাকতেন। তিনি মারা যান টাইফয়েডে। বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর। হঠাৎই। ঐ ঘর যাকে তাকে তো দেওয়াও হয় না। বাথটাব্‌টি দেখে মনে হয় কি এই বাড়ি অব্যবহৃত ?

না। তা একেবারেই হয় না। সেকথা একশবার সত্যি! আমরা দুজনে গত রাত থেকে শুধু সেই কথাই বলাবলি করছিলাম। শুধু বাথ্‌টাবই-বা কেন ? কী, সুন্দর নয় ? জাপানী বোন-চায়নার ক্রকারি, ইংলিশ কাট্‌লারি, জার্মানীর রোজেনথাল্-এর ফ্লাওয়ার-ভাস্, ইটালীর গুচ্চির চামড়ার জিনিস কি হেঁজিপেঁজি লোকের বাড়িতে থাকে ? তাছাড়া বাড়িতে তৈরি পেয়ারার জেলি, আমলকির জ্যাম, কখনওই খাইনি আগে। ব্রাউন-ব্রেড। এমন জঙ্গলী জায়গাতে। আপনাদের বেকারীটি দারুণ। এই ট্র্যাডিশান যে একদিনে গড়ে ওঠার নয় সেই কথাই আমরা আলোচনা করছিলাম।

তাছাড়া, স্নিগ্ধর টাকার কোনো লোভ নেই। প্রণয় বললো। অদ্ভুত টাইপের ছেলে ও। মানে, আছে হয়তো লোভ কিন্তু নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে নয়। দাদুর অবর্তমানে এই বাড়িতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস হবে। স্কুল ও

কলেজ করবে স্নিগ্ধ নতুন বাড়ি বানিয়ে। এখন তো ইচ্ছা থাকলেও কিছুই করা যাবে না। সব ব্যাপারেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ। পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্টের টাকাও তো সরকারী লগ্নীতেই লগ্নী করে রাখতে হয়। অথচ অন্যান্য লগ্নীতে রাখতে পারলে দ্বিগুণ লাভ হতো। সব ব্যাপারে এমন শিবঠাকুরের আইন তো কম দেশেই আছে! এখানে সৎপথে তাড়াতাড়ি টাকা বাড়াবার কোনো উপায়ই নেই। তা না হলে, এতোদিনে কত টাকা হয়ে যেতো। স্নিগ্ধর দাদুর সম্পত্তির কথা ছেড়েই দিলাম, বাবাই যা বিভিন্ন ট্রাস্টে রেখে গেছেন তা দিয়ে এই নিদপুরার চেহারাই পাল্টে দেবে স্নিগ্ধ। পঞ্চাশ মাইল দূর দূর থেকে ছেলে মেয়েরা পড়তে আসবে। রেসিডেন্সিয়াল কলেজ করবে স্নিগ্ধ এখানে। ছেলেমেয়েদের আলাদা আলাদা হস্টেল, স্টাফ-কোয়ার্টার্স, অডিটরিয়াম, ইনডোর ও ওপেন-এয়ার খেলার মাঠ, আউটডোর স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল। হাসপাতালে সবরকম আধুনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি আনবে। ডাক্তার ও নার্সদের, মেল ও ফিমেলদের আলাদা আলাদা কোয়ার্টার্স। ক্লাব, বাজার, ট্রান্সপোর্ট সেন্টার। সোলার-পাওয়ার দিয়ে নিজেদের সব চাহিদা মিটোবে। ভারতবর্ষের মধ্যে এক আদর্শ জায়গা হয়ে উঠবে আজকের ঘুমন্ত এই নিদপুরা। নিদপুরার নাম বদলে দেবে স্নিগ্ধ। রায়চৌধুরীপুরী নাম দেবে। তার একপাশে থাকবে বিধুভূষণ আর মাধুরীবালা হাসপাতাল। ছেলেদের আর মেয়েদের কলেজ। অন্যদিকে বিপ্রদাস আর সুস্মিতা কলেজ। মেল আর ফিমেল ব্লক, হাসপাতালের।

এতোখানি একসঙ্গে বলে চুপ করে গেলো প্রণয়। দাঁড়িয়ে পড়লো।

বোধহয় নিজেই ভাবলো, এতোখানি বলার কি দরকার ছিলো।

তারপর বললো, আপনাদের বোর করলাম।

কলি ভাবলো, মন্দের ভালো যে প্রণয় সেই ধরনের মানুষ নন, যাঁরা কথা বলতে আর হাঁটতে পারেন না একই সঙ্গে।

পর্ণা বললো, এই বিরাট যজ্ঞে আপনার কি ভূমিকা হবে?

প্রণয় রুদ্র লাজুক হাসি হাসলো। বললো, এদেশে সকলেই পাদপ্রদীপে থাকতে চায় বলেই তো দেশের কিছু হলো না। আমার ভূমিকা হবে, 'আই অলসো র‍্যান।' সকলকেই যে ফার্স্ট হতে হবেই তার কী মানে? যারা প্রথম হয় না, তারাই তো প্রথমকে প্রথম করে, না কি?

বাঃ। শুনেও ভালো লাগলো। আপনি বাংলা ইংরিজি দুটোই ভালো বলেন কিন্তু।

তাই?

যেন জানে না নিজে, এমন গলাতে বললো প্রণয়।

ভাবলেও গায়ে শিহরন খেলে যায়। এই পুরো এলাকাটিকে আর চেনাই যাবে না। রমরম করবে একেবারে।

ডান হাত দিয়ে দুদিকে ঢেউ খেলিয়ে বললো প্রণয়, দারুণ নয়। বলুন?

হুঁ।

কলি বললো।

দারুণ হবে বটে। কিন্তু আমরা তো আর আসতে পারবো না। এই নির্জনতাই মাঠে মারা যাবে। পাখি ডাকবে না, থাকবে না এই জঙ্গল ; এমন হাওয়া আসবে না পাহাড় থেকে। তাছাড়া 'মন্দার হোটেল' যদি না থাকে তো আমাদের এসব শুনে লাভ কি ?

কলি বললো।

আমরা এসে উঠবো কোথায় ?

থাকবে। থাকবে। সব বন্দোবস্ত থাকবে। মন্দার হোটেল নতুন করে করা হবে ঐ চিকনডিহ পাহাড়ের ওপরে। বনবিভাগের সঙ্গে সব কথাও হয়ে গেছে। ঐ পাহাড়ের ওপাশটাতে ফুলের উপত্যকা। কখনও আসবেন শরৎ কালে। নিয়ে যাব আপনাদের। সেই হোটেলের চারপাশে ঘোরানো বারান্দা থাকবে। ষোলটি ঘর থাকবে ডাবল-বেড। পেছনের বারান্দা থেকে ওপাশের উপত্যকা আর গভীর জঙ্গল দেখা যাবে। 'টাইগার-প্রোজেক্টের' মতো ওদিকে বনবিভাগ 'এলিফ্যান্ট প্রোজেক্ট' গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। দলমা পাহাড়ের হাতিরা এখানেও আসবে। এবং হয়তো থাকবেও। সামনের বারান্দাতেও বসে নতুন নিদপুরা দেখা যাবে, থুড়ি, চৌধুরীপুরী। ঝিলের পাশে পাশে কটেজ হবে। এক পারে ছেলেদের জন্যে অন্য পারে মেয়েদের জন্যে। মানে ডর্মিটরী। মধ্যে নৌকো থাকবে। রাজহাঁস ছাড়া হবে। নানারকম গাছ লাগানো হবে। দ্বীপ বানানো হবে। প্রতি বছর শীতে তো মাইগ্রেটরী বার্ডস আসেই নানারকম এই চিরচিরি ঝিল-এ। তখন আরও বেশি করে আসবে। জানেন, একটিও গাছ না কেটে এই পুরো কমপ্লেক্স বানানো হবে।

এইসব কথা বলতে বলতে প্রণয়ের চোখ মুখ যেন দৃপ্ত হয়ে উঠলো। ও যেন অনুপ্রাণিত হয়ে রয়েছে নিদপুরা চিকনডিহ্‌র আসন্ন রূপান্তরের স্বপ্নে।

ভালো লাগলো কলির। যে যুগে স্বপ্ন দেখা ভুলে গেছে মানুষ, সেই যুগে কোনো স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে যে, একথা ভেবেই ভালো লাগে।

থাক। পর্ণা বললো, তাহলে আমাদের যখন চুল পেকে যাবে, দাঁত পড়ে যাবে, তখন একবার এসে স্নিগ্ধবাবুর নতুন হোটেলে থেকে যাওয়া যাবে। ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি নিয়ে আসবো না-হয়।

ঠাট্টা করবেন না ম্যাডাম। এতোদিনে সব শেষও হয়ে যেতে পারতো। ব্লু-প্রিন্ট সব তৈরি। অ্যামেরিকাতে, কানাডাতে এন. আর. আই. ডাক্তার অধ্যাপক সকলের সঙ্গে কথাবার্তাও পাকা হয়ে আছে। ওঁরা দেশের জন্যে কিছু করতে চান, যেমন স্নিগ্ধও চায়। পুরো পাঁচ বছরেই সব কটি প্রোজেক্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে। দাদুর জন্যেই স্নিগ্ধ একটি প্রোজেক্টেও হাত দিচ্ছে না। তাছাড়া ব্যাঙ্কে ক্রেডিট-স্কুইজ। কবে টাকা ছাড়বে ব্যাঙ্ক কে জানে। টাটা কোম্পানিও অনেক টাকা দেবেন।

কেন ? দাদুর কি আপত্তি ? আপত্তি কেন ?

না, মা। আপত্তি নয়। আসলে দাদু পঞ্চাশ বছর আগে এই বাড়ি বানিয়েছিলেন তো ঘন জঙ্গলের মধ্যে। তখন বাড়ির ভিতরে বাঘ আসতো। শম্বর, চিতল হরিণ সব জংলী কুকুরের তাড়া খেয়ে পাঁচিলের ধারে পালিয়ে আসতো।

বনের ময়ূর বাড়ির বাগানকে বন ভেবে ভিতরে এসে বসতো। দাদু তাঁর দোতলার ঘর থেকে দেখতেন। তখনও যে ইজিচেয়ারটিতে বসে থাকতেন সকালে বিকালে কাজ সেরে এসে, এখনও সেই ইজিচেয়ারটিতেই বসেন। তাঁর জগৎ অনেকখানিই বদলে গেছে যদিও, তবুও এই বাড়ি এই পরিবেশ সবই তাঁর প্রিয়। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূর স্মৃতিজড়িত। তাই স্নিগ্ধ, দাদুকে শেষের দিনের এইটুকু শান্তি দিতে চায়। চারধারের ক্রিয়াকাণ্ডে দাদুর শান্তি বিঘ্নিত হবে।

কোনো মানে হয় না। এতো বড় একটা, একটা মানে একাধিক প্রোজেক্ট, একজন বৃদ্ধর মৃত্যুর দিন গুনবে বসে বসে।

কলি বললো।

এমন সেন্টিমেন্ট আমাদের দেশেই সম্ভব। সত্যি !

পর্ণা বললো।

প্রণয়ের মুখ কালো হয়ে গেলো। একথা আমি বলেছি, বলবেন না যেন স্নিগ্ধকে। ও বড় দুঃখ পাবে। ও এমনই। তাছাড়া আমার আপনার কি বলুন তো ? যে গড়বে, তারও তো কিছু ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে, না কি ? তাছাড়া দাদু আর ক'দিন ?

তা ঠিক !

পর্ণা বললো। তাছাড়া, আমাদের মাথাব্যথার দরকারই বা কি ? এবার প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। নিজেরা এসেছি নিজেদের মাথার হাজারো ঝামেলা ভুলতে আর আপনি কী বলুন তো ? আমাদের মাথায় অন্য এক মহারাজের নতুন সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা চাপিয়ে দিলেন। সেই ভারেই চাপা পড়ে মরতে হবে দেখছি। মজা করা আর হবে না।

প্রণয় বোকার মতো হাসলো। অপ্রতিভ হাসি।

ততক্ষণে ওরা গ্রামে পৌঁছে গেছে। গ্রামের ভিতরে ঢুকতেই দেখলো যে দ্বিতীয় ঘরটির দাওয়াতে একজন মহিলা বসে আছেন। অপরূপ সুন্দরী। লাল পেড়ে শাড়ি পরে। প্রৌঢ়া।

কলি বললো, গ্রাম দেখতে এলাম। আপনার নাম কি ?

মুঙ্গলি। এসো এসো, বোসো মায়েরা। বোসো। দাঁড়াও। পাটিটা আনি।

হেসে বললেন সেই সম্ভ্রান্ত চেহারার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আদিবাসী মহিলা।

বলেই বললেন, এ কাদের আনলি রে প্রণয় ? এদের তো আগে দেখি নাই।

ওদের চমক ভাঙিয়ে দিয়ে প্রণয় বললো, এই আমার মা। বুঝলেন ?

আপনার মা ?

ওরা দুজনে সমস্বরে, সবিস্ময়ে বললো। এবং কোনোরকম যুক্তি পরামর্শের আগেই কলি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো মহিলাকে। পর্ণারও না করে উপায় ছিলো না বলে সেও করলো। যদিও প্রণাম-ফ্রণাম সে বড় একটা পছন্দ করে না। তবে মাঝে মধ্যে করেও ফেলে পেটে যাতে চর্বি না জমে তার জন্যে। কারো প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্যে নয়।

প্রণয় হাসলো। বললো, তুমি বসো মা। আমি ওঁদের জন্যে কিছু খাবার আনছি ভিতর থেকে। হন্‌সো কি নেই নাকি?

না। সে গেছে মথুরাপুরের বড় বাজারে। চাল ডাল কিছু নাই। হাট তো লাগবে চিকনডিহ্‌তে পরশু দিন।

প্রণয় ভিতরে চলে গেলো সাইকেলটাকে দাওয়াতে ঠেস দিয়ে রেখে।

তোমরা কোথা থেকে এসেছো গো মা?

কলকাতা।

পর্ণা একটু ইন্‌ডিফারেন্ট গলাতে উত্তর দিলো।

কলি আড় চোখে চেয়ে পর্ণার শৈত্যর কারণে ভ্রূকুঞ্চন করলো।

তাই? কলকাতাতে তো আমার এই ছেলে পড়াশোনা করতে গেছিলো। ছ'টি বছর সেখানে হস্টেলে থেকে পড়েছে।

তাই? প্রণয়বাবু?

প্রায় আতঙ্কিত গলাতেই শুধোলো ওরা দুজনে একই সঙ্গে।

হ্যাঁগো। ওকে আবার প্রণয় বলে ডাকলে সে চটে যায়। বলতে হবে রুক্ষ! দ্যাখো তো! বাপে নাম দে গেছলো আদর করে। সেই নাম কেটে দেবার আমি কে এলম্‌!

কোন্‌ কলেজে, বললেন না তো? কোন্‌ কলেজে পড়তেন?

ঐ তো সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতার। আমার মেয়ে হন্‌সোও তো প্রেসিডেন্সীতে পড়েছে।

পর্ণা, প্রণয়ের মায়ের চোখের আড়ালে কলিকে চিমটি কাটলো। দুজনেই হতবাক হয়ে গেছিলো। এতোক্ষণ প্রণয় যে একজন মানুষ, মানে, 'গেঁয়ো' মানুষ নয়, তা ধারণার মধ্যেই আনেনি। তবে ওর কাটা-কাটা চোখ-মুখ, কুচকুচে কালো রঙ ও চুলের গড়ন দেখে ওর মধ্যে যে আদিবাসী রক্ত থাকতেও পারে তেমন সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মেরেছিলো দু-একবার। তবে সপ্রতিভ ও খুবই অথচ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজনিত কোনো বারফাট্টাই আদৌ নেই।

একটি ছোট্ট ধামাতে করে মুড়ি আর বাতাসা নিয়ে এলো প্রণয় আর ঝকঝকে করে মাজা পেতলের ঘটিতে করে জল। দুটি গ্লাস।

ওরা দুজনে কেমন ফ্যাকাসে মেরে গেছিলো। প্রণয়ের সঙ্গে কথা বলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল যেন এখন।

ওদের মুড়ি-বাতাসা দিয়ে গেলাসে জল ঢেলে দিয়ে প্রণয় বললো, ভালো করে জিরিয়ে নিন একটু। আজকে তো গরম নেই। আমি একটু কাজ সেরেই আসছি পাঁচ মিনিটে। তারপর একসঙ্গেই ফেরা যাবে।

গরম নেই যদিও তবু অনভ্যস্ত কলি ও পর্ণার মুখ এতোখানি হেঁটে লালচে ও বেগুনি হয়ে গেছিলো। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিলো নাকের ডগাতে।

ওদের দিকে চেয়ে প্রণয়ের ভারী ভালো লাগছিলো। যুবতী নারীর সান্নিধ্য পুরুষের শরীরের মধ্যে কতরকম বৈকল্যই যে ঘটিয়ে দেয় তা প্রত্যেক পুরুষই মর্মে মর্মে জানে। মনের মধ্যেও ঘটায়।

তার চেয়ে সাইকেলটাই আমাদের দিয়ে দিন না কেন। কেরিয়ার তো আছেই। আমরা দুজনে চলে যাবো ডাবল-ক্যারী করে।

হাঃ। এই পথে সাইকেল চালানো সোজা কথা নয়। এ কী পথ নাকি? উঁচু-নিচু, কাঁকর-বালি, গর্ত-নালা। অভ্যেস নেই, পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙলে স্নিগ্ধর কাছে গালাগালি খেয়ে মরতে হবে। তার চেয়ে যদি রাজী থাকেন তো একজন কেরিয়ারে বসুন, অন্যজন রড-এ। আমিই চালিয়ে নিয়ে যাবো যদি হাঁটার সখ আপনাদের ইতিমধ্যেই উবে গিয়ে থাকে।

ওরা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো একটুক্ষণ। তারপর বললো, সে দেখা যাবে'খন। আপনি কাজ সেরে আসুন তো।

ক'দিন থাকবে মা এখানে তোমরা? আবারও এসো। নাম কি তোমাদের?

পর্ণা বললো, চার-পাঁচদিন। কলি নাম বললো দুজনের।

বাঃ! সুন্দর নাম দুজনেরই।

প্রণয় চলে গেলে, পর্ণা বললো, কী বিষয় নিয়ে পড়েছিলেন প্রণয়বাবু? কলকাতাতে?

ইকনমিক্‌স্‌।

যেমনভাবে শব্দটি উচ্চারণ করলেন মহিলা, তাতে মনে হলো ইনিও ইংরিজি জানেন। যদিও ইংরিজি জানা আর শিক্ষা সমার্থক একথা ওদের দুজনের কেউই মানে না, তবু-অবাক লাগলো খুবই।

প্রণয়ের মা মুঙ্গলি বললেন, রেজাল্ট তো খুবই ভালো করেছিলো। বাবু, মানে, স্নিগ্ধবাবুর বাবা, ওকে লান্‌ডান স্কুল অফ ইকনমিকস্‌-এ পাঠিয়ে পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্নিগ্ধ বিলেতে গেলো না বলে আমার প্রণয়ও গেলো না। এম. এ. অবশ্য পড়লো তোমাদের ঐ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেই। এম. এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওর বাবার শরীরটা হঠাৎই খারাপ হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিসে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। ডায়াবেটিস থেকেই স্ট্রোক হলো। ছেলে বললো, আমার যা জমি আছে তাতে হাল দিলে মা বোনের আর দু'বেলার খাবার চলে যাবে। আমার বিদ্যে আগে, না বাপ আগে? এই বলে তো সে চলে গেলো। আসলে তো ও স্নিগ্ধরই ছায়া। যেন যমজ ভাই। একে অন্যকে ছেড়ে একমুহূর্তেও থাকতে পারে না।

আর স্নিগ্ধবাবু?

স্নিগ্ধও তো ঐ কলেজেই পড়তো। ও পড়তো ইংরিজি নিয়ে। গ্র্যাজুয়েশনের পর কম্পারেটিভ লিটারেচারে এম. এ. করে ফিরে এলো। তাও তার দাদুকে দেখাশোনার জন্যেই। বললো, বিলেত আমেরিকা গেলে কী লেজ গজাবে? দাদুকে কে দেখবে?

কোথায় পড়েছিলেন এম. এ.?

ঐ তোমাদের কি যেন বলে? হ্যাঁ, যাদবপুর বলে কোনো জায়গা আছে কলকাতার? সেখানেই পড়েছিলো।

তাই?

কলি সাহস করে বলেই ফেললো, দু'বন্ধুই তো আশ্চর্য মানুষ। একজন

ইকনমিকস্‌-এ অন্যজন তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ.। তারপর এই নিদপুরাতে এসে 'মন্দার হোটেল' চালাচ্ছেন।

কী লাভ হলো তাহলে এতো লেখাপড়া করে ? পর্ণা বললো।

প্রণয়ের মা মুঙ্গলি কথাটতে যেন এক মস্ত ধাক্কা খেলেন।

সামলে নিয়ে বললেন, আমার কথাতে কিছু মনে করোনা মা তোমরা। পড়াশুনা করে তোমাদের যা লাভ হয়েছে আমার স্নিগ্ধ আর প্রণয়ের তার চেয়ে বেশি ছাড়াতো কম হয় নি কিছু। পড়াশুনা করে গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে আসবে, গাঁয়ের মানুষের ভালো করবে, তাদের জাগাবে, তাদেব সবাইকেই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবে, লেখাপড়া শেখা তো সেই জন্যেই। তোমাদের ট্যানিভার্সিটিতো গন্তব্য নয় ; আরম্ভ মাত্র।

একটু থেমে বললেন প্রণয়ের মা, আমার স্নিগ্ধ আর প্রণয়ের মতো ছেলে যদি আমাদের দেশের সব নিদপুরাতেই থাকতো, তবে এদেশের নিদ টুটে যেতো অনেক অনেকদিনই আগে। শিক্ষিত হলেই তো হবে না মা। যে শিক্ষা দশের দেশের কাজে না লাগানো যায় ; যে শিক্ষা শুধু অহমিকাই বাড়ায়, নতুন এক ধরনের গোঁড়ামিরই জন্ম দেয়, সে শিক্ষা ব্যর্থ। সে শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যায়না, প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তৈরি করে, অগণ্য শিক্ষিত প্রতিবন্ধী। লেটারহেড আর নেমপ্লেটেই কেঁদে মরে সেই সব ডিগ্রি।

ওরা দুজনেই লজ্জাতে আধোবদন হয়ে গেলো।

পর্ণা স্বভাববশত একটু প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলো। কলি ওর হাতের আঙুলে অলক্ষ্যে চিমটি কেটে বারণ করলো।

আপনিও নিশ্চয় কোনো কলেজে পড়েছেন। তাই না ?

না মা ! আমার স্বামীতো ছিলেন বাবুদের বাড়ির ড্রাইভার। হেড-ড্রাইভার। ড্রাইভার হলেও তিনি অশিক্ষিত ছিলেন না। ইংরিজি বাংলায় তাঁর মোটামুটি জ্ঞান ছিলো। ক্লাস নাইন অবধি পড়েছিলেন। তারপর অবস্থাতে কুলোয়নি। কিন্তু স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছিলো বলে তাঁর শেখার ইচ্ছা বা পড়াশুনা বন্ধ হয়নি। জ্ঞান ছিলো গাড়ি সম্বন্ধেও। তখনকার দিনে বড়বাবু আর বাবু দুজনের মিলিয়ে দশখানি গাড়ি ছিলো। প্যাকার্ড, রোলস্‌-রয়েস, ক্যাডিলার্ক, ফোর্ড, বেন্টলি আরো কত সব গাড়ি ! ওঁর কাছে থেকে থেকে আমিও গাড়ি বিশারদ হয়ে গেছি। ওঁর সঙ্গে বসবাস বা সহবাস যাই বলো, তাই করেই যেটুকু শিখেছি। ইংরিজি বাংলার বর্ণপরিচয় উনিই করান আম্যকে রাত জেগে। আর সাঁওতালী ভাষার অভিধান দেখে দেখে (ইংলিশ টু সাঁওতালী) উনি আমার ভাষা শিখে নেন। বলতে তো পারতেনই ! অনেক সাঁওতালী গান উনি বাংলাতে এবং ইংরিজিতে অনুবাদও করেছিলেন। ইচ্ছে আছে আমার, যে ওঁর বই ছাপবো একটা। স্নিগ্ধ বলে, যে ওদের কলেজে নিজস্ব প্রেসও বসবে। তখনই ছাপাবো।

কলি বললো, আপনার সঙ্গে ওঁর প্রথমে দেখা হলো কোথায় ? মানে প্রণয়-বাবুর বাবার ?

প্রণয়ের মা মুঙ্গলি হেসে উঠলো। গালে টোল পড়লো। এখনও অসাধারণ

সুন্দরী মহিলা। তাছাড়া অনাবিল আদিবাসী সৌন্দর্যকে ইংরিজি ও বাংলা সাহিত্য অন্য এক দীপ্তি দিয়েছিলো। তাতে তাঁর বনজ সৌন্দর্য এক অন্যতর মনজ মাত্রা পেয়েছিলো।

পর্ণাও ভাবছিলো, শারীরিক সৌন্দর্য আর কতটুকু সৌন্দর্য! মানুষের প্রকৃত শিক্ষার দীপ্তি, উদার মনের যে প্রতিফলন ; তা মানুষের মুখকে এমনই এক সৌন্দর্য দান করে যার কোনো বিকল্প নেই। আত্মারই সৌন্দর্য সে! সব প্রসাধনের সেরা।

উনি হাসলেন কলির প্রশ্ন শুনে। ফুলে ফুলে হাসলেন। এই প্রশ্ন হয়তো ওঁকে কেউ কোনোদিনও করেনি। অথবা, বহুদিন বাদে কেউ করেছে।

একটু চুপ করে থেকে উনি হেসে বললেন, শুনে আর কী করবে তোমরা! ঐ! এমনিই। তোমরা যেমন করে দেখলে আমাকে, তেমন করেই উনিও দেখেছিলেন আর কী!

তারপর একটু চুপ করে থেকে দূরে দৃষ্টি মেলে বললেন, পাহাড়ে গেছিলো বাবুর গাড়ি, শিকারে। শেষ রাতে। আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম।

মায়ের কাছে শুনেছিলাম, শিকার যাত্রার কথা।

গাড়ি যখন পাহাড় থেকে নামছে তখন বেলা দশটা হবে। আমি নদী থেকে জল নিয়ে আসছিলাম ঘড়াতে করে। এমন সময় ধক্ ধক্ ধক্ আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে পথের পাশের একটা সাহাজ গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি প্রথমে। তার আগে চিকনডিহ্তে তো মোটর গাড়ি আসে নাই। বাবুর সে গাড়িই প্রথম গাড়ি। রাস্তাই ছিলো না এখানে। তারপর ঘড়া মাটিতে রেখে তরতরিয়ে গাছের উপরে উঠে গেলাম মোটর গাড়ি উপর থেকে ভালো করে দেখবো বলে। খুবই উৎসাহ ছিলো। ছোট মেয়ে! মোটর গাড়ি অত কাছ থেকে দেখিনি তো আগে।

তারপর?

কলি শুধোলো।

তারপর আর কি! আরে হবি তো হ! একেই বলে নির্বন্ধ। ফোর্ড গাড়ি খারাপ হলো তো হলো ঐ গাছতলাতেই এসে। গাড়ির পেছনে শিকার-করা একজোড়া শুয়োর ছিলো আর একটি শোনচিতোয়া, মানে চিতাবাঘ। বাবু তো গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ফিরলেন। গ্রামের লোকদের শুয়োর দুটো দিয়ে চিতাবাঘটা বয়ে তাঁর সঙ্গে 'লজ'এ যেতে বললেন কয়েকজনকে। ড্রাইভার বাঁটু রুদ্র গাড়িতেই রয়ে গেলেন গাড়ি মেরামতের জন্যে।

সবাই তো চলে গেলো। এদিকে আমার হলো বিপদ। না পারি গাছ থেকে নামতে, আর না পারি পালাতে। সঙ্গে তাঁর হেল্পারও ছিল। সাঁওতাল ছেলে একটি। নাম ডোঙ্গর। তাকে উনি পাঠালেন রায়চৌধুরী লজ থেকে কীসব রেঞ্জ-উঞ্জ আনবার জন্যে। তখন উনি ছিলেন ড্রাইভার। পরে হয়েছিলেন হেড-ড্রাইভার। বলেইছি তোমাদের।

পর্ণা আর কলি খুব হাসছিলো ওঁর গল্প শুনে আর গল্প বলার ধরন দেখে।

তারপর ?

এমন সময়ে প্রণয় এসে হাজির। বললো, চলুন যাওয়া যাক। আমার কাজ শেষ।

ওর মা মঙ্গলি বললেন, দাঁড়া দাঁড়া। গল্পটা না শুনে ওরা যাবেই না।

বলো। প্রণয় বললো, তোমাকে ক্যাসেট এনে দেবো। গল্পটা টেপ করে রেখো। হাজার দুয়েক বার বলেছো বোধহয়।

কিন্তু প্রণয়ের মা তখন সেই মধুর অতীতে পৌঁছে গেছিলেন। উনি হাসিমুখে বলেই চললেন, অনেকক্ষণ পর ড্রাইভারসাহেবের নজরে পড়লো জলের ঘড়াটা। জল পিপাসাও পেয়ে থাকবে। তাড়াতাড়ি তো এসে ঘড়া কাত করে জল খেলেন। জল খেয়েই সন্দেহ হলো যে, গাছতলাতে ঘড়া এলো কোথা থেকে ? উনি যতই উপরের দিকে চান, আমি ততই ডালপালা আর পাতার আড়ালে বসে পড়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। তখনকার দিনে তো আর সায়া-টায়া পরতাম না, শুধুই শাড়ি। লজ্জায় মরি।

পর্ণা আর কলি হিহি করে হেসে উঠলো শিশুর মতো।

কলি ভাবছিলো, সারল্য বড় সংক্রামক। সাংঘাতিক অসুখ এই সারল্য।

বলুন, তারপর ?

অনেকক্ষণ পরে উনি আমাকে দেখতে পেয়ে নেমে আসতে বলে অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। নেমেই তো আমি ভোঁ দৌড় লাগাচ্ছিলাম।

উনি বললেন, ঘড়াটা নিয়ে যাও।

তারপর শুধোলেন, নাম কি তোমার ? বাবার নাম কি ?

ব্যাসস্। তারপর আমার আর কিছুই করণীয় ছিলো না। উনি নিজে এসে বাবার কাছে আমাকে ভিক্ষে চাইলেন। বিয়েতে বাবু বড়বাবু সব বরযাত্রী এসেছিলেন। তখন তো স্নিগ্ধ হয়ই নি। না-কি হয়েছিলো ? মাস দুই বয়স ছিলো হয়তো।

আমার বাড়ি পাকা করে দিতে চেয়েছিলেন বাবু। কিন্তু আমার বাবা রাজী হননি। বলেছিলেন, আপনাদের বউ বড়লোকের ধউ হলো। আমি তো বড়লোক নই। আমার বাড়ি এই রকমই থাকবে। তবে বাবুরা অনেক জমিজমা সব বিলি বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন আমারই নামে। বাবা নিজে নেননি কিছুই। জামাইকেও দিতে পারেননি কিছুই।

প্রণয় বললো, হায়! হায়! কে বলবে যে তুমি রাতে ভিরমি গেছিলে মা! তাই তো সকালে আবার এলাম খোঁজ নিতে। স্নিগ্ধই জোর করে পাঠালো।

তুই আমার ভালো ছেলে। বেশ করেছিস। দেখবি, তোর সুখ হয় কত। তবে সকাল থেকেই আমি ভালো। আজকের সকালটা ভারী সুন্দর ছিলো। সব অসুখই সেরে যায় অমন সকালে চোখ মেলে চাইলে। তুই এবারে যা। হনুসোটা ফিরলে মারে-কিয়ে কিছু ফুটিয়ে খাবো। তোর আর এর মধ্যে এ-সপ্তাহে আসতে লাগবে না। স্নিগ্ধ বাবাকে বলিস যদি পারে একদিন আসতে।

বলেই, পর্ণাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, জঙ্গী মানুষ তো। মাঝে-মাঝেই ভালুকের জ্বরে ধরে। এই আছে ; এই নাই।

ওরা হাসলো, তারপর উঠে পড়ে বললো, যাই।

কী বলে সম্বোধন করবে ওরা ভেবে পাচ্ছিলো না। 'কাকিমা' বা 'মাসিমা' বলতে অহং-এ লাগছিলো। শহুরে অহং। ডিগ্রী, ভালো চাকরি, ওদের অহংই দিয়েছে, বিনয় দেয়নি ; সহজ হতে শেখায়নি।

যাওয়া নেই, এসো মা। সুখী হও।

মুঙ্গলী বললেন।

আসি মা।

প্রণয় বললো।

সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দুজনেই একসঙ্গে বললো, আসি মা।

বলেই, নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো প্রণয়ের মাকে।

প্রণাম করে যখন উঠে দাঁড়ালো মাথা উঁচু করে তখন ওদের দুজনেরই মনে হলো নিজের নিজের মাথা নিচু করলে যে নিজেকে এতোখানি উঁচুও করা হয়, এই সত্যটা আগে কখনওই জানতো না ওরা। হিন্দুদের প্রণাম, মুসলমানদের নামাজপড়া বা দোয়া মাঙার মধ্যে, অথবা আদিবাসীদের বিভিন্ন দেবদেবীর পুজোর মধ্যে যে ভারতীয়ত্বর এক গভীর মহিমামণ্ডিত নিজস্ব সুষমা জড়িয়ে আছে, নিজেকে ছোট করে, বড় করার দৃষ্টান্ত ; এমন বোধহয় অন্য দেশীয়রা জানেন না।

সাঁওতাল পল্লী থেকে বাইরে বেরিয়ে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতিতে পৌঁছে, মিশ্র-গন্ধবাহী খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে ওদের দুজনের খুবই ভালো লাগতে লাগলো।

'মন্দার হোটেল'-এ এসেছিলো ক'টি দিন শুধু ছুটি কাটানোরই জন্যে। এই মুহূর্তে কী যেন কী এক উত্তরণ ঘটে গেলো ওদের দুজনেরই মধ্যে। এটা সব প্রত্যাশার, সব হিসেবের একেবারেই বাইরে ছিলো।

পর্ণা বললো, আপনার মা খুব জ্ঞানী মহিলা। আমরা আবার ওঁর কাছে আসবো।

ভালো তো! আমাদের সৌভাগ্য।

প্রণয় বললো, মাথা নিচু করে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পর্ণা আর কলির দুজনেরই প্রণয়ের কাছে মাথা নিচু করতে ইচ্ছে হলো। প্রণয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকনমিকস্-এ এম. এ. করেছে, ও ইচ্ছে করলেই লান্ডান-এ গিয়ে স্কুল অফ ইকনমিকস্-এ পড়তে পারতো এ কথা জানার পর থেকেই ওরা বুঝতে পারছে যে তার আগে 'মন্দার হোটেল'-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের সঙ্গে ওদের ব্যবহারটা যথেষ্ট সম্মানসূচক হয়নি। নিজেদের মানসিকতা থেকে ওরা দুজনেই বুঝেছে যে, ওদের শিক্ষাতে হয়তো কোনো গলদ ছিলো। যে-শিক্ষা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতে না শেখায়, সে-শিক্ষা বোধহয় শিক্ষাই নয়।

প্রণয় বললো, চলুন। টস্ করবো নাকি? কে রড্-এ বসবেন আর কে ক্যারিয়ারে?

বলেই, হিপ্ পকেট থেকে একটি দশ পয়সা বের করলো।

ক'টা বেজেছে দ্যাখ তো কলি ?

কলি ঘড়ি দেখে বললো, পৌনে এগারোটা।

ওঃ! তবে তো অনেকই সময় আছে। চলুন, গল্প করতে করতেই যাই। সাইকেলে তিনজন চাপলে কি আর আপনার গল্প করবার মতো অবস্থা থাকবে ?

টেনশানে বলছেন ?

না। আমাদের ওজনও তো পাখির ওজন নয়।

তাহলে আমি বরং এগোই। আমার চাকরিটা রাখতে হবে তো! স্নিগ্ধর স্নিগ্ধরূপটিই আপনারা দেখেছেন। রুক্ষ রূপটি দেখেননি। হি ইজ আ ভেরী ডিফিকাল্ট টাস্ক-মাস্টার। মাটির মানুষ, মস্ত বড় মনের মানুষ; কিন্তু কাজের ব্যাপারে কারো সঙ্গেই কোনো খাতির নেই।

তা হোক, রুক্ষ রুদ্রর স্নিগ্ধরূপটি যে দেখা হলো আমাদের সেইটুকুই লাভ।

কলি বললো, কিন্তু প্রণয়ের প্রণয়ী রূপটিও কি বেরুবে ? আমরা থাকতে থাকতে ?

প্রণয় যে বড় লাজুক।

হেসে বললো প্রণয়।

তারপরই সাইকেলে উঠে বসতে বসতে বললো, বেরুলেও, শনৈঃ শনৈঃ।

প্যাডল্ করতে করতে চলে গেলো প্রণয় ঘাড় ঘুরিয়ে একবার হেসে।

একটু পরে আঁকা-বাঁকা জঙ্গল-টাঁড়ের পথে হারিয়ে গেলো সে।

কলি বললো, নিধুবাবুর সেই কি একটা গান ছিলো না প্রণয় নিয়ে ? পয়লা বৈশাখের দূরদর্শনে প্রভাতী অনুষ্ঠানে রামকুমারবাবু না অন্য কে যেন গেয়েছিলেন! মনে পড়ে ? তুইও তো গাইতিস গানটা ক্যাসেট থেকে তুলে।

ও। হ্যাঁ হ্যাঁ। পাঁচবছর আগে। রামকুমারবাবু নন, অন্য কেউ গেয়েছিলেন।

গা না, গানটা।

পর্ণা শুরু করলো:

> 'প্রণয় পরম রত্ন যত্ন করে রেখো তারে
> বিচ্ছেদ তস্করে আসি যেন কোনোরূপে নাহি হরে।
> অনেক প্রতিবাদী তার, হারালে আর পাওয়া ভার
> কখনও যে সে হয় কার, কেবা তা বলিতে পারে ?
> প্রণয় পরম রত্ন যত্ন করে রেখো তারে।'

গণশা !

বিধুভূষণ ডাকলেন।

কেউ কোনো উত্তর দিলো না।

দেওয়ালের ধারের সফেদা গাছে দাঁড়কাক ডাকছিলো খবা-খবা করে। দাঁড়-কাকের অলুক্ষণে ডাক একেবারেই সহ্য করতে পারেন না বিধুভূষণ। মাথার মধ্যে ঘা মারে এই ডাক।

গণশা-আ-আ-।

আবারও ডাকলেন।

সাড়া নেই।

গতকাল ওঁর বন্ধু জগদীশ এসেছিলেন। নিদপুরার বালিয়া মহল্লায় থাকেন তিনি। তিনিও বিপত্নীক। বলেছিলেন, আজকাল নাকি একরকমের কলিংবেল বেরিয়েছে বাজারে, রিমোট-কন্ট্রোলের। প্লাস্টিকের। চৌকোমতো ছোট্ট জিনিসটি। যেখানে খুশি সঙ্গে করে নিয়ে যাও বাড়ির মধ্যে। বেলটি বাজবে একই জায়গাতে, রান্নাঘরে অথবা কাজের লোক বা লোকেরা যেখানে থাকে ; সুইচ টিপলেই বেল বেজে উঠবে সেখানে। কলকাতার টেরিটি বাজারে পাওয়া যায় বলছিলেন।

বিধুবাবু ভাবছিলেন, পাওয়া গেলেও এনে দেয় কে ? দুবেজীর দোকানে গণশাকে পাঠালে তো হয়। কিন্তু সে বাড়ি ছেড়ে কোথাওই কি যাবে ? গত জন্মে ধোপা ছিলো ও পেশাতে নির্ঘাত। তাছাড়া মাধুরীবালার শুচিবাইর অনেকখানিই যেন অলিখিত উইল করেই তিনি দিয়ে গেছেন গণশাকে। সারা-দিন ওই কাপড়কাচা নিয়েই আছে। আর সন্ধেবেলা ইস্ত্রী করা। অন্য কোনো কাজই আর কাজ নয়।

অবশ্য সেই বেল দিয়ে বিধুভূষণের কিই-বা হবে ? বিছানা ছেড়ে কোথায়ই বা যান ?

গণশা ছাড়া কালিও অবশ্য আছে। কিন্তু সে তো হোটেলের কাজ করেই নিঃশ্বাস নেবার সময় পায় না। বিধুবাবুর একমাত্র এবং পিতৃমাতৃহীন বংশধর স্নিগ্ধর কালিই হচ্ছে ডান হাত। প্রণয় অবশ্য আছে। সেই হচ্ছে এ-বাড়ির

খোলা হাওয়া। কাজ যা করে তা করে, কিন্তু সবসময়ই হাসে, হাসায়।

এমন সময়ে গণশা এসে ঘরে ঢুকলো। তার হাঁটু অবধি অনাবৃত। ভেজা। খাটো করে পরা ধুতির উপরে হাতওয়ালা গেঞ্জি। ছিপছিপে। মুখটি শেয়ালের মতো। কিন্তু একেবারেই ধূর্ত নয়!

গণশা বিরক্তির গলাতে বললো, নাও ওষুধটা এবারে খেতে হবে তো? বেলা হলো কত!

হুঁ।

বললেন বিধুভূষণ।

মনে মনে বললেন, আর ওষুধ খাওয়া কেন? এই জীবনকে প্রলম্বিত করার আর প্রয়োজন কি? কারোকে, সমাজকে, দেশকে, এমনকি একমাত্র বংশধর আদরের নাতি স্নিগ্ধকে পর্যন্ত কিছুমাত্রই আর দেওয়ার নেই তাঁর। যে শরীরের হাত আর অন্য কারো সাহায্যের জন্যেই বাড়াতে পারবেন না তিনি, যে-হাত অন্যের উপকারে আসবে না, সেই শরীরের জন্যে ওষুধ খেয়ে হবেটা কি? স্ত্রী মাধুরীবালাকে খুবই 'মিস' করেন উনি। তাঁর বর্তমান না থাকাটা বিধুভূষণের জীবনকে শূন্য করে দিয়েছে একেবারেই। তিনি যাওয়ার এক বছরের মধ্যেই বিপ্রদাস গেলো। তাঁর অশেষ কৃতি বাবার মুখোজ্জ্বলকারী একমাত্র সন্তান বিপ্রদাস। জামশেদপুরে দারুণ পসার ছিলো বিপ্রদাসের। কত মক্কেল, কত জুনিয়র। সপ্তাহ শেষে জামশেদপুর থেকে এই নিদপুরাতেই আসতো। বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটাবে বলে। মায়ের হাতের রান্না খাবে বলে। বৌমা সুমিতা, শিশু স্নিগ্ধ, সবাইকেই নিয়ে আসতো সঙ্গে। চাকর-ঝি-আয়া সব সমেত। ঐ দুদিনেও মক্কেলদের গাড়ির লাইন লেগে যেতো। চা আর পান-সিগারেটের অস্থায়ী দোকান বসে যেতো তখন রায়চৌধুরী লজ-এর ফটকের পাশে উকিল-মোক্তার-পেশকার ড্রাইভারদের জন্যে। কিন্তু হলে কী হয়! তারই একমাত্র ছেলে স্নিগ্ধ আইনই পড়লো না। পড়লো, সাহিত্য। বিপ্র বলেছিলো, লানডানে বা স্টেটস্-এর যেখানে খুশি গিয়ে পড়তে। কিন্তু স্নিগ্ধর 'না' তো 'না'।

তবে কিছুদিন পরেই বিপ্রদাস গত হয়। তাই স্নিগ্ধর সঙ্গে ঝগড়াটা তার বেশিদিন করতে হয়নি, হয়েছিলো বিধুভূষণেরই! প্রণয়কেও যাবার কথা বলেছিলো বিপ্রদাস। তা স্নিগ্ধ যাবে না, তাই ও-ও গেলো না।

তুলনামূলক সাহিত্য পড়ার পরে তাও অধ্যাপক-টধ্যাপক হতে পারতো স্নিগ্ধ। রেস্‌পেকটেবল কিছু। কিছুই করলো না, যতদিন সুমিতা ও বিপ্রদাস বেঁচেছিলো। সুমিতা গেলো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ জ্বরে। বিপ্র গেলো পরের বছর অমনই হঠাৎ জ্বরেই। বড়ই ভাব ছিলো দুটিতে। একদিনও তাদের ঝগড়া করতে বা তাদের মধ্যে কোনোরকম মতানৈক্য হতে দেখেনি কেউই।

স্নিগ্ধও মা-বাবার স্বভাবটি পেয়েছে। যে দেখে, যে কথা বলে, সেই ভালোবাসে ওকে।

ওষুধ খাওয়া হতে, পায়ের কাছে চাদরটা টেনে একটু তুলে দিলো কোমর অবধি গণশা। তুলে দিয়ে বললো, আমি যাচ্ছি। এখন কাজের সময়, রান্না

নষ্ট করার সময় নেই।

গণশা চলে গেলে, বিধুবাবু জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দূরে দলমা পাহাড়ের রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, মেঘ মেঘ। এখান থেকে সুবর্ণরেখা দেখা যায় না। তবে বর্ষাকালে শব্দ শোনা যায়। বিশেষ করে রাতের বেলা। শাখানদী আছে একটি। বাড়ির কিছুটা পেছন দিয়ে বয়ে গেছে। শীতকালে মন্দার হোটেলের গেস্টসরা পিকনিক করে। মনে পড়ে গেলো বিধুভূষণের, মাধুরীবালাকে সঙ্গে নিয়ে একবার রুসি মোদীর প্রিয় বাংলোতে ছিলেন গিয়ে দলমা পাহাড়ের চূড়োতে। রুসির তখন কতই বা বয়স! তবে চিরদিনই ছটফটে, হাসিখুশি, স্পোর্টসম্যান। কাইজার বাংলোর একটি বাংলোতে থাকতো বোধহয় তখন রুসি। নামটা ভুলে গেছেন এখন রাস্তাটির। সোনাঝুরি গাছে গাছে ভরা ছিলো পুরো এলাকাটা আর সুন্দর সুন্দর সব নাম ছিলো রাস্তাগুলোর। বহুদিন হয়ে গেলো। সরোস গান্ধীও থাকতো তখন আশে পাশেই।

এই একা ঘরে শুয়ে শুয়ে কত কথাই মনে পড়ে বিধুভূষণের এখন। অভিশপ্ত তিনি। তাঁর আর নিজের মধ্যে এই রায়চৌধুরী বংশের একমাত্র সাঁকো হচ্ছে ঐ স্নিগ্ধই। তবু সারাদিনে তার দেখা পাওয়া যায় না। তবে যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, তিনি ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে সে একবার আসে ঠিকই। পায়ের কাছে বসে, পা টিপে দিয়ে যায়। দাদু দাদু করে। হাঁটুতে হাত বোলায়। কোনোরকম কষ্ট হচ্ছে কিনা জিগেস করে। তাঁর এতটুকু অযত্নও হতে দেয় না স্নিগ্ধ। সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখে। বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, মশারি সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কি নেই? প্রতিদিন তা কাচা এবং ইস্ত্রী হয় কিনা? দাদুর কোলবালিশের ওয়াড়, সাইড টেবলের কভার, মাথার কাছের টেব্‌ললাইটের শেড; কোনো কিছুই একটুও নোংরা বা বিস্রস্ত থাকলে চলবে না। আর্মির সার্জেন্ট-মেজরের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করে যায় স্নিগ্ধ। কোথাও কোনো খাম্‌তি দেখলে তুলকালাম কাণ্ড বাধায়। তার হোটেলের বাবুর্চি রহিম বিপ্রদাসের আমলের লোক। রহিমকে দিয়ে আলাদা করে দাদুর স্যুপ থেকে পুডিং, ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার সব বানিয়ে দেয়। স্নিগ্ধ নিজে কিন্তু বারোয়ারী খানাই খায়। নিজস্ব কোনোরকম চালিয়াতি নেই ছেলেটার।

বিধুভূষণ চুপ করে সপ্রশংস চোখে চেয়ে থাকেন স্নিগ্ধর দিকে। জীবনের শেষে এসে বোঝেন যে, একেকজন মানুষের, তা সে পুরুষই হোন বা স্ত্রী; ভালোবাসার প্রকাশ একেবারেই আলাদা আলাদা হয়। স্নিগ্ধর বাবা বিপ্রদাসের ভালোবাসা, তাঁর স্ত্রী মাধুরীর ভালোবাসা বা পুত্রবধূ সুমিতার শ্রদ্ধার রকমের সঙ্গে স্নিগ্ধর ভালোবাসার রকমের কোনো তুলনাই চলে না। একেবারেই অন্যরকম এ ভালোবাসা। কোন্ ভালোবাসাতে ভালোবাসা বেশি আর কোনটাতে কম তা নিয়ে তর্ক করে মূর্খরাই। ভালোবাসা, ভালোবাসাই। বিধুভূষণ বোঝেন সে কথাটা।

অনেক সময় দাদুকে বকা-ঝকাও করে স্নিগ্ধ। রাগ করে দাদুর উপর। অনেকেই ভালোবাসা চিনতে পারে না বলেই অগণ্য সংসারে এতে অশান্তি

ঘটে। বিধুবাবুর মনে হয় এরকম। ঈশ্বর সকলকেই যে কেন চোখ-কান দিয়ে পাঠান না একথা ভেবে মাঝে-মাঝেই বিধুভূষণের ঈশ্বরের উপরে একটু অভিমানও যে হয় না, তাও নয়।

গণশা চলে গেছে অনেকক্ষণ।

বিধুভূষণ এই সময়ে একটু ঘুমিয়ে নেন। ইচ্ছে করে যে ঘুমোন এমন নয়। সকালে গণশা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে চান করায় যখন, তখন পরের হাতে চান করতেও হাঁফিয়ে যান।

চান সেরে ঘরে এসে তারপর যা হয় কিছু ব্রেকফাস্ট খান। তারপরেই এই ওষুধ। আর ওষুধ তো একটি নয়! মুঠো ভরা ওষুধ। ব্রেকফাস্টের পরই দুটি। সারাদিনে বাইশটি। ট্যাবলেট; ক্যাপস্যুল; ঘেন্না ধরে গেলো বিধুভূষণের জীবনে। লাল-হলুদ-নীল-কালো সাদা, কতরকম যে ক্যাপস্যুল! ওষুধ খেয়ে আবার অ্যান্টাসিড খেতে হয়, নইলে অম্বল হয়। আজকাল ডাবুর কোম্পানীর 'উলজেল' খান। আগে জেলুসেল এম. পি. এস. খেতেন। অ্যান্টাসিডটা খাওয়ার পরই অম্বল অম্বল ভাবটা কেটে যেতেই চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। কুড়ি মিনিট থেকে আধঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকেন। নিজের ইচ্ছাতে নয়, শরীরের ইচ্ছাতে।

এই ঘুমটা ভাঙে ফলসাগাছের দাঁড়কাকের ডাকে। বড় অলুক্ষণে কর্কশ ডাক। মাথার মধ্যে হাতুড়ি মারে যেন।

আসলে, আজকাল সময়ের বোধই হারিয়ে ফেলছেন ক্রমশ। এটা বুঝতে পেরে ভীষণই ভীত বোধ করেন। রাতে তেমন ঘুমোন না বলেই দিনে ঘুমোন। এবং দিনে ঘুমোন বলে রাতে ঘুম আসে না। ভিসাস-সার্কল। বড় বড় গ্রান্ড-ফাদার ক্লক, টেবল ক্লক, ছোট্ট-টাইম-পিস, নিজের ট্যাঁক-ঘড়ি, রিস্ট-ওয়াচ সবই অর্থহীন হয়ে গেছে। রোলেক্স অয়েস্টার, অ্যালার্ম দেওয়া, লন্‌জিন-এর মুনফেজ, ওমেগার সী-মাস্টার সব ঘড়ি আর সূর্য-ঘড়ি একাকার হয়ে গেছে ওঁর কাছে।

(সময় থাকতে কম মানুষই সময়ের দাম বোঝেন আর সময় যখন থাকে না তখন সময় জগদ্দল পাথরের মতো ঘাড়ে চেপে বসে।)

কিন্তু বিধুভূষণ যেমন করে একথাটা বুঝেছেন তেমন করে ওঁর বন্ধু জগদীশ বোঝেননি। কারণ জগদীশ এখনও নিজের পায়ে হেঁটে চলে বেড়ায়। ওঁর অবস্থাতে আসেনি এখনও। সকালে যোগ-ব্যায়াম করে। মেয়েদের প্রতি ও এখনও দুর্বলতা রাখে। সত্যি কথা বলতে কি প্ল্যান্ডফ্ল্যান্ডের গন্ডগোলেই হোক বা যে-কারণেই হোক এখন একটু ছুক্‌ছুকে বাতিক হয়েছে। জগদীশ একদিন বলেছিলো, মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা যেদিন চলে যাবে, সেদিনই জানবো সত্যিই বুড়ো হয়েছি। উচ্ছ্বাস, নারীর প্রতি আগ্রহ; এই সবই হচ্ছে যৌবনের লক্ষণ, জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম। ইদানীং চোখ বন্ধ করলেই স্বপ্ন দেখেন বিধুভূষণ। স্বপ্নই কি? না কি; ঠিক স্বপ্ন বোধহয় নয়। আলাদা আলাদা শট্-এর মতো সুন্দর সুন্দর সব ছবি। চমৎকার [illegible]মিং, চমৎকার ফটোগ্রাফি; সাউন্ড-টেকিং। কিন্তু সবগুলি শট্ মেলালে

কোনো বিশেষ ছবিই হয় না। ফুলগুলি ভালো মালাটি নয় ; সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিক অতীতের কিছু ছবির মতো। অনেকগুলি স্নিগ্ধসুন্দর ফুল। কিন্তু তাদের দিয়ে মালা আদৌ গাঁথা যায় না।

আজকাল প্রায়ই বিধুভূষণের ইচ্ছা হয় যে, এই স্বপ্নগুলির পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। দাঁড়াতে পারেন না বলেই স্বপ্ন আজ এতো বড় ভূমিকা নিয়েছে তাঁর জীবনে।

জীবনের শেষে এসে বিধুভূষণ খুব ভালো করেই বুঝেছেন যে, স্বপ্নই জীবন। স্বপ্ন ছাড়া কারো জীবনইতো পরিপূর্ণতাও পায় না! কবে যেন সেই গানটি শুনেছিলেন? ঠিক মনে নেই। কিন্তু গানটির কথাগুলি মনে আছে এখনও স্পষ্ট তাঁর :

"If you never have a dream,
You will never have a dream come true.'

স্বপ্ন দেখে এখন খুব আনন্দ পান কিন্তু দুঃখ পান এ-কথা ভেবে যে, যখন সময় ছিলো, তখন শুধু কাজই করেছেন, স্বপ্ন দেখার জন্যে একটুও সময় হাতে রাখেননি। অথচ এখন বোঝেন যে স্বপ্ন আর জীবন ; জীবন আর সুখ সমার্থক।

মাধুরীর বড় শখ ছিলো। বলা ভালো, আরো অনেক স্বপ্নর মধ্যে একটি বিশেষ স্বপ্ন ছিলো। বলতেন, চলো না, আমরা শিলংয়ে একটা বাড়ি করি। বেশ লাইলাক-রঙা পর্দা থাকবে প্রতি ঘরে, মোটা কার্পেট, বেডরুমের বিছানাতে শুয়ে সামনে পাইন বনের উপত্যকা দেখা যাবে। মেঘ ঢুকে আসবে ঘরের মধ্যে দুপুরবেলায়। মেঘের মধ্যে তোমার বুকে শুয়ে থাকবো।

আরো কত স্বপ্নই যে ছিলো মাধুরীবালার। স্বপ্ন আর জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ানো ছিলো, তাই মাধুরীবালা যে ক'দিন বেঁচেছিলেন, সবসময়ই হাসিমুখ নিয়ে বেঁচেছিলেন, বড় সিঁদুরের টিপ আর সিঁথিতে দগদগে সিঁদুর নিয়ে, মুখে জর্দা পান আর সুখে ভরপুর হয়ে। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মতো।

মাধুরীবালার প্রায় কোনো স্বপ্নই সার্থক করতে পারেননি বিধুভূষণ। করার সামর্থ্য ছিলো না বলে নয়, তাড়া ছিলো না কোনো। প্রায়রিটির লিস্টে স্বপ্ন কখনওই রাখেননি আর সেখানেই মারাত্মক ভুল হয়ে গেছিলো। হচ্ছে, হবে, হলেই তো হলো ; এই সব করে করে আর পূরণ করাই হয়ে ওঠেনি।

বিধুভূষণের জীবন আজ স্বপ্নময়, আর সেই স্বপ্নের বেশিটাই মাধুরীবালা, বিপ্রদাস ও সুমিতা আর স্নিগ্ধই। এই অবেলাতে অন্য কোনো স্বপ্নই আর সত্যি করে তুলতে পারবেন না, শুধুমাত্র স্নিগ্ধকে নিয়ে যেসব স্বপ্ন দেখেন সেগুলিই শুধু সত্যি হয়ে উঠতে পারে।

যা বেয়াদব ছেলে! কোনো স্বপ্নই কি সত্যি করে তুলতে দেবে সে! বড় বেশি ভালো ছেলে। স্নিগ্ধর বয়সে বিধুভূষণের চরিত্রে নানারকম রঙ ছিলো। অনেক কিছুই করেছেন যা তৎকালীন সমাজের আশীর্বাদ-পূত নয়। হয়তো আজকের সমাজেরও নয়। কিন্তু তার কোনো কিছুর জন্যেই তাঁর বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। বরং যখন স্বপ্ন দেখেন, তখন সেই সব স্বপ্নে ভাঙন, ফাটল,

ফুটো, ইমারত চৌচির-করা মহীরুহদের আরও সর্বনাশা প্রলয়ংকর রূপে দেখতে চান। 'প্রত্যেক নারীরই মতো প্রত্যেক পুরুষেরই একটি গোপন জীবন থাকেই। বেলাশেষে এসে সেই অদৃশ্য'অ্যালবাম-এর পাতা উলটিয়ে অবকাশ কাটে সকলেরই।

জীবনে ভুল হয়ে গেছে অনেকই। একটা মাত্র জীবনে যেমন করে বাঁচা উচিত ছিলো, তেমন করে নানা সামাজিক ইডিয়টিক 'টাবুর' জন্যে বাঁচা হয়নি বিধুভূষণের। তাই দিন-রাতের স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে এখন তা পুরিয়ে নিতে চান। স্বপ্নের-উপর তো কোনো ট্যাক্স নেই, অন্য কারো আপত্তিই তো সেখানে টেঁকে না। প্রতিটি স্বপ্নই এক-একটি 'আনকন্‌টেস্টেড ডিক্রী।'

সত্যি! বিধুভূষণ ভাবেন। এই জীবন কী চমৎকার! তা থেকে প্রতিটি মুহূর্ত নিংড়ে নেওয়া উচিত ছিলো। ভুল হয়ে গেছে। অথচ উনি নিজের দীর্ঘ জীবন দিয়ে যা-কিছুই শিখেছেন তার ছিঁটে-ফোঁটাও তো শেখানো যাবে না স্নিগ্ধকে, প্রণয়কে; অথবা এই যে ফুলের মতো মেয়ে দুটি এসেছে হোটেলে; তাদেরও! তাছাড়া ওদের বলতে গেলেই, ওরা ওঁকে ভুল বুঝবে। বুঝবেই না। মিছিমিছি কলঙ্ক লেপন করবে বৃদ্ধ বিধুভূষণের উপরে। জীবনের প্রকৃত মানেটি, এখনও ওদের সামনে নানারকম মোহ, সামাজিক রীতিনীতি, ফালতু ও ভুল ন্যায়-অন্যায় বোধ, শুভাশুভ বোধ, কুয়াশারই মতো ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে থাকাতে প্রাঞ্জল হয়নি, হবে না।

এক জীবনে কোনো মানুষই যা শেখেন, গভীর জীবন-সঞ্জাত সব শেখা; তা অন্যকে শিখিয়ে যেতে পারেন না। আজ যারা কিশোর বা যুবক এমন কী প্রৌঢ়ও, তাঁরাও হয়তো ইচ্ছে করলেও শিখে নিতে পারেন না যা শেখার, তা অন্যের কাছ থেকে। এই একটি মাত্র, ছোট্ট জীবনে এ এক বিরাট হিউম্যান ট্রাজেডি!

তন্দ্রা এবং দিবাস্বপ্ন ভেঙে বিধুভূষণ ডাকলেন, গণশা!

এঁজ্ঞে?

সাড়া দিলো গণশা দূরের বাথরুমের লাগোয়া বারান্দা থেকে। ঐখানেই গণশার সাধন-পীঠ। কাপড় কাচার জায়গা।

গণশা!

'রায়চৌধুরী লজ'-এ শাসন করার যদি কেউ থাকে বিধুভূষণকে তবে এই গণশাই একমাত্র।

আসছি। ভালো লাগে না। এখন কাজের সময়ে কত ডাকাডাকি!

কালকের স্নিগ্ধ ভাবটা ঠিক অতটা আর নেই। আজ হেঁটে হেঁটে ঝিলের দিকে গেছিলো ওরা দুজনে। কিন্তু তাপে শেষ পর্যন্ত পেঁছতেই পারেনি। ফিরে এসেছে ঘেমে নেয়ে। ।আরেকবার চান করেছে দুপুরে খাওয়ার আগে।

খেয়ে দেয়ে দুজনেই বিছানাতে গা এলিয়ে দিয়েছিলো। ব্যস-স। কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে হুঁশই ছিলো না।

দুপুরের খাওয়াটাও জব্বর হয়েছিলো। মাসকলাইয়ের ডাল, ঝিঙে-পোস্ত, তার আগে নিম-বেগুনের ভাজা, চারা-পোনার ঝোল, কুচো মাছের চচ্চড়ি, কচি পাঁঠার মাংস, দই দিয়ে রাঁধা; কাঁচা আমের চাটনি এবং পান্তুয়া।

কলকাতায় তো লাঞ্চ আওয়ারে যা-হয় কিছু খেয়ে নেয়। পর্ণাদের অফিসে লাঞ্চরুম আছে। কোম্পানী সাবসিডাইজড লাঞ্চ দেয়। কিন্তু ও স্লিমিং করছে বলে, খায় না। বেয়ারাকে দিয়ে শশা আনিয়ে নিয়ে খায়। কোনোদিন পেঁপে। কোনোদিন মুড়ি।

কলির চাকরিটা পর্ণার মতো অতো ভালো নয়। তবে ও বাড়ি থেকেই হট্-কেস-এ লাঞ্চ নিয়ে আসে। টিফিনরুমে বসে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। বেশ পিকনিক—পিকনিক মনে হয়। সর্বভারতীয় লাঞ্চ। দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তর ভারতীয়, পূর্ব ভারতীয়, পশ্চিম ভারতীয় সব খাবারেরই স্বাদ পায়। তবে সেই খাওয়া তো এরকম নয়। এতো একসারসাইজও হয় না কলকাতায়, এমন সুগন্ধি খোলা হাওয়া, এমন অখণ্ড অবসর, এমন মনোযোগ দিয়ে খাওয়াও।

খাওয়াটা হয়তো আরও ভালো করে রেলিশ করা যেতো যদি-না স্নিগ্ধ বা প্রণয় তদারকি করতো। ওদের সামনে বেশি খেতে লজ্জা করে। অথচ বেশি যাতে খায়, সেইজন্যেই তদারকি।

রাতে ইংলিশ ডিশ হয়। স্যুপ, ভেজিটেরিয়ান কিছু বা ডিমের প্রিপারে-শান। চিকেন অবশ্য রোজই থাকে। তারপর সুইট ডিশ। সবশেষে কফি।

কলির ঘুম আগে ভেঙেছিলো। কিন্তু আলস্য ছিলো পুরো। চোখ খুলছিলো আর বন্ধ করছিলো।

বাইরে বেলা পড়ে এসেছিলো। পাখি ডাকছে নানারকম, বাগান থেকে, চৈত্রশেষের বিকেলে। বাগানের বাইরে থেকেও ডাকছে নানা পাখি। প্রকৃতিতে রুক্ষ ভাব সবে আসতে শুরু করেছে। চোখ জ্বালা করে একটু একটু।

হাত-পা-গা ঠোঁটও তাই। ভেস্‌লিন বা লিপস্টিক বা চ্যাপ্‌স্টিক লাগাতে হয়, নইলে চড়চড় করে ঠোঁট।

পর্ণা অঘোরে ঘুমোচ্ছে এখনও। ডান কাতে। কলির দিকে ফিরে। ওর বাঁদিকের বুকের অনেকখানি অনাবৃত হয়ে আছে। হারের লকেটটা আটকে গেছে বুকের খাঁজে। কলি সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলো, সুবর্ণ কতরকম করেই না আদর করেছিলো পর্ণাকে, পর্ণার-বুককে, অথচ এখন পর্ণার থেকে কত দূরে চলে গেছে সুবর্ণ। কেন যে কাছে আসা আর কেনই যে দূরে যাওয়া!

ক্ষৌণিশ এক রাতে 'তাজ বেঙ্গল'এ ডিনার খাওয়ানোর পর গাড়ি করে ওকে বাড়িতে পেঁছে দেওয়ার সময়ে রেসকোর্স-এর পাশে গাড়ি থামিয়ে চুমু খাওয়ার সময় চকিতে কলির বুকেও একটি চুমু খেয়েছিলো। ক্ষৌণিশের সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক নেই। ক্ষৌণিশের আবও অনেক মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিলো। সে খুবই আকর্ষণীয় পুরুষ। কিন্তু প্লে-বয়। কোনো একজনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক পাতাবার কোনো ইচ্ছা তার ছিলো না। বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে ওর প্রেম-প্রেম খেলা ছিলো। শেষকালে আরতিকে বিয়ে করেছে গত মাসে। ফেব্রুয়ারির উনিশে। এই বিয়েও টিকবে না। জানে কলি। অথবা টিকতেও পারে। আরতিটা একটি ইডিয়ট। ভালো ফ্ল্যাট, চাকর, আয়া, আরাম আলস্যেই ও খুশী থাকবে। আর বেশি কিছু চাইবে না ক্ষৌণিশের কাছে। ছেলেদের সঙ্গে মিলে-মিশে এইটুকুই বুঝেছে কলি যে, পুরুষমাত্রই কম-বেশি পাজি। সব-সময়েই চোখে না রাখলেই বেগড়বাঁই করবে। ছুক্‌ছুক করবে!

কে জানে! ও তো সর্বজ্ঞ নয়। হয়তো ব্যতিক্রমও আছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সাকসেসফুল পুরুষমাত্রই ওভার-সেক্সড হয়। এটা ও লক্ষ করেছে। পৃথিবীময়ই তাই।

তৃণা বলে, ম্যাদামারা সাধারণ স্বামীর চেয়ে যে-স্বামীর উপর অনেক মেয়েরই চোখ থাকে সেই তো বেশি কভেটেবল্‌। কিন্তু তৃণার তো চাকরি করতে হয় না। একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেই দম বেরিয়ে যায়। তারপরও স্বামীকে আগলে আগলে রাখার সময় বা জীবনীশক্তি কোথায়?

আজকাল অবশ্য এই কথাটি শুধু স্বামীদের বেলাতেই নয়; স্ত্রীদের বেলাতেও প্রযোজ্য। আসলে, ওয়ার্কিং কাপলস্‌দের দুজনকেই কাজের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অন্য লিঙ্গের একাধিক হ্যান্ডসাম ও সুন্দরী মানুষ মানুষীর কাছাকাছি আসতে হয়, যারা রূপে-গুণে তার পার্টনারের চেয়ে অনেকই বেশি গ্রহণীয়। তাই চাকরিই বজায় রাখবে? না বিয়ে? তাছাড়া উপরের দিকের চাকরি যেতে তো সময় লাগে না। পাঁচ মিনিটেই চাকরি যেতে পারে। উপরের মহলের বিয়ের দশাও তাই ঐ রকমই হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তাই মনে হয়, সামান্য করণিকের চাকরি করলেই ভালো হতো। কলির অফিসে, তার নিচে যে সব মেয়েরা কাজ করে তারা সবাই তাকে ঈর্ষা করে। অথচ তারা জানে না যে, কলিও কতখানি ঈর্ষা করে তাদের। সুখ দুঃখ সব কুন্‌কে মেপে দেন উপরওয়ালা। একটি সুখ যদি বেশি দেন তো একটি দুঃখও সঙ্গে দিয়ে দেন। বাড়তি। কীসে যে সুখী হওয়া যায় তা বলা

ভারী মুশকিল।

এমন সময় কে যেন ঘরের বেল বাজালো   অবশ্য দরজাটা এমন জায়গাতে যে পালঙ্ক দেখা যায় না সেখান থেকে।

পর্ণা বেলের শব্দে চোখ মেলে বললো, ক'টা বাজে রে ?

সাড়ে চারটে।

ইসস্—স্। এতো ঘুমোলাম ! দরজাটা খুলবি ?

খুলছি। চা·আনলো বোধ হয় কালিদা।

দরজা খুলে দেখে, ঠিকই তাই। গরম গরম চপ আর চায়ের ট্রে নিয়ে কালিদা দাঁড়িয়ে হাসিমুখে। ট্রে'র উপর একটি চিঠি। খামে। কলিরই নামে।

কার চিঠি ?

ডাকে এসেছে মা। আজ দুপুরে। কলকাতা থেকে।

ও।

থ্যাঙ্ক উ্য কালিদা।

ছিঁদোবাবু, থুড়ি ম্যানেজারবাবু শুধিয়েছেন আজ সন্ধের পরে চিরচিরি ঝিলে যাবেন তো ? তাহলে গাড়িটা ঠিক ঠাক করে রাখবেন।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই যাবো। আধখানা পথ গিয়ে তো ফিরেই এলাম সকালে। রোদের জন্যে যেতেই পারলাম না। থ্যাঙ্ক উ্য বলে দিও ওঁকে কালিদা, আমাদের।

ঠিক আছে।

কালিদা বললো।

চপ্-এ এক কামড় দিয়েই পর্ণা বললো, কী দারুণ। খেয়ে দ্যাখ। মধ্যে বাদাম, কিশমিশ, কাঁচা লঙ্কা-কুচি আর ধনেপাতাও আছে। এঁচড়ের চপ্। ডেলিকেসি।

ধনেপাতা এখন কোথায় পেলো !

খোঁজ করলেই পাওয়া যায়।

আসলে কী জানিস তো ! ভালোবাসা থাকা চাই।

যা বলেছিস। এমন হোটেলে আগে কখনোই থাকিনি।

চিঠিটা কার ? আমার ?

না। আমার।

কলি বললো।

কে লিখলেন ? মাসীমা ?

না, না। মা জম্মে চিঠি লেখেন না। মায়ের ভারী বয়েই গেছে।

তবে ?

দেখি, কোন মিন্‌সে লিখলো।

পর্ণা হেসে ফেললো কলির কথার ধরন দেখে। পালঙ্কের উপরেই আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে ট্রেটা সামনে নিয়ে বললো, চিনি তো তোর আধ চামচ ?

ইয়েস্।

মাথা নেড়ে কলি সায় দিলো, চিঠিটি খুলতে খুলতে। খামের চিঠি। খুলেই, দ্রুত পড়ে ফেললো। পড়েই, বালিশের নিচে চালান করে দিলো।

দিয়ে বললো, দে আমাকে চপ দে।

পর্ণা আড়চোখে চিঠি চালান করাটা দেখলো যে, তা লক্ষ্য করলো কলি।

তারপরই কী মনে করে বললো, তোর' ইন্‌কুইজিটিভনেসের ইতি টানা দরকার। নে। পড়।

বলেই, বালিশেব তলা থেকে চিঠিটা বার করে ওকে দিলো।

চিঠি মাত্রই গোপনীয় নয়। বুঝেছো? কলি বললো।

পর্ণা বললো, বাঃ রে? তোর চিঠি আমি পড়তে যাবো কেন?

আঃ। পড়ই না। তেমন কন্‌ফিডেনসিয়াল হলে কি আর দিতাম?

লিখেছে কে?

তিতাস।

পর্ণা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেললো চপ খেতে খেতে তিনপাতার চিঠিটি। তার পর ফেরত দিলো কলিকে। বললো, কী ব্যাপার?

ধ্যুত, এরা প্রেম করবে কি? একটি চিঠি পর্যন্ত লিখতে শেখেনি। কী বাংলা কী ইংরিজিতে। অর্ধেক ইংরিজি, অর্ধেক বাংলা এবং দুইয়েরই কোয়ালিটি সমান। চিঠি লেখা কি চাট্টিখানি কথা! প্রবীর বলে আমার 'এক বন্ধু আছে, লিটল ম্যাগাজিন করে। কবিতা লেখে। যদিও কোনো বড় কাগজে কখনও কবিতা ছাপা হয়নি ওর। পাঠায়ই না। সে এমন হাতের লেখাতে এমন চিঠি লেখে যে, নিজেকে মনে হয় সম্রাজ্ঞী। আজকালকার কবি-সাহিত্যিকেরাও চিঠি লিখতে জানেন না। লিখবেন কোত্থেকে! সব তো খল্‌সে মাছ। অল্প জলে ছিরছির করা সব।

তা, তাকে কেন তুই পাত্তা দিস না? এতো ভালোই চিঠি যদি লেখে?

পাত্তারও তো রকম আছে। পাত্তাতো দিই। কিন্তু মাসে যে রোজগার মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। শুধু ভালো চিঠি লেখে এই জন্যেই কি এই বয়সে, এই পৃথিবীতে কাউকে ভালোবাসা যায়? হ্যাঁ! তবে তুই যদি বলিস কোনোদিনও ক্ষৌণিশ আর তিতাস আর প্রবীরের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে, তাহলে প্রবীরকেই বাছবো। ক্ষৌণিশের রোজগারটা এমন কিছু নয় যে নিরন্তর ওর ব্র্যাগিং সহ্য করা যাবে। তেমন রাজা মহারাজা হতো তো বুঝতাম। তাছাড়া ও একটা Boreও। কিন্তু প্রবীরকে বিয়ে করলে সে আমার পায়ের কাছে বসে থাকবে, আমার হাউসকিপার হবে; যখনই যা করতে বলবো করবে। যদি কোথাও যাবার সময়ে ভুল করে মেক-আপ বক্স ফেলে যাই তো তা নিয়ে পরের ট্রেনেই আমার কাছে চলে আসবে। ওয়ার্কিং-গার্লদের এই রকম সাধারণ নন-এনটিটি স্বামীই আইডিয়াল। যখনই আদর খেতে চাইবো আদর করবে। আর ও আদর করতে চাইলে আমি চোখ বড় বড় করে তাকালেই দূরে সরে যাবে। মানে ও বেশ আমার পুডল্ কুকুর। মানে, সংসারে ম্যাট্রিয়ার্কাল্ সোসাইটির আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। নইলে ভাবছি, সীমেন ব্যাঙ্ক [illegible] একজন টপ-ক্লাস ইন্টেলেকচুয়ালের বীর্য নিয়ে আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশান করে বাচ্চা করবো।

ধুঃ! তার চেয়ে তার সঙ্গে শুলেই হয়। সীমেন ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া কেন?

আহা। তাঁরা যেন শোয়ার জন্যে লাইন দিয়ে আছেন।

ছাড় তো! আজকালকার ইন্টেলেকচুয়ালস্। জানা আছে সব। তাদের ইন্টেলেক্ট ছাড়া আর সবই আছে।

চা-টা খেয়ে কলি বললো, দে, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলি।

কী ভাবে লিখলো বল তো? আমিতো এখানের ঠিকানাও ওকে দিই নি। আমার ভারী বয়েই গেছে। নিশ্চয়ই মায়ের কাছ থেকে যোগাড় করেছে কোনো বাহানা করে। ন্যাকা খোকা। এখন দ্যাখ্। হঠাৎ ঢাউস কন্টেসা গাড়িখানা করে এসে হাজির না হয়ে যায়। তাও বুঝতাম স্বোপার্জিত রোজগারে কেনা! বাবার টাকায় তো ফুটানি যত্ত। ডিসগ্রেসফুল। বড়লোকের বসে-খাওয়া ছেলেগুলোকে আমি দু'চোখে সহ্য করতে পারি না। দ্যাখ্ না! এই 'মন্দার হোটেলে'-এর স্নিগ্ধও তো কোটিপতির ছেলে। তার কি দরকার ছিলো এই হোটেল চালাবার? তার ব্যবহারে বড়লোকির কোনো চিহ্ন দেখেছিস?

নোপ্।

পর্ণা বললো।

তারপরে চায়ের কাপটা ট্রেতে নামিয়ে রেখে বললো, এবারে তুই চা-টা কর। চা-টা খেয়ে, যাই স্নিগ্ধর দাদুকে খবরটা দিয়ে আসি।

কি খবর?

তুই যে স্নিগ্ধর উপরে অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স করছিস, সেই খবর।

ইয়ার্কি মারিস না। ব্যাপারটা কী জানিস? বিয়ে তো তুই একটা করেও দেখলি। আগের দিনকাল তো আর নেই! আজকাল সহজে ভালো লাগে, এমনকি ভালোবাসাও হয়তো যায়; কিন্তু বিয়ে করা? বড় ভয় করে রে! তাছাড়া, এই যে নিজেকে দিতে পারি কাউকে, কারো হতে পারি; এই সম্ভাবনাটাই যেদিন নিভে যাবে, সেদিন, মানে এই দামী অনিশ্চয়তাটাই যেদিন মরে যাবে, সেদিন বেঁচে কী আর সুখ পাবো? নিজের কাছে নিজে কি আর দামী থাকবো তখন?

তুইই তো একটু আগে বললি, বিবাহিতা হলেও আজকাল নিতে-দিতে অসুবিধে নেই কোনোই।

না তা নেই। তবে, তাতে তো আরও অনেকই বেশি কমপ্লিকেশান্। বিশেষ করে, বাচ্চারা এসে গেলে। আজ তুই যদি মা হতিস, পারতিস কি অত সহজে ডিভোর্স চাইতে?

পর্ণা একটু চুপ করে থেকে বললো।

হয়তো পারতাম। তবে অনেকই কষ্ট হতো। অনেকই! সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো।

নে চল্। বেলা তো পড়ে এলো। তৈরী হয়ে নে। এখন কি চান করবি?

পর্ণা বললো।

নিশ্চয়ই। চান না করে অভিসারে কি যাওয়া যায়? তাছাড়া, গীজার থাকলেও রাতের বেলা চান না করাই ভালো।

তুই কর। আমি শোবার আগে, বারোমাসই, চান না করে শুতে পারি না।

আমি রাতে করবো। তাছাড়া, আমি তো আর অভিসারে যাচ্ছি না।

তাহলে বাথরুমে যাচ্ছি আমি। কলি বললো।

এ বাড়ির চানঘরগুলিও দেখার মতো। এখনও সন্ধে হয়নি। তাই আলো জ্বালালো না কলি। বাড়ির ভিতটি এতোই উঁচু যে চান করার সময়েও বাথরুমের জানলা বন্ধ করার দরকার হয় না। তবু শহরের মানুষ বলে ওরা সংস্কারবশত বন্ধ করে নেয়। আলো জ্বালেনি বলে এখন বন্ধ করলো না।

বিরাট বাথটাব। মেঝেতে ঢোকানো। তার পাশে মস্ত আয়না। দেওয়াল জোড়া। বাথটাব-এ শুয়ে নিজেকে পুরোপুরি দেখা যায়। শাওয়ার নেওয়ার জন্যে দাঁড়ালেও দেখা যায়। দেওয়ালে বহু পুরানো দিনের জাপানী ক্যালেন্ডারের নগ্ন-রমণীদের বাঁধানো ছবি। মসৃণ, গোলাপিতে-সাদা মেশা অবিশ্বাস্য ত্বক তাদের। জানালা দিয়ে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ঝুলে-থাকা সিঁদুরে-লাল ফুলের স্তবকের ছবি ফুটে উঠেছে আয়নাতে। তাই বাথটাব-এ শুয়ে, প্রস্ফুটিত নিজের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে কলির, যেন কৃষ্ণচূড়ার বনেই নগ্না হয়ে শুয়ে আছে। মহারানী মহারানী লাগছে নিজেকে।

গলা অবধি জল। পায়ের পাতাও জলে ডোবা। জল সারা শরীরকে চাঙ্গা করে দিচ্ছে।

কলি ভাবছিলো।

কে জানে! সুবর্ণ যা বলেছিলো পর্ণাকে তা সত্যি কি? পর্ণাটা বড় বোকা। পরীক্ষা না করেই বাতিল করার মতো মুর্খামি আর দুটি নেই সংসারে। দেখতই না হয় সুবর্ণ যা বলে, তা করে, কী হয়! সুবর্ণকে তো মানুষ খারাপ বলে মনে হয়নি কলির কখনও। অথচ পর্ণাকেও বুদ্ধিহীনা বলে মানতে রাজী নয় সে আদৌ: দম্পতিরাই জানে একমাত্র দাম্পত্যের সুখ-অসুখ, সুবিধে-অসুবিধে। বাইরে থেকে তা বোঝা ভারী মুশকিল। বোঝার চেষ্টাও মুর্খামি।

কলি, এই যে তার শরীরকে দেখতে পাচ্ছে আয়নাতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বচ্ছ জলের নীচে তার মধ্যে এমন কী আনন্দ থাকতে পারে যার উৎসমুখ খুলে দিলে শরীর বহুমুখে উৎসারিত হয়। কে জানে বাবা! সুবর্ণর বলার কথা ভাবলেই আতঙ্কিত হয়। আবার এক ধরনের রোমাঞ্চও যে বোধ করে না এমনও নয়। মানুষের জীবন, এই মন, এই শরীর সবকিছু নিয়ে মানুষের জীবন বড়ই ইন্টারেস্টিং। অথচ একটা মাত্রই জীবন! তাকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে হবে। হঠাৎ কোনো জৈব বা দৈবদুর্ঘটনা তাকে মাটি করে দেবে এমন বোকা অন্ততঃ কলি নয়। পর্ণা হলেও হতে পারে।

কিন্তু 'মন নয় মনেরি মতো
সে যে নয়নেরি অনুগত
তারে বুঝায়ে রাখিব কত
সেযে নানা পথে চলে গো
যারে তারে মন দিতে বলে গো
নয়ন আমার........।'

এই জলভরা বাথটাব-এ নগ্না হয়ে শুয়ে সিঁদুর-লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে স্তবকে নত—হওয়া ডালের পটভূমিতে, জলের শব্দ শুনতে শুনতে ওর ভারী লজ্জা করলো। এই সময়ে বারেবারেই তার স্নিগ্ধকেই মনে পড়ছে কেন?

দুটো কোকিল উড়ে এসে বসলো কৃষ্ণচূড়ার ফুলফলন্ত ডালে। আয়নাতে তাদের ছায়া পড়লো। তারা দু'জনে একই সঙ্গে ডাকতে লাগলো : কু-উ।

কু-উ-উ, কু-উ-উ-উ—

কোকিল দুটো বোধহয় পাগল। বসন্ত তো চলে গেছে। কিন্তু তাদের মন থেকে এখনও যায়নি বোধহয়।

কলি গুনগুন করে গেয়ে উঠলো : 'কখন যে বসন্ত গেল, এবার হলো না গান।'

ঠিক এমন সময়ে পর্ণা দরজা ধাক্কা দিয়ে বললো, কলি। স্নিগ্ধ এসেছেন।

লজ্জাতে হুড়মুড় করে জল ঠেলে উঠে বসলো কলি। যেন, বাথরুমেই ঢুকে পড়েছে স্নিগ্ধ।

উনি বলছেন, আর পনেরো মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেই ভালো।

সিক্ত, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল শরীরকে আবার শিথিল করে বাথটাবে ডুবিয়ে দিয়ে কলি বললো, বলে দে, ঠিক আছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। তুই তৈরি হয়ে নে।

কলি বাথরুম থেকে বেরোতেই, ড্রেসিং-টেবিলের সামনে-বসা পর্ণা বললো, মানুষটি ভারী ভদ্র।

তোয়ালে দিয়ে প্যাঁচানো চুল ঝাড়তে ঝাড়তে কলি বললো, ভয় তো সেই-জন্যেই।

পর্ণা তৈরী হয়েই ছিলো। কলিও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলো। চকিতে ঘড়ি দেখলো একবার। বারো মিনিট হয়েছে। ঘরে তালা দিয়ে যখন ওরা পর্চ'এ গিয়ে দাঁড়ালো তখন স্নিগ্ধ ডেকে যাবার পর থেকে চোদ্দ মিনিট হয়েছে ঠিক।

প্রণয় ঘড়ি দেখে গাড়ির দরজা খুলে দিলো।

বললো, বাবাঃ, আমাদের দেশের সব মানুষের এমন সময়জ্ঞান থাকলে দেশের উন্নতি ঠেকাতো কে? কিন্তু স্নিগ্ধর দাদু আপনাদের কোথায় দেখলেন? আপনাদের রূপগুণের প্রশংসাতে তো স্নিগ্ধকে পাগল করে দিলেন। আমাকেও।

তাই?

কলি, চাপা খুশির গলাতে শুধোলো।

আমাদের তো একবারই দেখেছেন বাগানে।

ঐ একবারই যথেষ্ট।

পর্ণা শুধোলো।

আপনিও যাচ্ছেন নাকি?

আপনার আপত্তি থাকলে যাবো না। তবে স্নিগ্ধ রায়চৌধুরীর গাড়ি তো! যতটা পথ এঞ্জিনের জোরে চলে, ঠেলায় চলে সে তার চেয়ে ঢের বেশি। আপনারা যদি চাকা—বদলাবার, মবিল-ট্যাঙ্কের ছ্যাঁদায় সাবানের পুটুলি

লাগাবার বা এই ঢাউস গাড়ি ঠেলাবার দায়িত্ব নেন, তাহলে তো আমি বেঁচে যাই। না গেলেও চলে। আজই সন্ধের গাড়িতে চারজন সুন্দরী কুমারী আসছেন হোটেলে। নতুন গেস্টস। দাদুকে খবরটা দিতে হবে, আমাকেও অ্যাটেনশান…

চুপ করবি ?

বলেই, স্নিগ্ধ এঞ্জিন স্টার্ট করতে করতে বললো, সুন্দরী তা জানলি কি করে ? কুমারীও যে তারই বা কি প্রমাণ ? আজকাল তো সব মহিলারাই এম. এস. লেখেন।

তুই কি করে বুঝবি ? আমার ইনটুাশান আছে। তাই দিয়ে সব বুঝি। হাতের লেখা থেকেই বুঝে নিতে পারি।

বাবাঃ। আপনি তো দেখছি ভৃগু।

মানে ভৃগু ফুকন ?

ধ্যাত। ভৃগু, ভৃগু জ্যোতিষশাস্ত্র…

একজন ফাণ্ডাওয়ালা মানুষ।

ও। সেই ভৃগু! না, ভৃগু কেন হতে হবে ? কোনো দাদা হয়ে গেলেই হবে। আজকাল রামাদা, শ্যামাদা, কত দাদা জ্যোতিষী কাগজে বিজ্ঞাপন দেন দেখেন না ?

যাক। তাহলে তো ভালোই। দাদুর অ্যাটেশান তাহলে এখন আমাদের থেকে সরে তাঁদের উপরেই পড়বে।

কলি বললো।

কাদের উপরে ?

ঐ যে সুন্দরী কুমারীরা আসছেন !

স্নিগ্ধ বললো, দেখুন, প্রণয়ের কথায় আমার দাদুকে নিয়ে পড়বেন না হি ইজ আ গ্রেট সোওল। আপনাদের যে তাঁর ভালো লেগেছে সেই অপরাধের শাস্তি কি এমন করেই দিতে হবে ?

তা বলা যায় না। দাদুর নজরটি যে ভারী ভালো। আপনাদের ধারণা কি হোটেলে যাঁরাই আসছেন, তাঁদেরই দাদু অমন চোখে দেখছেন। মোটেই না। আমি তো এর আগে একজনদের বেলাতেই তো অমন করতে দেখিনি। দাদুর কাছে কিন্তু আরেকবার যাবেন। আপনাদের সত্যিই খুব পছন্দ হয়েছে দাদুর। অথচ কত সামান্য সময়ই বা ছিলেন। আহা! একা মানুষ। কষ্টও হয়। একটি মনের মতো নাত-বৌ পেলে উনি…

স্নিগ্ধর মুখ-লাল হয়ে গেলো লজ্জায়। বললো, প্রণয়, এনাফ ইজ এনাফ। ইয়ার্কি-ফাজলামির একটা লিমিট থাকা দরকার।

প্রণয় চুপ করে গেলো।

আমাদেরও খুবই পছন্দ হয়েছে দাদুকে। চমৎকার মানুষ। নিজেদেরও যদি অমন একজন দাদু থাকতো।

প্রসঙ্গ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে কলি বলে উঠলো।

প্রণয় হেসে বললো, এমন দাদু কি সহজে মেলে ? বহু-জন্ম তপস্যা

করতে হয়।

বলেই, বললো, তা পরের দাদুকে নিজের করে নিলেই তো হয়! ঠেকাচ্ছেটা কে? দাদুও তো তাই চাইছেন। মানে মুখে বলেন নি, কিন্তু আমার মন বলছে।

পর্ণা বললো, মনে হচ্ছে আপনি চান যে আমরা কাল ভোরের গাড়িতেই ফিরে যাই কলকাতা।

স্নিগ্ধ বিরক্ত গলায় বলায় বললো, তুই বড় বাজে কথা বলিস প্যানা। একটু চুপ করবি। নিজের মান নিজের কাছে রাখতে পারিস না।

আমার মান? যেদিন থেকে তোর সঙ্গে দহরম-মহরম, সেদিন থেকেই তা কচুক্ষেতে খোওয়া গেছে। আমার নাম হয়েছে মানকচু।

কলিরা হেসে উঠলো।

প্রণয় বললো, কাল রাতেইতো আবার দাদুর কাছে তলব পড়েছে। দয়া করে যাবেন। নইলে হোটেলই তুলে দেবেন হয়তো। আমাদের রুটি বাঁচাবেন।

গাড়িটা ড্রাইভ দিয়ে এসে গেটের কাছে পোঁছেছে ঠিক এমন সময়ে বাইরে থেকে একটি মেয়ে, কালো কিন্তু অসম্ভব ভালো ফিগার এবং সুন্দর মুখশ্রীর, সাইকেলে চড়ে ঢুকলো বাড়ির হাতার মধ্যে। এবং গাড়ি দেখেই গাড়ির পথ-রোধ করে দাঁড়ালো সাইকেল থেকে নেমে।

অন্ধকার হয়ে গেছে এখন।

গাড়িটা তার পাশে যেতেই মেয়েটি বললো, এই যে স্নিগ্ধদা! খুব পায়া ভারী হয়েছে আজকাল, না? আমাদের তো ভুলেই গেছো! কারা নাকি ডানা-কাটা পরী এসেছে দুজন তোমার হোটেলে, তারা নাকি যাদু করেছে তোমায়।

তোকে কে বলল?

কে আর? দাদা।

স্নিগ্ধ প্রণয়ের দিকে চেয়ে বললো, রাসকেল! অ্যাই! তুই নেমে যা গাড়ি থেকে। একটা বাজে লোক। গসিপ্-মঙ্গার।

এ কী! এ কী! আমি কী করলাম্!

আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো প্রণয়।

দাদা বুঝি গাড়িতেই?

বলেই, মেয়েটি মুখ ঢুকোলো গাড়ির জানালা দিয়ে।

এবং মুখ ঢুকিয়েই পর্ণাদের দেখেই ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বললো, সরী! সরী! আচ্ছা, অন্ধকারে কি দেখা যায়? বলুন? তার উপর কারো মুখে যদি হেডলাইটের আলো পড়ে। তা কথাটা ইয়ার্কি হলেও দাদার ডেসক্রিপ্‌শান কিন্তু বেঠিক নয়। সত্যি আপনারা খুবই সুন্দরী। মার কাছে শুনেছিলাম, এখন নিজের চোখে দেখলাম।

ততক্ষণে ওরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। মানে, কলি আর পর্ণা।

প্রণয় বললো, আমার বোন হুস্নো। সেদিন যখন আপনারা গেছিলেন ও তখন খুরাপুরের বাজারে গেছিলো।

হুস্নোর পরনে একটি হালকা-নীল-রঙা সিল্কের শাড়ি। একটি চকচকে কালো সাপের মতো বিনুনী, কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে অনেক নিচে। সাদা

ব্লাউজ। মুখে বুদ্ধির প্রসাধন। কলি ভাবছিলো, শহরের মেয়ে সুন্দরী হতে পারে। কিন্তু এই আদিবাসী মেয়েদের উপর আদিদেবদের আশীর্বাদ আছে। এদের চলন-বলন, Torso, গ্রীবা ভঙ্গী, ভ্রূভঙ্গী, কলিরা কোনোদিনও পাবে না। ঈশ্বরের দূতী ওরা।

হাসতে হাসতে হনসো বললো, নামলেন কেন আপনারা? উঠুন গাড়িতে।

আপনি যাবেন না?

পর্ণা শুধোলো।

আমি? আমি গেলে চলবে কি করে? আমি তো এই হোটেলের অবৈতনিক কর্মচারী। নতুন গেস্টসরা আসবেন, দাদারাও দুজনেই আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। তাই তো আমায় হোটেল সামলাতে হয়েছে। তা বুঝি জানেন না? গুড-ফ্রাইডের আগে-পরে ছুটি পড়ে গেছে তো! এ ক'দিন ভীড় হবে খুবই।

ওঁদের আনতে যাবেন কে? স্টেশনে? মানে আজ যাঁরা আসছেন? যে মহিলারা?

হনসো শুধোলো।

সে কালিদা যাবে? আমাদের নিজেদের রিকশা নিয়ে। এমন চাঁদের আলো, আর চৈতি হাওয়াতে সাইকেল রিকশাতে করে বেড়াতেই তো মজা। ফুরফুর করে হাওয়া লাগবে গায়। নানা গন্ধ মেশা হাওয়া। তাছাড়া সবাইকে আনতেই তো আর স্নিগ্ধদা যায় না! শুধু ভি-আই-পি-দের জন্যেই যায়!

তাই?

স্নিগ্ধ বললো, বেশি ফাজিল হয়েছিস তোরা ভাইবোনে। যা তো! আমার একজন গেস্ট আসবে। লোকাল। তাকে খাতির যত্ন করিস। চারটে ডিম দিয়ে রহিমকে বলিস ওমলেট ভেজে দিতে। তার কোনো অযত্ন যেন না হয়।

কে সে?

হনসো অবাক হওয়া গলায় বললো।

রামদয়াল হেমব্রম্।

স্নিগ্ধ বললো।

হনসোর মুখ অন্ধকারে দেদীপ্যমান হলো।

ইয়ার্কি হচ্ছে! ফিরে এসো। তোমার নাক মুলে দেবো।

হনসো বললো, কপট রাগে।

নারে। সত্যিই রাম ফিরে আসবে। ঝগড়া বাধাস না আবার তার সঙ্গে। সে। কিন্তু তোর নয়, আমারই অতিথি। কথাটা মনে রাখিস। রাতে খেয়েও যাবে। দাদুর কাছে নিয়ে যাস একবার। খুশি হবেন দাদু। বড় ভালোবাসেন রামকে।

বুঝেছি।

চললাম রে।

বলে, স্নিগ্ধ অ্যাকসিলারেটরের রেস বাড়ালো।

গাড়িটা গেট ছাড়িয়ে বাইরে পড়তেই প্রণয় বললো, জোঁকের গায়ে নুন দিয়েছিস। ঠিক করেছিস।

মাসীমাকে বলে, বিয়েটা লাগাচ্ছিস না কেন? দুজনে দুজনকে যখন ভালোবাসে এতো!

স্নিগ্ধ বললো, প্রণয়কে।

আরে পাগলি তো হনুসোই। নিজে একটা ভালো চাকরি না পেলে বিয়ে করবে না বলছে! সেই জেদেই তো বেলা গেলো। তার হাত-খরচের টাকা রামের কাছ থেকে চাইবে না।

হাঃ। রাম কত গুণী ছেলে। য়্যুনিভার্সিটির লেকচারার। ডক্টরেট! স্বভাবচরিত্রে চমৎকার। এমন স্বামী অনেক ভাগ্য করলে পাওয়া যায়।

প্রণয় বললো, গাড়িটা একটু আস্তে কর, একটা সিগারেট ধরাবো।

সিগারেটটা ধরিয়ে স্নিগ্ধকে দিয়ে আরেকটা ধরালো। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললো, গুণী ছেলে তো রামদয়াল হেমব্রম্ ছাড়াও চারধারে অনেকেই চরে-বরে বেড়াচ্ছে। শুধু আমার হনুসোকে দোষ দিয়ে কি হবে? সব মেয়েই তো সমান। তাদের বায়নাক্কার কি শেষ আছে?

পর্ণা, কলির হাঁটুতে অন্ধকারে চিমটি কাটলো।

প্রণয় কথাটা ট্যানজেন্টলি বলাতে স্নিগ্ধ প্রতিবাদ করতেও পারলো না।

পর্ণা আর কলির মজা লাগছিলো। এই প্রণয়টা ভারী মজার ছেলে। গ্রেট কোম্পানী।

স্নিগ্ধ বললো, এবার অন্য প্রসঙ্গে যা হনুসের প্রসঙ্গ ছেড়ে। ভুলে যাস না যে তুই আড্ডা মারতে বেরোসনি। আমার সঙ্গে ডিউটিতে বেরিয়েছিস।

সরী। সরী। আপনারা কিছু মনে করেন নিতো। আচ্ছা, আমি তো কর্তব্যর উপরেও কিছু কিছু করছি, না কি করছিনা? যেমন ধরুন এই যে আমি আপনাদের জন্যে ফ্লাস্কে করে কফি এনেছি অথবা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে পেঁয়াজি এনেছি, আপনারা ছিন্-ছিনারি দেখতে দেখতে লেক-এর পারে বসে খাবেন বলে। এতো বাড়তিই! তাই একটু বেশি কথা বললে ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন। এই প্রার্থনা।

প্রেয়ার গ্রান্টেড।

পর্ণা বললো। হাসতে হাসতে!

তারপর একটুক্ষণ চুপচাপ।

আমরা কি একটি দুটি গান শুনতে পাবো? দাদু যেমন ভেবেছিলেন?

গান? না, না। বেড়াতে বেরিয়ে গান কেন আবার!

পর্ণা বললো।

গান কি শুধু খাটে শুয়েই গাইবার? অথবা বাথরুমে?

কলি বললো, সে দেখা যাবে'খন। মুড এলে তখন অনুরোধ করবেন। আমি তো বাথরুম-সিঙ্গার। গাই না। পর্ণা গাইবে। আপনারা কেউ কি গান করেন?

স্নিগ্ধ বললো, প্রণয় সাঁওতালী, মুণ্ডারী এসব গান খুব ভালো গায়। একটি মাদল থাকলে তো কথাই নেই। আচ্ছা, গাড়ির মাডগার্ডকে না-হয় মাদলের বিকল্প করে নেওয়া যাবে।

প্রণয় বললো, আমি যেন একটা মানুষই নই। আমার কোনো একটা নিজস্ব মতামত নেই? তুই ধরেই নিলি যে আমি গাইবোই, আর তুই মাডগার্ডে মাদল বাজাবি। অন্যরা না গাইলে, আমি গাইতে যাবো কেন?

থাক, থাক। ঝগড়া পরে হবে। ঐ দেখুন! কীরকম চোখ জ্বলছে দেখেছেন? লাল লাল।

বলেই, গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিলো স্নিগ্ধ।

ওমা! সত্যিই তো! কী ওটা? বাঘ?

ভয়ের গলায় কলি বললো।

বাঘ নয়, বাঘের মাসী। বনবেড়াল! এরাও মুরগি, ছাগলছানা; এসব ধরতে ওস্তাদ। আমাদের বাগানের মধ্যেও এসে ঢুকেছে একজোড়া। ছিলো না। কোথা থেকে যেন এসেছে ক'দিন হলো। পাখির ডিম খেয়ে শেষ করলে। কালকেই ও দুটিকে বিদায় করবি তো প্রণয়।

ইজেক্টমেন্টের নোটিশ দিতে বলছিস?

ইয়ার্কি মারিস না। দিলগুন্দের ডেকে নিস। এমনিতে না পারলে, বন্দুকের আওয়াজ করে ভয় পাইয়ে বিদেয় করিস।

তা হবে না। আমি গুলি ছুঁড়লে গুলি যে লক্ষ্যেই পৌঁছে যায়। তোর মতো বন্দুকবাজ তো সবাই নয়। তোর ছোঁড়া গুলির সঙ্গে কখনওই লক্ষবস্তুর যোগাযোগ হয় না বলেই চিরদিন তুই 'ভয় পাওয়াবার' জন্যেই গুলি ছুঁড়িস।

হুঁ। তোর দিকে যেদিন ছুঁড়বো, সেদিন জানবি গুলি কোথায় যায়।

এই যে, এসে গেছি।

প্রণয় বললো।

তারপর বললো, এই ছিঁদো আর ভেতরে যাস না। বেজায়গাতে গাড়ি বেগড়বাঁই করলেই চিত্তির। তোমার আর কী! রাজার ব্যাটা, তুমি তো স্টীয়ারিংএ বসে সিগারেট ফুঁকবে আর বলবে, এটা কররে, ওটা কররে। এই গাড়িটাকে ছুটি দিয়ে দে না।

যেমন হোটেল, তেমন তো গাড়ি হবে।

তাও ভালো, বলেননি যেমন গেস্টস সব, তেমন তো গাড়ি হবে!

পর্ণা ফুট কাটলো।

ওরা একসঙ্গে হেসে উঠলো।

এই যে। নেমে, এইবার পাথরটার উপরে বসুনতো চটি খুলে, জম্পেস করে। এম.এস. ঘোষ এবং এম.এস. রায়।

বাঃ। সত্যিই অপূর্ব জায়গা।

ওরা নেমে, একটু পায়চারি করেই পাথরের উপর বসে পড়লো।

চাঁদের আলো চির্‌চিরি ঝিল-এর জলে পড়ে প্রতিসরিত হয়ে চারধারের কিশলয়ে-ছাওয়া কচি কলাপাতা-রঙা উজ্জ্বল পাতায় পাতায় প্রতিসরিত হচ্ছিলো।

রাতে অবশ্য সব পাতাকেই কালো বলে মনে হয়। শুধু কিছু কিছু পাতার ভেতরের এবং সামান্য কিছু বাইরের অংশকেই শুধু সাদা দেখায়।

যেসব গাছের পাতারা ঝরে গেছে তাদের কারো কাণ্ড আর ডালপালা কালো, কারো বা সাদা।

ফুরফুরে হাওয়াটা বয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কতরকম যে গন্ধ! কলির সত্যিই খুব ইচ্ছে করছিলো 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গানটি ডুয়েট গায়। কিন্তু 'ফুলের বনে যার পাশে যাই, তারেই লাগে ভালো' লাইনটার জন্যে গাওয়া বিপজ্জনক মনে করে চেপে গেলো।

মেয়েদের যে কত্ত এবং কত্তরকম বিপদ!

নানারকম গল্প হলো; আধঘণ্টাটাক পরে প্রণয় বললো, আমি একটু রাম্-নাম করলে আপনাদের আপত্তি নেই তো? আমি তো জঙ্গলেরই মানুষ। সন্ধেবেলায় একটু মহুয়া, একটু নাচগান; এই আমার ট্রাডিশান।

স্নিগ্ধ বললো, তোর মতো আরও কয়েকজন জুটলেই সব আদিবাসীদেরই সর্বনাশ হবে। তুইও সাঁওতাল! কিন্তু অমন একটি দারুণ জাতের, তুই একটি কুলাঙ্গার।

না, না। আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? তাছাড়া আগেকার দিনকাল তো নেই। আমাদের কাকা-মামারাও তো সবাই একটু-আধটু…

দাদারাও বল্।

হ্যাঁ তাও। আপন হোক, কী কাজিন!

পার্টি-টার্টিতে আমাদেরও মাঝে-মধ্যে, যাকে বলে সোস্যাল-ড্রিঙ্কিং করতে তো হয়ই! আজকাল রীতি-নীতি সব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

স্নিগ্ধ বললো, আপনি কি ভালো বলেন এটাকে?

ভালো কী খারাপ তা বলতে পারবো না। তাছাড়া আমার বলাবলিতে কীই বা যাচ্ছে আসছে। গান্ধীজী, মোরারজী, বিনোবাজী-রাই ফেল, তার আমি…

কলি বললো, এমন পরিবেশে একটু জিন্ হলে বেশ হতো। না রে?

পর্ণা বললো, যা বলেছিস! প্রণয়বাবুর গানের সঙ্গে।

প্রণয় বললো, দেবীদের প্রাণে যখন সখ উঠেছে তখন হবে। আমার নাম প্রণয় রুদ্র। গানও হবে। জিন্ও হবে। 'বার' আমার পকেটেই থাকে। এই যে জিন্। আর এই গন্ধরাজ লেবু। আর এই হচ্ছে আইস-বাকেট। আর এই হলো গিয়ে গ্লাস। আর এই হলো গিয়ে পেঁয়াজি। এই হলো গিয়ে ছুরি, লেবু কাটার জন্যে; আর এই হলো ভালো ছেলের জন্যে কফি।

মাই গুডনেস। হাউ থটফুল অফ ঊ্য! আপনি এতো সব বয়ে নিয়ে এসেছেন? সত্যি!

পর্ণা আর কলি সমস্বরে বলে উঠলো।

প্রণয় মুখ ঘুরিয়ে, গম্ভীর গলায় বললো, সেদিন রাতের কনিয়াক্-এর মতো এও কিন্তু ফ্রী-অফ-চার্জ। গ্রাটিস্। উইথ দ্য কমপ্লিমেন্টস্ অফ 'মন্দার হোটেল'।

স্নিগ্ধ বললো, আমার হোটেল উঠে গেলো বলে। গত দেড় বছর ঠিক কী ভাবে যে চললো সে কথা ভেবেও অবাক লাগে।

যাক গে যাক। এই রকম রাত। পর্ণাদেবী, কলিদেবীর সঙ্গ, তোর মতো দেবতার সঙ্গ, সরি, এম.এস ঘোষ, এম.এস. রায়; "এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো।"

গুলি মার 'মন্দার হোটেল'কে! কাল সকালে বনবেড়ালদের সঙ্গে ওটাকেও 'ভয় পাইয়ে' ভাগিয়ে দেবো। বন্দুকের গুলি ফুটিয়ে।

অন্যমনস্ক স্নিগ্ধ বললো, কাকে?

'মন্দার হোটেল'কে। তবে আর বলছিটা কি।

প্রণয়ের কথাতে হেসে উঠলো ওরা সকলে।

প্রণয় বললো, তুই গেছিলি কোথায়?

মানে?

এই থেকে থেকেই কোথায় যে উধাও হয়ে যাস, তুইই জানিস।

অন্য কথা বল।

গম্ভীর হয়ে স্নিগ্ধ বললো। তারপর বললো, তোব স্থান-কাল-পাত্রর জ্ঞান কোনোদিনও হবে না। বুঝলি!

প্রণয় চুপ কবে গেলো।

প্রণয়ের মতো কিছু মানুষ থাকে সংসাবে যাঁরা হাসতে এবং হাসাতে, সেবা করতে এবং ভালোবাসতেই আসেন। কারো কাছ থেকেই বোধহয় চাইবার কিছুমাত্রই থাকে না তাঁদের।

পর্ণা ভাবছিলো।

কলি ভাবছিলো, এই স্নিগ্ধ মানুষটাও কিছু চায়। কী চায়?

দিন আমাদের এদিকে। আমরা বানিয়ে দিচ্ছি।

মাথা খারাপ। আমি, কালিদা, গণশাদা; আমরা হচ্ছি গিয়ে সেবাদাস। এমন মা লক্ষ্মীদের সেবা করবার সুযোগ জীবনে একবার যদি এলো তাও কি ফস্‌কে দিতে যেতে পারি? আমি সব কিছুই করে দিচ্ছি।

স্নিগ্ধর দিকে চেয়ে পর্ণা বললো, আপনি বুঝি ড্রিংক করেন না?

করি না, মানে, তেমন ধনুকভাঙা পণও নেই। খেলেই হয়। তবে ভালো লাগে না!

ও খাবে কি? জ্যাঠাবাবু, মানে ওর বাবা, যা খেয়ে গেছেন ওর অ্যাকাউন্টে তাতে ওর চার-জন্ম না খেলেও চলবে। বড়দাদুও এখনও তো ওর অ্যাকাউন্টেই চালিয়ে যাচ্ছেন। একমাত্র বংশধর তো! মুখে আগুন দেবার দ্বিতীয় তো কেউই নেই। তাই আমায় সঙ্গে-সঙ্গে রাখে সবসময় স্টেপনি হিসেবে।

বড় বেশি কথা বলিস তুই! একটু চুপ করে ওঁদের একটু সৌন্দর্য উপভোগ করতে দে।

সারাটা দিনই তো তুই খাটাস। এই অ্যাকাউন্ট লেখ, এই বিল কর, এই চিঠিব উত্তব দে। কোন মিস্টার ভড়-এর বৌ বাচ্চার ন্যাপি ফেলে গেছে বা মজুমদারবাবু নস্যির রুমাল, ঠিকানা খুঁজে খুঁজে কলকাতা পাঠা। একটু কথা বলার জন্যে প্রাণটা আই-ঢাই করে। যাকগে। আপনারা সৌন্দর্য উপভোগ করুন। ততক্ষণে জিন্‌টা বানিয়ে দিই!

অনেকক্ষণ ওরা সত্যিই চুপ করে রইলো। নির্জনতারও যে এতো কিছু বলার থাকতে পারে, তা যে এমন বাঙময় হয়, তা জানা ছিলো না পর্ণা আর কলির।

অনেকক্ষণ সময় গেলো। পর্ণা দুটো বড় জিন্ খেয়ে ফেলেছে। খেয়েই বুঝতে পেরেছে যে, কাজটা ভালো করেনি। কলি খাচ্ছে না। মানে, সামান্য নিয়ে, হাতে করে বসে রয়েছে। স্নিগ্ধও নয়। স্নিগ্ধ চুপ করে বসে সিগারেট খাচ্ছে আর কী যেন ভাবছে।

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক পবে প্রণয় আব কথা না বলে থাকতে না পেরে বলে উঠলো, সৌন্দর্য উপভোগ হয়েছে?

ওরা হেসে ফেললো সকলেই ওর কথা শুনে।

স্নিগ্ধ বললো, গান গা না একটা। তোরও কি লজ্জা হলো নাকি?

প্রণয়কে আব বলতে হলো না। দু তিন ঢোঁক রাম্ পাঁইটের বোতল থেকেই ঢকঢকিয়ে ঢেলে খেয়ে ও গান শুরু করে দিলো। আগে কতখানি খেয়েছিলো অন্ধকারে ঠাহর হয়নি। কারই বা ভালো লাগে সবসময়ে গার্জেনী করতে!

প্রণয় ধরলো · 'হাতুগোম লিদিলিদিরে হাতুগোম বাগেজাদা।'

এই প্রথম পংক্তি গাইতেই ঝিলের জল, ঝাঁটি-জঙ্গল, ও পাশের চিকনডিহ্ পাহাড়ের ঘুমন্ত শিলাস্তূপ—সব যেন কেঁপে উঠলো। এদেশের আদি বাসিন্দার গলার অনাবিল উদাত্ত স্বরে যেন পুরো দেশ জেগে উঠলো। দুলে উঠলো।

প্রণয় গেয়ে চললো:

'হাতুগোম্ লিদিলিদিরে
হাতুগোম্ বাগেজাদা
দিশুম্‌গো লায়া কোয়ারে
দিশুম্‌গো রারা জাদা।
মোদোকিয়া সিন্দুরীতে
হাতুগোম বাগেজাদা
বারে থারি সাসানাতে
দিশুম্‌গো রারা জাদা।'

গানটি শেষ হলে পর্ণা আর কলি প্রায় একসঙ্গেই জিগেস করলো, গানটির মানে কি?

কলি বললো, এই গানটির কথাগুলো চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন পড়েছি। কোথায়? জানিস পর্ণা?

কী জানি!

মনে পড়েছে! 'সাসানডিরি' বলে একটা বইয়ে।

প্রণয় স্নিগ্ধকে বললো, মানে বলে দে, ছিঁদো। আমি রাম খাই।

স্নিগ্ধ বললো, মানে হলো, ছেলে বলছে মেয়েকে:

'সুন্দর এই গ্রাম ছেড়ে তুই চলে যাচ্ছিস মেয়ে, এই গ্রাম, এতো সুন্দর দিশুম, তুই আর কোথায় পাবি? এক ভাগা সিঁদুর আর দু-ভাগা হলুদের

জন্যে, যা তোর বর তোকে পরাবে, তারই জন্যে, শুধু তারই জন্যে তুই এই সুন্দর গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিস ?

বাঃ ! কী সুন্দর !

'সাসানডিরি' কার লেখা বল্ তো ? পাবলিশার্স কে ?

পাবলিশার্স ? আনন্দ পাবলিশার্স । আর লেখকের নাম···

কলির কথা কেটে পর্ণা বললো, আরেকটা জিন্ দেখি । প্লীজ । বড় করে । রিয়্যাল বড় । এই যে প্রণয়বাবু !

প্রণয় বললো, মাই প্লেজার ।

কলি তাকিয়ে রইলো ওর দিকে অবাক চোখে । মুখে কিছু বললো না ।

স্নিগ্ধও তাকালো একবার পর্ণার দিকে । তারপর কলির দিকে । দুজনের চোখাচোখি হলো । উদ্বিগ্ন দেখালো একটু কলিকে ।

প্রণয় জিন্-এর পাঁইটটা পুরোই ঢেলে দিলো বড় গ্লাসে ।

স্নিগ্ধ বললো, এ কী করছিস !

পর্ণা বললো, ওঁর কি দোষ ? আমিই তো চেয়েছি । আমার ভালো লাগছে । এমন পরিবেশ । এমন চাঁদের আলো । এমন গান । এমন সঙ্গ । আই অ্যাম এনজয়িং মাই-সেল্ফ্ থরো । এবার আরেকটা গান ।

কলি খুব বেশি হলে একটি ছোট পেগ মতো খেয়েছিলো । এই সব যে এনজয় করার জন্যে, এদের ভারে চাপা পড়ে মরার জন্যে নয়, এই কথাটা খুব কম মানুষই বোঝেন । প্রথমের দুটি বড় জিন্ অত তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলাতেই মাথায় চড়ে গেছিলো পর্ণার । তার পরে পুরো বোতল নেওয়াতে সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে কলি বললো পর্ণাকে, টেক্ ইওর টাইম । দেয়ারস নো হারী পর্ণা । প্লীজ, আমার কথা শোন্ ।

আই অ্যাম ফাইন । আই অ্যাম নট আ বেবী । অ্যান্ড উ্য আর নট মাই গার্জেন ইদার । ওক্কে ! স্টপ্ ইট ন্যাউ !

কলি চুপ করে গেলো । এতোক্ষণ মদের সুফল ছিলো । এখন কুফল শুরু হলো । এই জন্যে কারোরই মদ খাওয়াটা ওর পছন্দর নয় ।

প্রণয় রাম্-এর পাঁইটে আরেক চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলো :

'দোলাংহো পিরিওসুরি হুন্দিবা
দোলাংহো শুশুম্কোতেনা······'

মানে ?

স্নিগ্ধকে পর্ণা শুধোলো । মানে বলুন না ?

কলি লক্ষ করলো, পর্ণার কথা জড়িয়ে এসেছে । খুবই লজ্জা করছিলো কলির এবং বিপদগ্রস্তও বোধ করছিলো ।

স্নিগ্ধ গানের মানে বললো পর্ণাকে :

'চলো প্রিয়া, হুন্দি ফুলের মতো সুন্দরী, চলো, আমরা নাচতে যাই ।' তারপর ?

'দোলাংহো পিরিওসুরি হুন্দিবা
দোলাংহো শুশুম্কোতেনা !

দোলাংহো ইচাচিংড়িচম্পায়েরা
দোলাংহো কারামেকোতেলাং।'

ইচা ফুল, চিংড়ি ফুল, আর চম্পা ফুলে সেজে নাও। চলো, আমরা নাচতে যাই।

'কাইণ্ডাহো গাতিং বাঙ্গাইয়া
কাইণ্ডাহো শুশুন্‌কোতেদো
কাইণ্ডাহো সাঙানিও বাঙ্গাইয়া
কাইণ্ডাহো কারামেকোতেলাং।'

মানে হচ্ছে : না, না, না, আমি নাচতে যাবো না। তোমার সঙ্গে আমার প্রেম নেই। আমার জুড়ি যে সেই নেই, তাই তোমার সঙ্গে কার্‌মা নাচ নাচবে। আমি যাবো না গো।

প্রণয় বললো, এ-গানটা আরো বড়। আর গাইতে ইচ্ছে করছে না। ভালো লেগেছে?

পর্ণা এগিয়ে এসে প্রণয়কে গাঢ় গলায় বললো, খুউব। আবার গান। আমি নাচবো। আমি এই জঙ্গলের পাহাড়ের ঝিলের দেশেই থেকে যাবো। আপনি, আপনি আমাকে····

ব্যাপারটি হালকা করার জন্যে স্নিগ্ধ এবং কলি সমস্বরে হেসে উঠলো।

পর্ণা ঘুরে দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধকে বললো, হাসছেন কেন? হাসির কি আছে? হাসছিস কেনরে তুই কলি? আমি····আই অ্যাম মেকিং আ ডিক্লারেশান। আমি কলকাতায় ফিরবো না। চাকরি ছেড়ে দেবো আমি। এই উদার আকাশের নিচে, এই চাঁদ্‌ভাসি বনে, এই ঝিলের পাশে আমি কুঁড়ে ঘর বেঁধে থাকবো। কোথায় আমার জুড়ি। কই?

বলেই, ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগলো পর্ণা।

'দোলাংহো পিরিওসুরি হুন্দিবা
দোলাংহো শুশুম্‌কোতেনা···।'

খাওয়া-দাওয়া সে রাত্রে ঘরেই হলো। গাড়িটাও একেবারে ওদের ঘরের সামনে নিয়ে এসেছিলো স্নিগ্ধ। হোটেলের মালিক এবং ম্যানেজার হিসেবে আতঙ্কটা ওরই সবচেয়ে বেশি ছিলো। নতুন গেস্টস্‌রা খাচ্ছিলেন, যখন ওরা ফিরলো। স্নিগ্ধ ও প্রণয়ের সঙ্গে ওদের দুজনকে নামতে দেখে সকলেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। ওদের একটু দেরিও হয়ে গেছিলো। হন্‌সো দেখা-শোনা করছিলো ডিনারের সময়ে। পর্ণার অপ্রকৃতিস্থতা দূর থেকে কেউই বুঝতে পারেননি। হন্‌সোর পাশে এক সুদেহী লম্বা সপ্রতিভ যুবক দাঁড়িয়েছিলেন। উনিই বোধহয় রামদয়াল হেমব্রম্‌ হবেন। ভাবলো, কলি।

কিন্তু এখনতো কথা বা আলাপের সময় নেই। দোষটা প্রণয়েরই। সঙ্গে জিন্‌ না নিয়ে গেলে তো এমন হতো না। অবশ্য পর্ণার দোষ আরও বেশি। ভারী লজ্জা করছিলো কলির।

স্নিগ্ধ বলেছিলো চাপা গলায়, গাড়ি থেকে নামতে নামতে, আপনারা ঘরে

যান। কালিদা এখুনি খাবার নিয়ে যাচ্ছে।

স্নিগ্ধর মুখ-চোখ প্রণয়ের উপরে রাগে জ্বলছিলো। আজ হবে প্রণয়ের এক চোট। অন্যায়ও করেছে।

ভীষণই লজ্জিত, অপমানিত বোধ করছিলো কলি, পর্ণার জন্যে। কিন্তু পর্ণার মধ্যের জিন্ তখন তাকে এক ধরনের বেয়াড়া ঔদ্ধত্য ও ভঙ্গুর সাহস দিয়েছিলো। সেই মুহূর্তে ওকে না-ঘাঁটানোই ভালো মনস্থ করে জুতো খুলতে খুলতে কলি বললো, কী সুন্দর লাগলো, নারে?

বলেই বললো, তুই কি ফ্রেশ হয়ে নিবি?

না।

কলি ওকে আর কিছু বললো না। পার্টি-টার্টিতে মাঝে মধ্যে খায় বলেই যে অত্যন্ত স্বল্প পরিচিত অচেনা-অজানা পুরুষের সঙ্গে খাওয়াটা উচিত নয় এ-কথাটা পর্ণার মাথায় কেন যে ঢুকলো না, তা জানে না। মেয়েদের অনেকই সংযমের প্রয়োজন হয়। এমনকি আজকের দিনেও। ভারতবর্ষের মেয়েদের সত্যিকারের স্বাধীনতা আসতে অনেক অনেকই দেরী। তাছাড়া মদ খাওয়াইতো স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা নয়!

ওরা দু-একটা কথা বলতে বলতেই খাবার এলো।

খিদে ছিলো না দুজনেরই। ভিন্ন ভিন্ন কারণে। শুধু স্যুপ দুটি তুলে রেখে কালিদাকে বললো কলি, খাবার সবই নিয়ে যেতে।

মাঝরাতে যে ঘুম ভেঙে যাবে মা! ম্যানেজারবাবু খুব রাগ করবেন।

করুন গিয়ে। আর ওঁকে বলবে, যেন নিজে আবার খাবার অনুরোধ না করতে আসেন। স্যুপের বোল দুটো কাল সকালে যখন চা দেবে তখনই নিয়ে যেও কালিদা। কেমন? আমরা শুয়ে পড়বো এখন। খুবই টায়ার্ড।

চা কখন দেবো? কাল সকালে?

বন্ধুর দিকে চেয়ে নিয়ে ও বললো, আমরা কাল একটু দেরি করেই উঠবো। এক কাজ কোরো কালিদা, বেল দিলে তবেই চা নিয়ে এসো। আগে নয়। বুঝেছো? ঘরে এসে খোঁজ নেওয়ারও দরকার নেই চা-এর ব্যাপারে।

এঁজ্ঞে বুঝেছি। বড়বাবু আপনাদের খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলেন গণশাদাকে। কাল দুপুরে ওঁর সঙ্গে খেতে বলেছেন আপনাদের।

আপত্তি করে কলি বললো, খেতে পারবো না বলে দিও। কারণ কালকে আমরা ঝুমকার হাটে যাবো গয়না কিনতে। তবে দাদুর সঙ্গে দেখা করবো নিশ্চয়ই। বলে দিও মনে করে। কাল নয়, অন্য কোনোদিন।

কী বলবো মা?

আহা! ঐ যে! আমরা দুপুরে খেতে যে পারবো না, সে কথা।

গণশাদা কখন এসেছিলো?

ঐ যখন দাদাবাবুরা, মানে ম্যানেজারবাবুরা আপনাদের দুটিকে নিয়ে গাড়ি করে হাওয়া খেতে গেলেন।

হুঁ। বললো কলি।

মনে মনে বললো, হলো কেলো!

কলি যখন চোখ খুললো তখনও রোদ ওঠেনি। কিন্তু আলো ফুটেছে। চাঁপা ফুলের গন্ধে ম'ম' করছে সকালের হাওয়া। পাখি ডাকছে যে কতরকম। ইচ্ছে করে সারাটা জীবন এমনই দুগ্ধ-ফেননিভ উঁচু পালঙ্কে অলসভরে শুয়ে থাকে। যেখানে রোদ নেই, চড়া রোদ ; শুধুই এমন সকালবেলার আলো। যেখানে চিৎকাব নেই, বাস-ট্রাম; মিনিবাসের কদর্য আওয়াজ, চিৎকৃত যাতায়াত ; যেখানে সবাই ভোরের পাখির মতো মিষ্টি করে কথা কয়, ভোরের বাতাসের মতো স্নিগ্ধ যাদের কুশল-জিজ্ঞাসা, স্নিগ্ধ রায়চৌধুরীর মতো অভিজাত সবার ব্যবহার। কিন্তু তা তো হবার নয়। কলি জানে যে, হবে না। ছুটি তো ফুরিয়েই এলো। ওদের তো চলে যেতেই হবে। ভারী ভালো লেগে গেছে যে, ভাবছে, না এলেই হয়তো পারতো।

পাশ ফিরে পর্ণার দিকে চাইলো ও।

দেখলো, পর্ণা দু'চোখ খুলে প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছে কলির দিকে। ওর দু'চোখের কোণ গড়িয়ে জলের ধারা গাল ভিজিয়ে দিয়েছে।

কী হলো ?

কলি বললো।

ছিঃ ! কী ভাবলো আমাকে ওরা দুজনে। ছিঃ ছিঃ।

দোষ তো প্রণয়ের। ও জিন্ নিয়ে গেছিলো কেন ? নিজে না হয় রাম্ খেতো তো খেতো। তাও হোটেলের অতিথি এবং মহিলা অতিথিদের সামনে হোটেলেরই কর্মচারীর রাম্ খাওয়া কি উচিত ? বল্ ?

দৃষ্টিকটু নয় ব্যাপারটা ? একে নির্জন জায়গা, রাতের বেলা, আপন-পুরুষ আমাদের কেউই ছিলো না সঙ্গে, তখন কি ঐ স্বল্প-পরিচিত মানুষের রাম্ খাওয়াটা উচিত হয়েছে ?

ও কি করবে ? ও তো রোজই খায। কিন্তু ও তো বেসামাল হয়নি। তুই নিজে থেকে জিন্-এর কথা না তুললে হয়তো বলতোও না। ও তো কফিই নিয়ে গেছিলো আমাদের জন্যে। ওকে দোষ দিচ্ছিস কেন ?

একটু পরে বললো, তুই খেলি না কেন আমার সঙ্গে ? তুই শেয়ার করলে

তো আমার অতখানি খাওয়া হতো না!

খেলাম তো! একটুখানি তো খেলামই। আর খেলাম না। ইচ্ছে করলো না। তাছাড়া এখন তো বুঝছিস দুজনেই বেসামাল হলে কী হতো। মানে, হতো না হয়তো, কিন্তু হতে পারতো। এসব জিনিস বেশী-টেশী খেতে হয় বাড়ি বসে। বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে। কখন যে এ জিনিস কার মাথায় চড়ে তা স্বয়ং বিধাতাও জানেন না। কী দরকার অশান্তি বাড়িয়ে? এমনিতেই তো জীবনে অনেকই উত্তেজনা, অশান্তি।

পর্ণা উত্তর দিলো না কোনো।

কলি আবার বললো, পর্ণা ভুলে যাসনা এটা বিলেত আমেরিকা নয়, এখনও হয়নি। মাসীমা ঠিকই বলেন। একা মেয়েদের এখানে পদে-পদেই বিপদ। আপন-একজন পুরুষ ছাড়া সত্যিই একা তাদের কোথাওই যাওয়া উচিত নয়।

ফুঃ। আপন পুরুষ! কথাটা ভালোই কয়েন করেছিস।

মুখে ঘৃণার হাসি আধফোটা হলো পর্ণার। বলেই, বিছানাতে উঠে বসলো পর্ণা। বললো, সব পুরুষই পর। পুরুষ আবার কখনও আপন হয়? মা কি জানেন? বাবার মতো ভ্যাবা-গঙ্গারাম ভালো মানুষ, মায়ের অঙ্গুলিতাড়িত পুরুষকে দেখে ভেবেছেন……

তাহলে সব পুরুষই পরপুরুষ বলছিস?

হেসে বললো কলি, পর্ণার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্যে।

জোর করেই হাসলো। ছুটিটা এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যাক ও তা চায় না।

পর্ণা হেসে বললো, তাই তো দেখছি!

বলেই, হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো পর্ণা। বললো, ঐ ডিভোর্সটা, ডিভোর্সটাই আমাকে ভেঙে-চুরে দিয়ে গেছে।

কলি কথা না বলে চুপ করে রইলো। সব কথার উত্তরে কথা হয় না, কথা বলা উচিতও নয়।

কিন্তু পর্ণাকে কথাতে পেয়েছে। ও বললো, তুই জানিস! আমার বাবা পাঁচশো লোককে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ক্যাটারার ডিশ নিয়েছিলো আশি টাকা করে। তাও মিষ্টি ছাড়া। তাছাড়া একটি ঘরে ড্রিঙ্কস-এর বন্দোবস্তও ছিলো। মা আর ঠাকুমার যত দারুণ পুরনো গয়না তা সব ভেঙে মা আমার ইচ্ছেমতো নতুন ডিজাইনের সব গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। পালিশ করা আর রি-মেকিংএর চার্জই নিয়েছিলো দশ হাজার। কত জায়গা থেকে শাড়ি জোগাড় করেছিলাম দু বছর ধরে! স্বামীর সঙ্গে কত জায়গায় বেড়াতে যাবো, পার্টিতে যাবো… সব…।

কলি, খুব ঠাণ্ডা গলাতে বললো, তুই তো বাচ্চা মেয়ে নোস পর্ণা। ডিভোর্সের এতোদিন পরে এতো আপসেট হওয়ার কোনো মানে হয়?

আসলে আগে বুঝতে পারিনি যে বিয়েটা যেমন শুধু আমারই ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিলো না; ছিলো মা বাবার, পরিবারের সকলের, পাড়া-প্রতিবেশীর, বন্ধু-বান্ধব সহকর্মীদেরও তেমনিই ডিভোর্সটাও বুমেরাং হয়ে প্রত্যেকের উপরে এমন করে আসবে। তুই জানিস, বাবার রাতে একদিনও ভালো ঘুম

হতো না। ওজন কমে গেছিল কত্ত! যেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখ হতে পারতো সেটাই সমষ্টির দুঃখ হয়ে ফিরে এলো। আমার জন্যে আমার ঠাকুমা-দিদিমার, পাশের বাড়ির মণিমাসীমার হা-হুতাশ যদি শুনতিস তুই! তাদের দুঃখের কাছে আমার দুঃখটা কিছুই নয়; কিছুমাত্র নয়।

এটা বুঝতে পারি। আমি সব দেখে টেখে এই ঠিক করেছি যে, সম্বন্ধ করে বিয়ে করার বয়স এবং মানসিকতা যখন আমাদের চলেই গেছে তখন বিয়ে যদি আদৌ কোনোদিনও করি তো রেজিস্ট্রি করেই করবো। তুই আমার বিয়েতে সাক্ষী থাকবি। বিয়ের পরই কোথাও চলে যাবো 'হানিমুনে', যেখানে বাঙালী নেই, বিশেষ করে সর্বগ্রাসী কৌতূহলসম্পন্ন, অকুপেশান-হীন অঢেল সময়-সম্পন্ন ওই কলকাতার বাঙালী নেই। আমার বিয়েটা যদি তুমুল উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে ইউলিসীসের আমলের পালতোলা নৌকোর মতো টিঁকেই যায় তাহলে পনেরো বছর পরে বিয়ের তারিখে ঘটা করে সকলকে ডাকবো। ভালো করে খাওয়াবো। গদগদমুখে প্রেজেন্ট নেবো। সবাইকে বলে দেবো সাফ সাফ; দ্যাখো ভাই! বিয়ের সময়ে আমরা বিয়ে করিনি। বিয়ে হচ্ছে এখন। বিবাহ বার্ষিকীর সস্তা উপহারে চলবে না, বিয়ের উপহার দিতে হবে। সেদিন গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার মেয়ে। তার জন্যে ছোট্ট বেনারসী শাড়ি কিনে দেবো। আর যদি ছেলে হয় তো সে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকে সরোদ শেখাবো আমজাদ আলি খান সাহেবের কাছে। সেদিন তার সরোদ বাজনার ছোট্ট অনুষ্ঠান হবে। মেয়েকে ক্লাসিক্যাল গান শেখাবো এ. টি. কাননসাহেবের কাছে। মেয়ের গানও শোনাবো সকলকে সেদিন।

পর্ণা হাই তুললো। নিদ্রাহীনতায়, আশাভঙ্গতায় এবং অপরাধবোধেও। এবং হয়তো কলির সুখকল্পনার একঘেয়ে বর্ণনাতেও।

পর্ণা বললো, বাথরুমে যাই। চা আনতে বলবি না কি?

আমি বেল দিয়ে দিচ্ছি তুই বেরোলেই। চা আসতে আসতেই আমি চট করে মুখ হাত ধুয়ে নেবো'।

পর্ণা বাথরুমে গেলো।

দোতলাতে স্নিগ্ধর দাদুর ঘর থেকে হঠাৎই যেন গান ভেসে এলো।'রেডিও কি? না ক্যাসেট প্লেয়ার। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলা কি?

'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে,
অলস রে, ওরে, জাগো জাগো ॥
শোনো রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে—,
অলস রে, ওরে, জাগো জাগো ॥'

রুপুদির গলা! চিনতে পারলো কলি। রুপু বড়াল, রাইচাঁদ বড়ালের মেয়ে। কী অসাধারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় রুপুদি অথচ পত্র-পত্রিকাতে তার নাম দেখে না, টি-ভিতেও কমই দেখে। এখন সব তেলা-মাথায় তেল-দেওয়ার দিন। পঞ্চাশ বছর আগে যিনি বা যাঁরা ভালো গাইতেন তাঁরাই যশের শিখরে শতরঞ্চি বিছিয়ে ইয়ার-দোস্ত-চামচে নিয়ে জাঁকিয়ে বসে আছেন। সেখানে কেউ পৌঁছতে চেষ্টা করলেই মাথায় ডাণ্ডা মারছে চামচেরা। বড় নৈরাজ্যের

সময় চলেছে এখন বাংলা গান, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। বড় লজ্জার সময়ও। বড় গুণহীনতার নির্লজ্জ নগ্ন বাহুবলের প্রদর্শনী।

গানটি যেন এই বৈশাখের সকালের প্রতিটি রন্ধ্র ভরে দিয়ে গেলো। কলির প্রতিটি রোমকূপে, প্রাণের প্রাণে, সঞ্চারিত করে দিয়ে গেলো। যেমন কথা, তেমন সুর, তেমনই গাওয়া।

রবীন্দ্রনাথকেও ভালো করে পড়লো না পর্ণারা, কলির ছোট ভাই পিকলুরা। অথচ ওরা কী না জানে! কথা শুনলে মনে হয়, ওরা সবজান্তা!

গানটি শেষ হতে হতেই পর্ণা এলো বাথরুম থেকে।

কলি বললো, আশ্চর্য! কাল সকালে এই গানটিই আমার গাইতে খুব ইচ্ছা করছিলো। খুবই ইচ্ছা করছিলো। মাঝে মাঝে কোনো বিশেষ গানে পায় না মানুষকে!

তুই কি শুনলি গানটা? রুপুদিকে···

আমার এখন কোনো গান শোনারই মুড নেই। শুধুই কাল রাতের কথা ভাবছিলাম। সরী, কলি। স্নিগ্ধ আর প্রণয় কি মনে করলো? হুন্‌সো আর তার বন্ধু। ভদ্রলোকের সঙ্গে আর হুন্‌সোর সঙ্গে ভালো করে আলাপও করা হলো না। ছিঃ।

বেল দিয়েছিস? চায়ের জন্যে?

যাঃ। গানটা শুনতে শুনতে একদমই ভুলে গেছি। এক-একটি গান থেকে জানিস, যা একেবারে হাড়ে-মজ্জায় ঢুকে যায়: তখন বোধহয় ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ি, বাবা মায়ের সঙ্গে গেছিলাম শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে। এই গানটিই শুনেছিলাম সকালবেলাতে, দোলের আগের দিনে মোহরমাসীদের নিচুবাংলার বাড়িতে, মোহরমাসীর গলাতে। আর রাতে! আঃ কী জ্যোৎস্না, শালফুলের কী গন্ধ। বসন্তোৎসবের রাতে বাচ্চুমাসী গেয়েছিলেন: 'তুমি কিছু দিয়ে যাও।'

বাবার বন্ধু রাজীবকাকার ছেলে ছিলো মদন। সে ওখানেই পড়তো। কী যে হয়ে গেলো, জানিস? সেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, দাঁত-উঁচু, অতি সাধারণ কালো-কোলো ছেলেটির জন্যে বুক ধড়ফড় করতে লাগলো আমার। সে কী কষ্ট রে! খেতে পারি না, শুতে পারি না, ঘুমোতে পারি না; গলার মধ্যে যেন বঁড়শি আটকে গেছে। কী যন্ত্রণা! তাকেই যে প্রেম বলে সে কি ছাই তখন জানি!

পর্ণা খিলখিলু করে হেসে উঠলো কলির কথা শুনে।

বললো, তারপরে কি হলো?

কলির ভালো লাগলো পর্ণাকে দেখে। তাহলে গুমোট কাটছে!

কলি বললো, আরে হবে আবার কী! প্রতিটি প্রকৃত নিষ্পাপ প্রেমেই যা হয়ে থাকে! রোমিও-জুলিয়েট, লায়লা-মজনু, মণিপুরের খৈবী-খাম্বার বেলাতেও যা হয়েছিলো, তাই। বিচ্ছেদ।

তোর সেই মদন এখন কি করে?

কী জানি কি করে! বহুকাল দেখা নেই। রাজীবকাকু ফিশারিজ

ডিপার্টমেন্টের অফিসার ছিলেন। এখন আমার সেই প্রথম ও শেষ প্রেমের মদন কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে তা। শুনেছি, স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে।

তবে এটা ঠিক যে, প্রেমে জীবনে ঐ একবারই পড়েছিলাম। আর হবে না। প্রেমের জন্যে পরিবেশ চাই। প্রচুর বোকামি থাকা চাই। অনভিজ্ঞ হওয়া চাই। কলকাতাতে যেসব সম্পর্ক হয় ওগুলো কেনা-বেচার সম্পর্ক। কামের, কেরিয়ারের, সোস্যাল স্ট্যাটাসের; কন্ডিশানড-প্রেম সে সব; অধিকাংশই কন্‌ভিনিয়েন্সের প্রেম।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, সত্যি কথা বলবো একটা?

কি? ভুরুতে আইব্রো পেন্সিল ঘষতে ঘষতে শুধোলো পর্ণা।

কাল রাতে চির্‌চিরি না ঝিরঝিরি ঝিলের পাশে দাঁড়িয়ে অমন চাঁদের আলোয়, অমন গন্ধে, স্নিগ্ধর পাশে বসে থাকতে থাকতে অনেক বছর পরে বেশ একটা প্রেম-প্রেম ভাব জেগেছিলো মনে।

আমিই তোকে ডুবিয়ে দিলাম।

সীরিয়াস গলাতে বললো, পর্ণা।

কলি হেসে, পর্ণার কাছে গিয়ে ওর গায়ে ভেঙে পড়ে বললো; সত্যি বলছি। তুই যে আমার বন্ধু নোস, শত্রু; কালই প্রথম জানলাম।

বলেই, কলিং বেলের বোতাম টিপ্‌লো।

তারপর দরজার খিল খুলতে খুলতে বললো, খুব বাঁচিয়েছিসরে পর্ণা! কাল যদি সত্যিই প্রেম হয়ে যেতো?

বলে, আবারও হাসতে লাগলো জোরে জোরে। ফুলে ফুলে।

এমন সময় দরজার কাছে কার যেন গলা শোনা গেলো।

আসতে পারি?

কলি তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে গেলো। গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দরজার গায়ে কান পেতে দাঁড়ালো। স্নিগ্ধ কি?

আসুন। পর্ণা বললো।

আমি প্রণয়। চলে যাচ্ছি, তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

কোথায় চলে যাচ্ছেন?

আমি রেজিগ্‌নেশান দিয়েছি! না, না, আমাকে কেউ বাধ্য করেনি। স্বেচ্ছাতেই আমি রেজিগ্‌নেশান দিয়েছি উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট। আমার অপরাধের কোনো সীমা নেই। আমাকে আপনারা মার্জনা করবেন।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন এখন? আর যাচ্ছেনই বা কেন? আপনার কি দোষ?

প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় পর্ণা বললো।

এখন একটু বাড়ি যাবো। মায়ের সঙ্গে থাকবো দুপুরটা। তারপর বিকেলের গাড়ি ধরে কলকাতা। কোনো কাজকর্মের চেষ্টা তো করতে হবে।

গাড়ি ধরে কলকাতায় গেলেই কি কাজকর্ম হয়ে যাবে ঠিক?

চেষ্টা তো করতে হবে।

পর্ণা একটু চুপ করে থেকে বললো, আপনার তো কোনোই অপরাধ নেই। আপনি যেতে যাবেন কেন? দোষ তো আমারই! কিন্তু আপনাদের ইন্টারন্যাল ব্যাপারে আমার কিছুমাত্রই করার নেই। আমাদের দুজনেরই ঠিকানা তো আপনাদের রেজিস্টারে আছে। যদি কোনো প্রয়োজন হয়, যোগাযোগ করবেন আমাদের সঙ্গে, কলকাতায়, অফিসে।

উনি কোথায়?

উনি বাথরুমে। ওঁকে আমি বলে দেবো।

একটু আহত মনে হলো প্রণয়কে। পর্ণা কলির সঙ্গে ওকে দেখা করতে দিলো না বলে। তারপর বললো, আচ্ছা, নমস্কার। চলি তাহলে। কালিদা আপনাদের চা নিয়ে আসছে।

প্রণয় চলে যেতেই, কলি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললো, তুই অমন রুক্ষ ব্যবহার করলি কেন রে?

তুইও যেমন! সত্যি ভেবেছিস নাকি তুই! তুই একটা শিশু! এও ওর আরেকটা ভাঁড়ামো। প্রণয়কে ছাড়াতেই পারে না তোর স্নিগ্ধ। এর চেয়ে, মন্দার হোটেলই বন্ধ করে দেবে, তাও ভালো।

ড্রেসিং-টেবলের সামনে বসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বিড়বিড় করে কলি বললো, 'আমার স্নিগ্ধ' বলছিস কেন? তুই নিতে চাস তো নিয়ে নে। তবে··· তাছাড়া স্নিগ্ধ রায়চৌধুরীকে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে ছাড়াবে যে নাই-ই এমন কথাও জোর করে বলতে পারি না।

বাবাঃ। এতোখানি জানা হয়ে গেছে?

একটু ঠাট্টা, একটু শ্লেষ; একটু ঈর্ষা মিশিয়ে বললো পর্ণা।

কলি জবাবে কিছু বললো না।

চা কি আনছে?

বললো তো!

একটু পরেই কালিদা মস্ত ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। হিং-এর কচুরি, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, গরম জিলিপি, সঙ্গে আম-এর আচার।

একী ব্যাপার। আজ কি আমাদের ব্রেকফাস্ট দেবে না?

দেবো না কেন মায়েরা। নিশ্চয়ই দেবো। কাল সারারাতে খালিপেটে ছিলেন তাই ম্যানেজারবাবু পাঠিয়ে দিলেন! এখন বলুন, চা আনবো না কফি? ম্যানেজারবাবু আপনাকে বললেন, কালো কফি খেতে।

আমাকে?

অবাক হয়ে কলি বললো।

না। না! আপনাকে নয় মা, ওনাকে।

আমাকে?

ভ্রু-কুঞ্চন করে বলে উঠলো পর্ণা। ওর মুখে রাগও ফুটলো। বললে, আমি তো খুকি নই! কী খাবো না খাবো আমিই বুঝবো। তুমি চা-ই নিয়ে এসো কালিদা। কলি কি কফি খাবি নাকি?

কলি দুদিকে মাথা নাড়িয়ে বললো, উঁহু!

তবে চা-ই আনো দুজনের জন্যে।

কালিদা চলে গেলো।

কলি বললো, ব্ল্যাক-কফি খেলে, হ্যাং-ওভার থাকলে ; কেটে যেতো অবশ্য। কালিদার সামনে রাগ না দেখালেই পারতিস!

কেন? তোর স্নিগ্ধ শুনলে দুঃখ পাবে? পেলে, পাবে! সো হোয়াট? আই কেয়ার আ ফিগ্।

কলি উত্তর না দিয়ে চোখ নামিয়ে বললো, নে। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ভালো ভালো খাবার।

যত্ত সব আজে বাজে বাজে ফ্যাটেনিং-খাওয়া। ক্যালরিতে গাদা। কী কুকিং-মীডিয়াম ইউস করে এরা কে জানে! মুখে মুখে যত্ত ভালোবাসা লিপ্-সার্ভিস।

কলি চুপ করে খাচ্ছিলো। ভাবছিলো, স্নিগ্ধর প্রতি ওর যদি কোনো দুর্বলতা গড়ে উঠে থাকে এই ক'দিনে তবে তা অপ্রতিরোধ্যই করে তুলবে মনে হচ্ছে পর্ণা। তার বর্তমান মানসিক অবস্থাতে পর্ণা বোধ হয় সুন্দর কোনো কিছুকেই সহ্য করছে না বলে মনে হচ্ছে। নিজের ঘর নিজে হাতে ভেঙেছে বলেই অন্যর নীড় গড়বার সম্ভাবনামাত্র দেখলেও তা তছনছ করে দিতে চাইছে।

কলির মনে হলো, কারো প্রতি ভালোবাসাটা নিজস্ব গতিতে যতখানি এগোয় ; বাধায়, আপত্তিতে অন্যায় সমালোচনায় তা বোধহয় অনেকই বেশি গতি পায়? জেদ ধরে যায় তখন মানুষের। অথচ এ কথাটাই তথাকথিত কাছের মানুষেরা, যাঁদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সকলেই পড়েন ;, একটু বোঝেন না। আর না বুঝে, যা তাঁরা ঘটতে দিতে আদৌ চান না, ঠিক সেই ঘটনাটি যাতে অবশ্যই ঘটে তারই উপাদানে উপচারে পরিবেশ ভরেন। তবে কলির নিজের উপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। যা-কিছুই ও করে না করে, তা নিজের স্থির বুদ্ধির নির্দেশই করে। কারো মদত বা বিরূপতাই তার পথ থেকে তাকে সরাতে পারে।

পর্ণার জন্যে কষ্ট হচ্ছিলো কলির। মেয়েটা বড়ই ছোট মনের হয়ে গেছে। ডিভোর্সটাকে ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অথচ নিজেই তড়িঘড়ি ঘটালো ব্যাপারটা। সুবর্ণর অপমান ওর চেয়েও অনেক বেশি হয়েছে! পারভার্সান এর অভিযোগ এসেছিলো পর্ণাই ওর বিরুদ্ধে। সুবর্ণর অভিমান এতোই আহত হয়েছিলো হয়তো তাতে যে, মামলা কনটেস্ট পর্যন্ত করেনি। যা চেয়েছে পর্ণা সব দিয়ে দিয়েছে। মনে হয় না সুবর্ণ আর কোনোদিনও পর্ণার কাছে ফিরে আসবে। শারীরিক ব্যাপারের অনুযোগে যেখানে ডিভোর্স হয় সেখানে যার বিরুদ্ধে সেই অনুযোগ, সে অনুযোগ সত্যি হোক, কী মিথ্যেই হোক ; সে কখনই ফিরে আসে না। আসলে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তানদের নানারকম হ্যাং-আপস্ থেকেই। এতো বেশি আদরে-গোবরে মেয়েটার মাথাটাই গেছে। কে. জি. ওয়ান থেকেই পর্ণা আর কলি একসঙ্গে পড়ছে। একটি মানুষের চরিত্রের বিকাশ, বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি, উত্থান-পতন এতোই কাছ থেকে

দেখেছে কলি যে, পর্ণাকে আর কেউই বোধ হয় এতো ভালো বোঝে না। মেয়েটা খুবই ভালো। বেসিক্যালি ভালো। তাই তার চরিত্রের সাম্প্রতিক মালিন্যর কারণে ওর ওপর রাগ করা আর যারই মানাক, কলির মানায় না।

এমন সময়ে চা এলো।

চা খেতে খেতে কলি বললো, বল্ আজকে কি প্রোগ্রাম! ঝুম্‌কার হাটে কখন যেতে হয় তাওতো ছাই জিগ্যেস করা হলো না! কালিদাকে ডেকে জিগ্যেস করি? তবে, সব জায়গার হাটই লাগতে লাগতে বেলা বারোটা হয়ই। লাঞ্চ করে গেলেই ভালো। বেশিক্ষণ থাকা যাবে। চুড়ি ছাড়াও হাটে তো আরও অনেক কিছু দ্রষ্টব্য থাকে। কেনার থাকে। টুকটাক সব কিনে রেখে দিলে এর তার জন্মদিনে, বিয়ের তারিখে দেওয়া যায়। আর এমন সব প্রেজেন্টস্ তো শহরের 'গিগলস্' বা অন্য কোনো 'গিফ্‌ট শপ'-এ পাওয়াও যাবে না। আমার তো হাটে কিছু কেনাকাটার না থাকলেও ঘুরে বেড়াতেই দারুণ লাগে।

পর্ণা বললো, আজ আমার শরীরটা ভালো নেইরে কলি। আমি আজকে রেস্ট করবো।

আশাভঙ্গ হয়ে কলি বললো, সে কীরে? যাবি না?

তুই যা না। আমার সঙ্গে তোর কি? সব জায়গাতেই যে দল পাকিয়ে যেতে হবে তার মানে কি?

না, তা না। প্রত্যেক মানুষই তো একাই! একাকীত্ব একটু ঘোচাবার জন্যেই তো কাছের লোক, বন্ধু···। আমরা এলাম দুজনে এখানে দোকা থাকার জন্যেই তো, না কি?

মাঝে মাঝে কাউকেই ভালো লাগে না। একদমই একা থাকতে ইচ্ছে করে।

পর্ণা বললো, মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে।

কথাটার মধ্যে কলির প্রতি আঘাত যে ছিলো, সেটা কলির কান এড়ায়নি।

সেটা ঠিক। আমারও করে। তবে তাই কর তুই। আমি আগে চানটা সেরে নিয়ে আর্লি-লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়বো একটি রিকশা নিয়ে। কালিদাকে বলবো, ঠিক করে দিতে। চেনা রিকশা এবং বিশ্বস্ত।

কেন? তোর তো সোফার-ড্রিভন লিমুজিনই আছে।

পর্ণা বললো। কিঞ্চিৎ শ্লেষের সঙ্গে।

কলি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলো পর্ণার চোখে। মুখে কিছু বললো না।

তারপরে বললো, চানে যাই। চা খাওয়া হলে বেলটা দিয়ে দিস। ট্রে আর বাসনগুলো নিয়ে যাবে।

ঠিক আছে।

পর্ণা বললো।

তাও মুখ অন্যদিকে ফিরিয়েই।

কলি চুপ করে রইলো।

তারপর ঠিক করলো যে আজকে যাবেই না ঝুমকার হাটে। গেলে, যাবে পরে একদিন। একাই যাবে। না গেলেও হয়। যেতেই হবে, তার কি মানে আছে?

প্রতিরাতেই বিধুভূষণের সেবা করে স্নিগ্ধ শোবার আগে। আর প্রণয় যায় সকালে। তাঁর প্রাতঃকালীন চা খাওয়া হয়ে গেলে।

প্রণয় তাঁর বাবার দেখাদেখি বিধুভূষণকে ছেলেবেলা থেকেই ডাকে 'বড়বাবু' বলে। বিধুভূষণই ধমকে বলেছেন : আমি তোর বাবার বড়বাবু ছিলাম। তা বলে তুই বাবু বলার কেরে ? তুই আমাকে দাদু বলবি। সেই থেকেই বড়দাদু।

বিধুভূষণ মানুষটি অসাধারণ। অন্য দশটি কেন, নিরানব্বুইটি মানুষের সঙ্গেই তাঁর কোনো মিল নেই। তাঁর অসাধারণত্বের প্রমাণ তাঁর জীবন। তাঁর কৃতি সন্তান। সর্বার্থে কৃতি এবং মানুষ হওয়া একমাত্র বংশধর স্নিগ্ধ !

আজকালকার দিনে 'মানুষ হওয়া' বলতে বোঝায় বড় চাকরি করা, পেশায় সফল হওয়া, বড় ব্যবসাদার হওয়া। লক্ষ্মীর সার্থক উপাসক হওয়া। কিন্তু বিধুভূষণের অভিধানে 'মানুষ' শব্দটির ব্যাখ্যা বড় গোলমেলে। তাই তাঁর অভিধানে স্নিগ্ধ মানুষ, প্রণয় মানুষ, প্রণয়ের বাবা—বিপ্রদাসের হেড ড্রাইভার বাঁটু রুদ্রও মানুষ। বিপ্রদাসতো মানুষ বটেই। বিধুভূষণের সংজ্ঞাতে ফেললে আজকের নিরানব্বুই ভাগ মানুষই অমানুষের পর্যায়ে চলে যায়।

বিধুভূষণের এই সাতাশী বছর বয়সেও রসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, সকলকেই হারিয়েছেন তিনি, কিন্তু যে-শোক সাধারণ মানুষকে জড়পদার্থ করে চলে যেতো সেই শোকও তাঁর ব্যক্তিত্বকে একটুও বদলাতে পারেনি।

ঠাকুর দেবতা একেবারেই মানেন না। ঐ প্রজন্মের মানুষ হয়েও ঠাকুর দেবতা মানেন না এমন কম মানুষকেই দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বর মানেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে, কোনো মহৎ অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তা মানেন। যে শক্তি পাখির গলায় সুর দিয়েছেন, ফুলে, পাপড়িতে রঙ ; শিশুর কণ্ঠে চিকণতা, নারীর হৃদয়ে প্রেম, তাঁকে মানেন।

তাঁর সাধারণজ্ঞানও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। নবাগতর চোখের দিকে এমন করে তাকান যে সেই তীক্ষ্ণ, তীব্র প্রগাঢ় বুদ্ধিময় দৃষ্টিতে সেই আগন্তুক বিদ্ধ হয়ে যান। এই বয়সেও। আর তাঁর ব্যক্তিত্ব! প্রচণ্ড ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান এবং মানুষ চেনার ক্ষমতা।

এখনও নিয়মিত আটঘণ্টা পড়েন। তার মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পুজো সংখ্যাও যেমন আছে, তেমনি দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিল্পকলা, সংগীত ইত্যাদি সব বিষয়েরই বই আছে।

বিধুভূষণের 'রায়চৌধুরী লজ'-এর লাইব্রেরীটি দেখতে তখনকার দিনের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, ছোট নাগপুরের কমিশনার, টাটা কোম্পানীর বিদগ্ধ আমলারা—সকলেই আসতেন। সেই লাইব্রেরী, বিপ্রদাস, স্নিগ্ধ ও প্রণয়ের আন্তরিক চেষ্টাতে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

নিজে একসময় খুব ভালো ধ্রুপদ, ধামার গাইতেন। কুস্তী লড়তেন। বাঁশী বাজাতেন। প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ও গাইয়েদের আগমনে মাসে এক-দুদিন গান-বাজনা লেগেই থাকতো। খুব নামী একটি ব্রিটিশ এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর চিফ এঞ্জিনীয়ার ছিলেন উনি। অথচ সাহেবিয়ানা তাঁর বাঙালীয়ানাকে একটুও গ্রাস করতে পারে নি। যখন ইংরিজি বলেন তখন জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলেন অক্সোনিয়ান উচ্চারণে। কিন্তু যাঁদের মাতৃভাষা ইংরিজি নয় তাঁদের সঙ্গে সহজে বলতে চান না। হিন্দী, উর্দু, এবং ওড়িয়া চমৎকার বলেন। দক্ষিণ ভারতীয়, গুজরাটি, মারাঠী ইত্যাদিদের সঙ্গে এই ইংরিজি ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না। ইংরেজ ও ইংরেজ-ভাবাপন্ন বন্ধু বান্ধব ছিলো। কিন্তু বিধুভূষণ ঘোর বাঙালী।

তবে বন্ধুবান্ধব আজকাল কেই বা আসেন তাঁর কাছে? ক্ষমতা যতই শুকোতে থাকে ততই ভীড়ও কমতে থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক মানুষজন চলেও যেতে থাকেন পরপারে। স্বার্থপূরণের ক্ষমতা না থাকলে, থেকেও স্বার্থপূরণ না করলে; কেউই আর আসে না। এখন তারা কোনো যোগাযোগও রাখে না। তবু বিধুভূষণ সকলের সঙ্গেই ঠাট্টা তামাশা করেন। বয়স বা মিথ্যে মর্যাদার ভারের বোধ কোনোদিনও ছিলো না তাঁর।

বিধুভূষণ ডাকলেন, গণশা!

সাড়া নেই।

গণশা।

এঁজ্ঞে।

থাকিস কোথায় রে হারামজাদা?

বিধুভূষণকে যাঁরাই জানেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে 'হারামজাদা' সম্বোধনটা গালাগালি নয়। আদর। তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই সম্বোধন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বরং 'হারামজাদা' সম্বোধন না করলেই বিপদের আশংকা করে থাকে তাঁর কাছের মানুষজন।

এই তো আপনার চায়ের বাসন রেখে এলাম।

গণেশ এসে কৈফিয়ত দিলো।

অ। তাই। মনে ছিলো না। তা তোমাদের প্রণয়বাবুর কি খবর? তিনি কি প্রণয়ে লিপ্ত হলেন? পাঁটি বলছিলো, অল্পবয়সী দুটি মেয়ে এয়েছে হোটেলে। মেয়েদুটি কেমন দেখেচিস কি?

বিধুভূষণ যে তাঁদের ডেকে ইতিমধ্যেই আলাপ পরিচয় করেছেন তা গণশা

বিলক্ষণই জানে।

গণশার বয়সও বাষট্টি হয়েছে। হাই ব্লাড-প্রেসারের রুগী। মাঝে মাঝে তার রসজ্ঞানেও খাম্‌তি ঘটে।

সে বললো, মেয়েছেলেই দেকে বেড়াবো তো আপনার সেবাটি করব কখন? ইদিকে তো পান থেকে চুনটি খসলে গুষ্টি উদ্ধার করবেন।

খবর্দার! মুকে মুকে কতা। তুমি বারান্দা থেকে দেকোনি পরশুদিন মেয়ে দুটিকে। দোলনাতে বসে চা খাচ্ছিলো?

গণশা হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, আজ্ঞে বড়বাবু দেকেচি।

কেমন দেকেচো। কী দেকেচো?

আজ্ঞে মেয়েদেরই মতো।

হারামজাদা!

এঁজ্ঞে।

সাধে তোর বউ তোকে উদো বলে ডাকে, ছ্যা, ছ্যা।

এমন সময় প্রণয় এসে ঢুকলো, ঘরে। হঠাৎ।

কী ব্যাপার? অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। সময় পেয়েচো তালে। হাতে তো একটি হাতঘড়িও রয়েচে দেকচি। সেটি কি মেয়েদের গয়নারই মতো ধারণ করা হয়?

'আজ্ঞে বড়দাদু?

বেশি আমড়াগাছি করতে হবে না। অসুবিধে থাকলে তো না এলেও চলে যায়। আমি তো তোমাকে মাথার দিব্যি দেইনি দাদু, যে তোমাকে পেতি পেত্যূষে আসতেই হবে।

কথা না বাড়িয়ে প্রণয় বললো, দিন দেখি পা'টা।

এই নাও। যত্ন করে টেপো। রাগ করে আঙুল ভেঙে দিও না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

দেয়াল ঘড়িতে টিক্‌টিক শব্দ হচ্ছে। প্রণয় মনোযোগ সহকারে পা টিপে যাচ্ছে।

তোমাদের সখের হোটেলের কি খবর?

এই। চলছে।

চলচেতো বটেই! বেশ ভালোইতো চলচে। হোটেলিয়ারিং ছাড়া সবই চলচে।

আঁজ্ঞে?

ক'জন অতিথি এখন তোমাদের?

এই জনা ছ'সাত।

আমি মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তো তোমাদের কোনো কাজই হবে না। তা যে পরিমাণ টাইম আমি মরতে নিচ্ছি তাতে চাই কি তোমরাও আমার আগে পটল তুলতে পারো। এতগুলো প্রজেক্ট করবে, আমি তা দেখে শুনে মরতে পারি কি? কিন্তু ঐ গাধাটাকে তো বোঝাতে পারি না…

শুধু আপনি নন। অন্য অনেক ফ্যাক্টরও আছে। অতবড় একটা

ব্যাপারের 'জেস্টেশান পীরিয়ড' বলেও তো একটা ব্যাপার থাকে। কত কোটি টাকার ব্যাপার। এখন ক্রেডিট-স্কুইজ চলছে।

হ্যাঁ। ইকনমিকস-এ এম.এ. করেচো বলে আর বুক্নি ঝেড়ো না আমার কাচে। দুটিতে এখন বিয়ে টিয়ে করলেও না হয় বুঝতাম। এই সিগারেট ফোঁকা কেঠো-কেঠো হাতে কার আর পদসেবা নিতে ভালো লাগে। যত্ত সব নচ্ছার বাঁদরের রাজত্বে বাস করছি। কী যে কপালে আছে, ঈশ্বরই জানেন!

হ্যাঁ আপনি তো জানেন না বড়দাদু। এখনকার সব মেয়ে, সবাই কি আর কাকীমা আর ঠাকুমার মতন? আমরা বিয়ে করব, তো আমাদের বউ হবে? আপনার কোন ঘণ্টা হবে? তারা আপনার পা টিপলে তো!

হাঃ। পা টিপবে না? আগে শপথ করিয়ে নেবো না। তোমরা কি আমাকে লুকিয়ে লাভ-ম্যারেজ করে বউ নিয়ে আসবে না কি? লাভ-ম্যারেজে আপত্তি নেই। তবে না দেখিয়ে, প্রায়র-অ্যাপ্রুভাল না নিয়ে বে'করলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো দুটোকেই।

তা হলেও তো হতো। এদিকে তো সবই লিখে দিয়ে বসে আছেন নাতিকে, কবে নাতি আপনাকে তাড়ায় দেখুন। যা দিনকাল পড়েছে।

তা যদি করতে পারতো তবে তো বুঝতাম যে করলো কিছু। আমার নাতিকে আমি জানি। তবে তোর মতো শাখামৃগর বদ-বুদ্ধিতে কী করে না করে তার কি ঠিক আছে কিছু! তোদের উপর ভরসা কিসের?

সত্যিই ভরসা নেই।

প্রণয় বললো, এখন পস্তালে কি হবে? উইল করে গেলেই হতো। জীবদ্দশায় কেউ অন্যকে সব দিয়ে যায়? নাতি না করুক আমিতো করবোই। আমাকে যা দিয়েছেন তাতো ফেরত হবে না। আমি তো বাইরের ছেলে, ড্রাইভারের ছেলে; আমার চরিত্র অত উঁচু হবার দরকার কি?

খবর্দার হারামজাদা। মুখ সামলে কথা বলবি পেনয়। তোর নিজের বাপ তুলবি না। বাটু রুদ্রর মতো প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ আমি বেশি দেকিনি। ড্রাইভারী সে করতো হয়তো। তুই তোর বাপের কুলাঙ্গার পুত্র।

প্রণয় ইচ্ছে করেই রোজ সকালেই এই সব করে। গা-গরম করে বড়দাদুর। নইলে সময়ই বা তাঁর কাটে কি করে? বিধুভূষণও সবচেয়ে আনন্দে থাকেন প্রণয় যতক্ষণ থাকে তাঁর কাছে। বড় ভালো ছেলেটা। এ যুগে প্রণয়ের মতো ছেলে, তার নাতি স্নিগ্ধর মতো ছেলে, সত্যি খুবই কম আছে যে তা তিনি জানেন।

এবারে বিধুভূষণ বললেন, তোর হাতদুটো আজ এতো চন্‌মন্‌ করছে কেন র‍্যা?

চন্‌মন্‌?

অবাক হয়ে বললো প্রণয়। হাত দুটো তুলে নিজের নাকের কাছে ঘুরিয়েও দেখলো একবার।

হ্যাঁরে চন্‌মন্‌। মনে হচ্ছে, মনটা যেন বেশ উচাটন হয়েছে।

উচাটন?

আজ্ঞে হাঁ। উচাটন। মারণ-উচাটন এইসবই জানোনা তো আর জানবে কি? দু'পাতা ইংরিজি পড়ে তো ধরাকে সরা জ্ঞান করচো। আর আমি বিংশ শতাব্দীর তিরিশ শতকে লীডস্ থেকে এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এয়েচিলুম, প্লাসগোতেও ছিলাম। বুয়েচিস। তবু বাংলা সংস্কৃত যা জানি, তোদের শেখাতে পারি।

বড়দাদু। আপনাদের ব্যাপারই আলাদা। তখনও তো পৃথিবী গোল ছিলো না।

হারামজাদা! গোল ছেলো না ছেলো সে কথাতে পরে আসছি। এখন বল্ মেয়ে দুটি কে?

কোন মেয়ে দুটি?

যেন আকাশ থেকে পড়ে বললো, প্রণয়।

যাদের পেছন পেছন পরশু কাঠ-ফাটা দুপুরে, সাইকেল নিয়ে উধাও হলে চিকনডিহ্‌র দিকে। আমি দেকিনি ভেবেচো? আমার এই বারান্দার চেয়ারে বসে থাকি বটে কিন্তু আমার র‍্যাডার এবং সোলার সীস্টেমকে ফাঁকি দেবে তোমরা এমন ভেবোনি।

আমি, মানে মায়ের অসুখ হয়েছিলো। তাই গেছিলাম চিকনডিহ্।

কি অসুখ?

রাতে জ্বর এসেছিলো দাদু।

অ। ঠিক আছে। মানলুম না হয় তুমি ইনোসেন্ট। তাহলে তোমার ফ্রেন্ড সাতসকালে তাদেব দোলনা চড়াচ্ছিলো কেন? সেটাও কি ম্যানেজারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে? ওসব কতা আমি শুনতে চাই না। আমি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। ওদের প্রড্যুস করো আমার সামনে। ইন দ্যা শর্টেস্ট পসিবল্ টাইম।

বলেই বললেন, ও ভালো কতা। মুঙ্গলি কেমন আছে? জ্বর?

ভালো হয়ে গেছে।

হারামজাদা! ময়ের নামেও মিথ্যে কতা বলতে আটকায় না। মায়ের জ্বরের বাহানাতে মেয়েচেলের পোঁ ধরেছো। প্রড্যুস করো বলছি। ইমিডিয়েটলি প্রড্যুস করো।

পা টেপা থামিয়ে, প্রণয় প্রতিবাদ করে বললো, কী অন্যায় কথা। ওরা চাকরি করা মেয়ে দাদু। ডাকলেই তারা আসবে কেন? তারা কি আমার পোষা কাকাতুয়া? তাছাড়া, আপনি তো আমাদের অপেক্ষাও রাখেননি।

ওদের আসতেই হবে।

ওসব আমি জানিনা। আমি ম্যানেজারকে ডেকে দিচ্ছি। আপনি তাকে যা বলার বলুন। তার সঙ্গে বুঝে নিন-গে।

বিধুভূষণ বললেন, ইডিয়ট্। এগুলো ম্যানেজারের কাজ নয়। অ্যাসিস-ট্যান্ট ম্যানেজারের কাজ। তোমাকে বলছি; বলতে বলতেই, হাতের কাছে রাখা খাটে হেলান-দেওয়া রুপো-বাঁধানো লাঠিটির নিচের দিকটা ধরে তুলেই প্রণয়ের গলাতে হাতের অর্ধগোলাকৃতি দিকটা চকিতে বাড়িয়ে পরিয়ে দিলেন।

বললেন, দেকেচিস তো! আগে তোর ঘাড় আসবে। তারপরে তাদের ঘাড়। ভালো চাসতো বেলা বারোটার মধ্যে নিয়ে আয়।

আরে! কী কচ্ছেন বড়দাদু, কী কচ্ছেন! লাগছে যে! জোর করে পরের মেয়েদের ধরে আনা যায়? পুরোনো প্রাসাদের মতো বাড়িতে একমাত্র মেয়ে পুঁটি ছাড়া কোনো অন্য মেয়েছেলেই নেই। এ কী অন্যায় কথা। পুলিশ কেস হয়ে যাবে যে।

চুপ কর বাঁদর। ওদের বলবি যে, ওরা যখন বাগানে ঘোরে তখন আমি ওদের দেখি। আমার তো নাতনি নেই। ওদের দেখে ভারী ভালো লেগেছে। তাই আমি ওদের কাছে ডেকেচি। দুপুরে না পারিস তো কাল সকালে নে আয়।

সকালে ওরা আসতে পারবে না।

অধৈর্য গলায় বললো প্রণয়।

কেন? তুই জানলি কি করে? তুই কি ওদের প্রাইভেট সেক্রেটারী? এই না বললি, কিছুই জানিস না। নচ্ছার!

ওরা চান্ডিলের দিকে বেড়াতে যাবে। সকালে।

কার সঙ্গে? কেন?

সম্ভবত ম্যানেজারের সঙ্গে। ঝুমকার হাট দেখতে যাওয়ার কথা আছে।

ম্যানেজার একা দুটিকে সামলাতে পারে?

তা দাদুরই তো নাতি। পারবে হয়তো; না পারলে তো আমাকে কি কালিদাকে বলতোই সাহায্যের জন্যে।

তবে কি? রাতে? রাতে আনতে পারবে?

রাতে তো আপনি হুইস্কি খাবেন।

তাতে কি?

আপনি নিজেকে যত বুড়ো বলেন ততো বুড়ো তো হননি আসলে। ওরা যুবতী মেয়ে। একা বাড়িতে যদি ভয় পায় মদ-খাওয়া মানুষের কাছে আসতে? আপনি তো আবার সব বাতি নিবিয়ে দিয়ে বারান্দাতে বসে খান।

হ্যাঁ। আমি যা চিরদিন করে এসেছি তাই করবো। রাখ তোর কথা। ন্যাকামি করার জায়গা পাওনি, না? আমি তো নাইনটিন থার্টি থেকে খাচ্ছি। স্কচের বোতল ছিলো দুটাকা। তখন ওয়ান পার্সেন্ট বাঙালী মদ খেতো। আর আজকালকার এরা তো ডিরেকটর-স্পেশাল, ব্ল্যাক-নাইট এই সব। আমি এখনও স্কচ চালিয়ে যাচ্ছি। বেঁচে থাক আমার কনসাল বন্ধুরা। বেশি খ্যাচ-খ্যাচ করিসনি। আমি আদর করে ডাকবো আর কোনো মেয়েছেলে 'না' করবে তা জীবনে হয় নি। আজও হবে না।

মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ বড়দাদু। ওকি ভাষা? মেয়েছেলে!

সে যাকগে। আমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। ওদের সামনে কি আর বলবো?

বলেই বললেন, শুনছো? তাহলে এই কথাই রইলো। ম্যানেজারকে বলতে হবে না কিছু। ওই শালাই হচ্ছে আমার আর্চ-রাইভাল। তোমার অ্যাসিসট্যান্ট

ম্যানেজারীও আমি ঘোচাবো যদি তুমি রাত আটটার সময়ে ওদের নিয়ে না আসতে পারো। নিয়ে এসে, আবার কার্তিকের মতো দাঁড়িয়ে ঘাড়ের চুলে হাত বুলিও না। বারান্দার পাশেই গণশা থাকবে। যা দরকার সেই দেখবে। সাড়ে ন'টার সময়ে আবার উপরে এসে মালক্ষ্মীদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। বুয়েচো?

বুঝেছি। গলাটা ছাড়ুন। ভীষণ লাগছে।

লাগবার জন্যেই তো ধরেছিলুম। নাও, তোমাকে এই মুক্ত করে দিলুম।
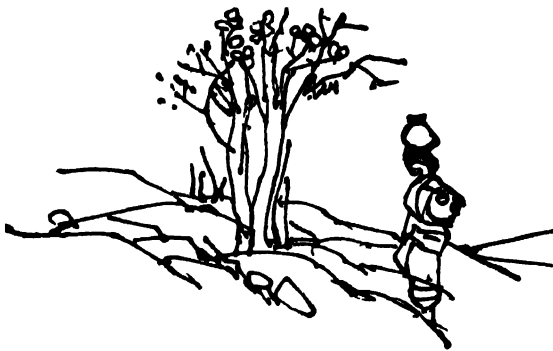
চোত-বোশেখের সন্ধে আর রাতের এক বিশেষ মোহময়তা আছে। বসন্ত এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভ নরনারীকে যেমন এক অস্বস্তিকর অথচ পরম সুখকর মানসিক অবস্থাতে উপনীত করে, তেমন বোধহয় বছরের আর কোনো সময়েই করেনা।

আজ মেয়ে দুটি আসবে। আলাপ যদিও করেছেন তবু নাম এখনও জানেন না বিধুভূষণ। তবে বাগানে প্রথমবার দেখেই ভারী পছন্দ হয়েছে বিধুভূষণের। যেটি লম্বা, ফর্সা, তার সঙ্গে স্নিগ্ধদাদুর খুব মানাবে।

বিয়ে তো শুধু একটা মানসিক সাযুজ্যর ব্যাপার নয়। শারীরিক সাম্যও একটা বড় ব্যাপার সেখানে। সারাজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই সে কথা জেনেছেন বিধুভূষণ। অথচ আজ যারা যুবক বা যুবতী তারা ওঁদের কথা হেসেই উড়িয়ে দেবে হয়তো। ওরা একবারটিও ভাবেনা যে বিধুভূষণেরাও এক সময় ওদের বয়স পেরিয়ে এসেছেন। ওদের মনের মধ্যে, শরীরের মধ্যে যা কিছুই হয়, আনন্দ ও কষ্ট, সে সবেরই মধ্যে দিয়েই তাঁদেরও আসতে হয়েছে। ওদের দেখলে, কথা শুনলে মনে হয়, ওরা যা জানে, আর কেউই তা জানে না, ওদের মতো বুদ্ধি আর কারোই নেই। এবং ছিলো না। ঐ বয়সে বিধুভূষণেরাও তাই ভাবতেন। হুবহু তাই। কিন্তু সে কথা বোঝাবেন কী করে! কম্যুনিকেশন-গ্যাপ হয়ে গেছে। হয়ে যায়। তাই যে নিয়ম! বুড়োরা তাঁদের সব জ্ঞান, সারাজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধি, যুগ-যুগ ধরে অধীত-বিদ্যার ঝাঁপি নিয়ে অপেক্ষাতে থাকেন, কে বা কারা এসে তাঁদের কাছে কিছু চাইবে। আর যুবক-যুবতীরা কলহাস্যে, যৌবনের ধর্মের মদমত্ততায় তাঁদের এড়িয়ে এড়িয়ে দূরে চলে যায়। কিছুই দেওয়া হয় না; নেওয়াও না। তবু এই বৃদ্ধ বয়সে ওরা কাছে থাকলে, ঘিরে থাকলে; ভালো লাগে। বিশল্যকরণীর মতো ওরা যৌবনের ছোঁয়া দিয়ে যায় জরাগ্রস্ত, মরচে-পড়া, স্থবির সত্তাকে। কিন্তু কে বোঝে! ক'জন বোঝে! যৌবনের ধর্মই হচ্ছে বয়োজ্যেষ্ঠকে অবজ্ঞা করা। তাঁদের খারিজ করে দেওয়া। এই অবজ্ঞার ভেতর দিয়ে তারা যে কী হারায়, তা তারা নিজেরাই জানে না। বিধুভূষণও নিজের যৌবনে জানেন নি।

গণশাকে বলে রেখেছেন আমপোড়া আর তেঁতুলের শরবত করে রাখতে। মধ্যে কাগজি বা গন্ধরাজ লেবুর পাতা। কাঁচা লঙ্কাও দিতে হবে। একটু নুন, একটু চিনি। আর আম-সন্দেশ। এ-বাড়ির বিশেষ প্রিপারেশান। নরম-পাকের আমের মতো দেখতে সন্দেশ। মধ্যে আবার পেস্তা বাদাম কিশমিশ দেওয়া।

গণশা ওঁকে ধাক্কাপাড়ের ধুতি পরিয়ে দিয়েছে আজ। মস্ত চওড়া তার আঁচল ও পাড়। কালো কাজ করা। সঙ্গে তালতলার চটি। কালো। ছাই-রঙা একটি র-সিল্কের পাঞ্জাবি। বৌমার, বেঁচে থাকতে; শ্বশুরমশাইকে শেষ উপহার।

ইজিচেয়ারটাকে চওড়া সাদা মার্বল-এর বারান্দাতে বাগান আর পাহাড়ের দিকে মুখ করে পেতে দেওয়া হয়েছে। রোজই অবশ্য পাতা থাকে। আজ একটু দিক পরিবর্তন হয়েছে শুধু। পায়ের কাছে একটি হাতির পায়ের মোড়া। তার উপরে গাড়োয়ালি কাজ করা কুশান। কোলের উপর হালকা একখানি মেটে-সিঁদুর-রঙা জ্যামেয়ার। প্যাহেলগাঁও থেকে নিয়ে এসেছিলো পুত্র বিপ্রদাস। বহুবছর হয়ে গেলো।

ডানদিকে বার্মা-সেগুনের ফ্রেমের উপর সাদা ইটালিয়ান মার্বল-এর মার্বল-টপ। তার উপরে তাঁর হুইস্কির বোতল। বরফ রাখার রুপোর কৌটো। ওপরে ওড়িশী ফিলিগ্রী কাজ করা। বেলজিয়ান কাট-গ্লাসের হুইস্কি-গ্লাস। বাঁ পাশে গড়গড়া। বেনারস থেকে আনানো অম্বুরী তামাকের গন্ধে সারা বারান্দা ভুরভুর করছে। তার সঙ্গে অম্বর-আতরের গন্ধ।

চৈত্রর শেষ অবধি বিধুভূষণ অম্বর-আতর ব্যবহার করেন। পয়লা বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ, রূহ-খস্‌স্‌। আষাঢ় থেকে ভাদ্র হিন্না। আশ্বিনে ফির্‌দৌস। কার্তিক থেকে চৈত্র অম্বর। গণশা সব জানে। লক্ষ্ণৌ থেকে সে যুগে আনানো বেলজিয়ান কাট্‌-গ্লাসের ডিকান্টারে করে রাখা আছে ল্যাজারার্স কোম্পানীর কাঁচের আলমারীতে সেই সব আতর। দেখে দেখে গণশা, পাঞ্জাবিতে, রুমালে, বিছানা-বালিশে সময়োপোযোগী আতর লাগায়।

হঠাৎ-ঘোরানো সিঁড়িতে চুড়ির রিনরিন শব্দ এবং তরুণী কণ্ঠস্বরের কাঁচ-ভাঙা শব্দে যেন তন্দ্রা ভেঙে গেলো বিধুভূষণের।

কে যেন বললো, এই দিকে?

পেছন থেকে প্রণয়ের সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' শোনা গেলো।

বিধুভূষণ মুখ ঘুরিয়ে বললেন, প্রম্পটারটি কে রে গণশা? বেঁধে আন্ তাকে।

বেঁধে আনতে হলো না। কলি আর পর্ণাকে নিয়ে বসবার ঘর পেরিয়ে বারান্দাতে ঢুকে প্রণয় বললো, বড়দাদু! এই যে, ওঁদের এনেছি।

ওঁদের মানেটা কি? ওঁদের কি নাম নেই কোনো?

আছে। এই যে, ইনি পর্ণা।

পর্ণা! বাঃ।

আর ইনি, কলি।

বাঃ।

এসো মা লক্ষ্মীরা। তোমরা কাছে এসে বোসো। আমি সন্ধ্যাকালে একটু হুইস্কি খাই। তাতে তোমাদের আপত্তি আছে কি? থাকলে, সরিয়ে নিয়ে যেতে বলবো। আমার গড়গড়ার তামাকের গন্ধেও যদি তোমাদের আপত্তি থাকে তো নির্দ্বিধায় বলো। কোনোই সংকোচ কোরো না।

পর্ণা বললো, ও মা! আপনার বাড়িতে আপনি যা খুশি করতে পারেন। আমরা আপত্তি করার কে? তাছাড়া আমার বাবাও খেতেন। তবে হুইস্কি নয়, রাম্। তবে কলির বাবা হুইস্কি খান। তবে বাড়িতে নয়। ক্লাবে। এ সব আলোচনা থাক। আপনার কথা বলুন।

বিধুভূষণ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কত বছর, কত যুগ কেটে গেছে কেউই ওঁর কথা শুনতে চায়নি ওঁর কাছে এসে।

কথাটা মনে পড়তেই, মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো।

ওঁকে নিরুত্তর দেখে কলি বললো, কথা বলছেন না যখন আমাদের সঙ্গে, তখন চলেই যাই আমরা।

উত্তেজিত হয়ে বিধুভূষণ বললেন, না, না, না। চলে যাবে বলেই কি এতোদিন ধরে তোমাদের একটু কাছ থেকে দেখতে চাইছি মায়েরা? আসলে, কী বলবো, তাই ভাবছিলুম। আমার কথা কেউই শুনতে চায়নি বহুদিন। তাই না-বলে বলে, না মনে-করে করে, আমার কথা সব জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। মানে, বটতলার মোক্তারদের ট্রাঙ্কে-রাখা অনেকদিন অব্যবহৃত দলা-পাকানো কালো-কোটেরই মতো। তাকে যে হুট্ করে বাইরে আনা যাবে না মা! কাচতে হবে, প্রেস করতে হবে। সে তো আর হবে না এ জন্মে। সময় বড় কম।

পর্ণা ভাবছিলো, বুড়োমাত্রই বেশি কথা বলেন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, যাকগে আমার কথা। এখন তোমরা কি খাবে বলো?

কলি বললো, দাদু, বারান্দার আর ঘরের আলোগুলো নিভিয়ে দিলে হয় না! কী সুন্দর চাঁদের আলো বাইরে।

খুব হয়। আমি তো অন্ধকারেই রোজ বসে থাকি। মানে, অন্ধকারে অথবা চাঁদে।

আমি ভাবলুম, তোমরা শহুরে আলোকপ্রাপ্তা সব মেয়ে, অন্ধকার তোমাদের পছন্দ হয় কী না হয়।

রসিকতাটা বুঝলো ওরা।

পর্ণা বললো, আমরা আলোক-হৃতা হতে চাই।

কলি বললো, সর্বস্ব-হৃতা।

হায়! হায়! আজ থেকে পঞ্চাশটি বছর আগে যদি এমন কথা তোমাদের মতো কোনো সুন্দরী যুবতী আমায় বলতো! কথাটা শুনেই শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে আজকের এই ঘাটের মড়ার।

অমন করে বলবেন না। উ্য আর ভেরী হ্যান্ডসাম। আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন বলেই আপনার যে সমাহিত, শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌন্দর্য তা আপনার নাতিদের

অথবা অন্য কোনো যুবকের সৌন্দর্যের সঙ্গেই তুলনীয় নয়! আপনার এই সৌন্দর্য অন্যরা কোথায় পাবেন? যাদের চোখ আছে, তারাই এই কথা বলবে।

ঈশ্বর তোমাদের চোখ আরও সুন্দর করুন মা!

বলেই ডাকলেন, গণশা। কই! নিয়ে আয়।

গণশাদা সাদা শ্বেতপাথরের রেকাবিতে আর মেটে লাল পাথরের গ্লাসে করে সন্দেশ আর শরবত নিরে এলো ট্রেতে বসিয়ে।

না, না করেও একটি করে সন্দেশ খেলো ওরা। কী সুন্দর গন্ধ! কী সুন্দর গন্ধ! বলতে বলতে, তারপরই শরবতটা খেয়েই উত্তেজিত হয়ে শুধোলো, কখনো খাইনি এমন শরবত।

বিধুভূষণ জোরে হেসে উঠলেন।

বললেন, তোমাদের জীবনের আর কতটুকুই বা পেরিয়েছো মা! জীবনে অনেক অভিজ্ঞতাই, অনেক কিছুই করা বাকি এখনও। যা কিছুই করোনি তার সবকিছুই একদিন করতে হবে। তার মধ্যে শরবত খাওয়াটাও পড়ে!

কী দিয়ে বানানো?

এর রেসিপি আমি আর স্নিগ্ধর ঠাকুমা মিলে জয়েন্টলি ইনভেন্ট করেছিলাম। ভালো করে শুনে নাও। কলকাতাতে গিয়ে পার্টিতে চালু করে দিও। চাও কি স্ট্রিট-কর্নারে দোকানও খুলে ফেলতে পারো একটা। মাটন-রোল এর দোকানের চেয়ে খারাপ কিছু চলবে না। আর প্রফিটেবিলটি! এইট-হান্ড্রেড পারসেন্ট। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী! পরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে যা হয় নিজেদের কিছু করো মা। যা হয়।

কী দিয়ে বানানো বললেন না তা?

হ্যাঁ। কাঁচা আম বাটা, সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা, এই সময়েতো পাবে না; কিন্তু এখন যা পাবে, সেলারি বা যে-কোনো সেন্টেড-হার্বস, তাই দেবে। সঙ্গে পুরোনো তেঁতুলের রস, তার সঙ্গে শুকনো লঙ্কা পোড়া। একটু নুন, একটু চিনি। কোনোরকম সেন্টেড-হার্বস যদি না পাও তবে কাগজি লেবু বা গন্ধরাজ লেবুর পাতা দিয়ে দেবে চিরে চিরে। যেমন গণশা দিয়েছে।

আঃ।

শরবত-এ চুমুক দিয়ে বললো, পর্ণা।

তোমরা কেউ ব্যাঙ্ককে গেছো? মানে, থাইল্যান্ডে?

আমি একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গেছিলাম তিনদিনের জন্যে।

কলি বললো।

ওদেশের খাবার কেমন লাগলো?

দারুণ।

তবে! সকলেই চাইনিজ-চাইনিজ করে মরে। আমার ধারণা থাই খাবার তার চেয়ে অনেক অনেক ভালো লাগে। ওদেশে ওরা যে সব সেন্টেড-হার্বস ব্যবহার করে রান্নাতে, তাতেই এই ভেলকিটা ঘটে যায়। ভালো একটা ব্যবসার টিপস্ দিচ্ছি। কলকাতার ধারে কাছে বিঘা দুই জমি নিয়ে থাইল্যান্ড থেকে সেন্টেড-হার্বস আনিয়ে চাষ করো। একবার মানুষে তার গুণ জানতে পেলে

আর দেখতে হবে না। ও দেশের কোনো ফার্মের সঙ্গে কোলাবরেশানও করতে পারো। সামান্য খরচের প্রজেক্ট। স্নিগ্ধবাবুর কাছেও বলতে পারো। ওরা তো নানা প্রজেক্ট করছে। তার মধ্যে এটি কিছুই নয়। ওদের ক্রিয়াকাণ্ডর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে যদি তোমরা, তাহলে তোমাদের আরও ঘন ঘন দেখার সুযোগ ঘটতো আমার। অবশ্য আমি আর ক'দিনই বা বাঁচবো!

এই জায়গাটা কেমন লাগল তোমাদের? আর হোটেল মন্দার?

একটু পরে বললেন, বিধুভূষণ।

ভালো। খুব ভালো?

কী ভালো।

সবই ভালো।

মুখ নীচু করে পর্ণা বললো।

কলি চুপ করে ছিলো।

আর তোমার?

আমারও!

সব আলো নিভিয়ে দেওয়াতে আশ্চর্য রূপ খুলেছে এখন অন্দর বাহিরের। চাঁদের আলোতে বারান্দার থাম আর রেলিংয়ের কালো ছায়ায় ঘের পড়াতে বাঘবন্দীর ঘরের মতো দেখাচ্ছে বারান্দাটা। বাইরে থেকে নানারকম রাতচরা পাখি ডাকছে। মিশ্রফুলের গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছে। মহুয়া, আমের বোল এবং কাঁঠালের মুচির গন্ধ ছাড়াও চৈতি রাতের এক আলাদা গায়ের গন্ধ আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সে গন্ধ আলাদা আলাদা। ভারি ভালো লাগছিল ওদের। বিশেষ করে বিধুভূষণের সঙ্গ। তাঁর অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত চেহারা, শরীরের আতরের গন্ধ, তামাকের গন্ধ, হুইস্কির গন্ধ—সব মিলেমিশে ঐ রাতে ওরা মোহাবিষ্ট হয়ে ছিলো। কলকাতার আর লোডশেডিংয়ের নাগর-দোলার মধ্যে বসে ঠিক এইরকম একটি সন্ধের কথা, 'খানদানী', 'বুর্জোয়া' পরিবেশের কথা, ভাবাও যায় না। বুর্জোয়াদের সবকিছুই যে খারাপ একথা পর্ণা মানতে পারে না। আসলে, যে-সব অগণ্য মানুষ 'বুর্জোয়া' শব্দটা নিয়ে আস্ফালন করেন, শব্দটার মুণ্ডপাত করেন; তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই শব্দটার প্রকৃত তাৎপর্য পর্যন্ত বোঝেন না। পাতি-বুর্জোয়া, টি. এ. বিল ইনফ্লেট করা আমলারা, বাড়ির ঝিয়ের পাঁচটাকা মাইনে বাড়ানো নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করা ইউনিয়নবাজেরা প্রকৃত বুর্জোয়া বলতে কি যে বোঝায়; তাই জানেন না। দেশটা অশিক্ষিত মানুষে ছেয়ে গেছে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা যতই বাড়ছে, দম্ভ অহং আর সবজান্তা ভাবও ততই বাড়ছে।

বিধুভূষণ ভালোলাগায় বুঁদ হয়ে বসে আছেন। মেয়ে দুটির শরীরের সাবান আর পারফ্যুমের গন্ধে বারান্দাটা 'ম' 'ম' করছে। কতদিন পরে তাঁর বারান্দা এমন সুরভিত হলো আবার।

আসলে, মেয়েরা পুরুষদের জীবনের কতবড় শূন্যতা যে পূরণ করে তা জীবনের শেষে এসে বিধুভূষণ আজ যেমন করে বোঝেন তেমন করে তো টগবগে যৌবনের স্নিগ্ধ ও প্রণয় বুঝবে না। বিয়ে যদি করতে হয়, তাহলে যত

তাড়াতাড়ি তা করে ফেলে ওরা, ততই ওদের পক্ষে সুখের।

বিধুভূষণ ভাবছিলেন।

শুনেছি, একসময় আপনি খুব ভালো ধ্রুপদ-ধামার গাইতেন?

পর্ণা শুধোলো নিস্তব্ধতা ভেঙে।

তোমাদের কে বললো?

পর্ণার প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন বিধুভূষণ।

প্রণয়।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ! সে, একসময়ে। সেই সময়তো এখন আর নেই।

এখন কি গান একেবারেই গান না?

গাই। বাথরুমে। নিজেকে শোনাবার জন্যেই গাই, ক্বচিৎ-কদাচিৎ।

তা আমাদের কি শোনানো যায় না একটু? সেই ক্বচিৎগান?

না গো। সুর নড়ে যায়, দম সরে যায়। যুবতীকে যৌবনে দেখাই ভালো। যাদুঘরে গিয়ে তার কঙ্কাল দেখে কি কল্পনায় তাকে প্রাণদান করা যায়?

চুপ করে রইলো ওরা।

কলি ভাবছিলো, খুব সুন্দর কথা বলেন বিধুভূষণ।

তোমরা কেউ কি গান গাও?

ও গায়।

তাই? কী গান?

ও পুরাতনী গান শিখেছে এখন। আগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ডিপ্লোমা নিয়েছিলো গীতবিতান থেকে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু যে-কোনো গান শিখতেই একটু ক্লাসিকাল বেস্-এর দরকার হয়। তাছাড়া অনেকেরই ধারণা, রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়াটা খুবই সহজ। রবীন্দ্রনাথের গান, শিক্ষিত মানুষের গান! আমি বলবো, নিধুবাবুর গানও তাই। প্রতিটি শব্দের অন্তর্নিহিত মানে বুঝে, তাকে সুর লয় এবং ভাবের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত যিনি করতে পারেন তিনিই প্রকৃত গায়ক। কেউ স্বরলিপি পাঠ করেন, কেউ বা তানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেন। কেউ বা তাল নিয়ে এমনই হিমশিম খান, মনে হয়, যেন কোঁচা-দোলানো ধুতি আর তালতলার চটি পড়ে মাউন্ট এভারেস্ট চড়ছেন। কখন যে পা হড়কায় এই চিন্তাতেই সদাই ক্লিষ্ট। গান হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। বুঝলে মায়েরা, অন্তরের ব্যাপার। আর যে গান হৃদয়ের যত গভীর থেকে ওঠে, অন্য হৃদয়ের তত গভীরেই তা গিয়ে পৌঁছোয়। সুপার-ফিসিয়াল গানের এফেক্টও সুপার-ফিসিয়ালই হয়। সাহিত্যের বেলাতেও তাই।

কলি ভাবছিলো, সব মানুষই বুড়ো হয়ে গেলে বড় বেশি কথা বলেন। তবু শুনতে কিন্তু খারাপ লাগছিলো না।

ও বললো, একথা বোধহয় ক্রিয়েটিভিটির প্রতিটি বিভাগ সম্বন্ধেই সত্য। শুধু গানই কেন?

ঠিকই বলেছো মা। তা, শোনাও না একখানি গান! তানপুরা আনতে

বলি ? আমিই ছাড়বো।

তানপুরার সঙ্গে ? শুধু গলাতে।

লজ্জা-লজ্জা মুখে সমস্বরে বললো ওরা।

বিধুভূষণ হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ। গান যখন গাইবে তখন তানপুরারই সঙ্গে গাইবে। সঙ্গে আধিক্য হিসেবে একটি তারের বাজনা নিতে পারো। তালে যে গান গাইবে, তাতে তবলা বা পাখোয়াজ, যেমন প্রয়োজন, তেমনই নিও। বছর তিনেক আগে একবার রামকুমারবাবু এয়েচিলেন এখানে। ক'দিন গান-বাজনা খুব হলো। কুমার বোসের তবলা শুনেছো কি তোমরা ? আজকাল রবি ভাই-এর সঙ্গে বাজাচ্ছে। সেও এয়েচেলো। বাচ্চা ছেলে। কিন্তু ভারী মিষ্টি হাত। অনেকদূর যাবে ও ছেলে, যদি মাথাটি না যায়। অথবা মদে না খায়। যে-সংখ্যক প্রকৃত গুণীদের এদেশে মদে [illegible], সে তুলনায় সোঁদরবনের বাঘে-খাওয়া মউলে-জেলে-বাউলেদের সংখ্যাও [illegible] কম।

গুণের সঙ্গে মদের কী হিসেব-কিতেব আছে জানি না [illegible] বড় আশ্চর্য লাগে ভাবলে।

পর্ণা বললো !

আসলে কী জানো মা ! প্রত্যেক গুণী মানুষই সঙ্গে করে কিছু কিছু অভিশাপও বোধহয় বয়ে আনেন। আমরা গুণীর গান গুনি, বাজনা শুনি, লেখা পড়ি; কিন্তু তা আমাদের কাছে পেশ করতে তাঁদের ভেতরে যে যন্ত্রণাটা হয়, তার ভাগীদার তো আমরা হই না; হতে পারিও না। সেই দুঃখই হয়তো, সেই অসহায় একাকীত্ব, ভালোবাসা, সহানুভূতি-সমবেদনার অভাবই হয়তো তাঁদের মৃত্যুর দিকে অতি দ্রুত ঠেলে নিয়ে যায়। এমন গুণগ্রাহী এদেশে তো বেশি দেখি না, যাঁরা গুণীকে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে সাহচর্য, প্রেম, প্রীতি, সহানুভূতি দিয়ে মৃত্যুর নখ থেকে আড়াল করে রাখেন ! তবে কুমার এখনও মদ ধরেনি বলেই জানি।

রামকুমারবাবুর কথা বলছিলেন না ? বলুন !

হ্যাঁ রে মা। রামবাবু বলছিলেন, 'বুঝলে বিধুদা, আমাদের সময়ে কথাটা জানতুম 'গান-বাজনা'। কথাটা তেমনই ছেলো। আজকাল হয়েছে 'বাজনা-গান'। কাঁর গলা কেঁমন যে বলে, তা বোঝে এমন সাধ্যি কার ? গাদা-গুচ্ছের বাজনার মধ্যে দিয়ে বর্ষার কালো আকাশের মধ্যে মাঝে-মাঝে ক্বচিৎ চাঁদের ঝিলিকের মতো গলা বেরিয়ে এসে বলে যায়, 'ওহে ! আম্মো ছিলুম ! এ কতা জেনো।'

কথা শুনে ওরা হেসে উঠলো।

বিধুবাবু বললেন, গাইয়ের গলাতে যদি সুর থাকে তবে তার তানপুরা, দিলরুবা, এসরাজ বা বেহালা বা সারেঙ্গীর সঙ্গেই শুধু গাওয়া ভালো। যার গলায় সুর নেই, পর্দাতে সুর লাগে না; তাদের গান গাওয়াই বা কেন ? না গাইলেই হয় ! অবশ্য একথা আর বলবো এখন কোন ভরসাতে বলো মায়েরা ?

ভারী ভালো লাগছিলো পর্ণা আর কলির। এমন সব কথা বলার এবং

এমন করে বলার মানুষ তো কমেই এসেছে। ওঁদের পায়ের কাছে বসে কথা শোনার সুযোগ আর বেশি কি হবে?

কই মা, শোনাও একটি গান।

আমি বরং খালি গলাতেই গাই।

সে তো আরও ভালো।

হেসে ফেললো কলি।

বললো, এতো বললে, ভয়ে গাইতেই পারবো না। গাইছি কিন্তু।

গাও।

'যারে তারে মন দিতে বলে যে নয়ন আমার
আমি নিবারণ করি যত
অমনি ভাসে নয়ন জলে
যারে তারে মন দিতে বলে গো নয়ন আমার।
মন নয় মনেরি মতো
সে যে নয়নেরি অনগত
তারে বুঝায়ে রাখিব কত
সে যে নানা পথে চলে গো।
যারে তারে মন দিতে বলে যে,
নয়ন আমার···।'

গান শেষ হলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মুখর হলেন বিধুভূষণ। বললেন, বাঃ বাঃ! কালিবাবু আজ বেঁচে থাকলে তোমার গান শুনে বড় খুশি হতেন মা! কী গান শোনালে!

কালীবাবু কে?

কলি শুধোলো।

শুধিয়েই বুঝলো যে, বোকামি হয়ে গেছে।

কালিবাবু, মানে কালিপদ পাঠক। উনিই তো রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন।

তা যাই হোক মা, গান শুনে বড়ই ভালো লাগলো। আমার প্রশংসা কিন্তু ফ্যাল্‌না নয়। কম গুণীর গান তো শুনিনি এ-জীবনে। আমার যখন ভালো লেগেছে তখন তুমি গান ব্যাপারটাকে একটু সিরিয়াসলি নাও। গানের জন্যে আরও সময় দাও। গানের মতো জিনিস নেই মা। যদি তেমন মন প্রাণ ঢেলে গাইতে পারো, তবে উপরওয়ালা ঠিকই তরিয়ে দেবেন।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করো তুমি?

ও করে না। আমি করি।

করবে। ঈশ্বর ছাড়া, তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া; আমরা কী-ই বা করতে পারি জীবনে?

আজকে আমরা উঠবো।

পর্ণা বললো।

এখুনি উঠবে? বুড়ো মানুষ, কথা কইবার লোক পাই না যে। তাছাড়া

আমার আসল কথাই যে বলা হচ্ছে না তোমাদের। শুধোনো হলো না, যা শুধোতে ডেকেছিলুম।

আসল কথা? বলুন।

ঢোঁক গিলে বললো ওরা দুজনেই সমস্বরে।

বুক দুরদুর করতে লাগলো ওদের দুজনেরই।

তোমাদের বিয়ে তো হয়নি। কিন্তু বিয়ে কি ঠিক আছে?

না।

নেই? তবে…

বিধুভূষণ বললেন।

ঠিক সেই সময়েই স্নিগ্ধ আর প্রণয় একই সঙ্গে ঘরে ঢুকে ঘব-বারান্দাব বাতিগুলো সব জেবলে দিয়ে বললো, দাদু। এবারে ওঁদের নিতে এলাম। রাত তো অনেকেই হলো।

আশাহত বিধুভূষণ খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। ওদের দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, তোমাদের ছাতার 'মন্দার হোটেল'-এর ভাত না জুটলেও বিধু রায়চৌধুরীর বাড়িতে কি এই দুই কন্যের জন্যে দুমুঠো ভাত জুটতো না? তোমরা নিজেদের কি ভাবো?

দাদু! দাদু! আমরা ভাত খাই না রাতে।

মাঝে পড়ে, পরিবেশের অপ্রিয়তা কাটাবার জন্যে কলি বলে উঠলো।

নুচি খাও তো? কি মা?

বলেই, হাঁক ছেড়ে ডাকলেন, গণশা।

না, না। আজকে ছেড়ে দিন দাদু।

তবে? কি খাও? কি খাবে?

এই, এই, চাইনিজ। চাইনিজ খাবো বলেছিলাম আজকে। মানে হোটেলে। জানতাম না তো যে এখানে, আপনার কাছে…

মিথ্যে কথা বানিয়ে বললো পর্ণা।

ও। চাইনিজ খাবে। তাই বলো। চাইনিজ খাবে?

পর্ণার মিথ্যেটা হজম করতে একটু সময় নিয়ে বিধুভূষণ চুপ্‌সে গিয়ে বললেন, না, না। তবে যাও। গরম গরম খাও গিয়ে। আমারই অন্যায় হয়েছে। আমার বেঁচে থাকাটাই অন্যায়। আমার কল্পনা অন্যায়। আশা অন্যায়। স্বপ্ন অন্যায়। আমার অস্তিত্বটাই, পুরোপুরি অন্যায়…।

বলতে বলতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেলেন বিধুভূষণ।

স্নিগ্ধ বললো, দাদু তুমি কী যে করো! এঁরা দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন, আনন্দ করতে এসেছেন, পয়সা দিয়ে রয়েছেন হোটেলে, এঁদের আনন্দর ব্যাঘাত ঘটানোটা কি তোমার ঠিক হচ্ছে? তোমার নিজের খাবার সময়ও তো পেরিয়ে গেছে। এবারে খেয়ে নাও দাদু। আমি এঁদের খাইয়েই আসছি। তোমার পা টিপে দেবো।

বিধুভূষণ স্নিগ্ধর কথার পিঠে কথা না বলে ডাকলেন, গণশা।

আজ্ঞে বাবু।

ঘর-বারান্দার সব আলো নিবিয়ে দাও। আমি আজ রাতে কিছু খাবো না। এখনই শুয়ে পড়বো। আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার নিরাপত্তায় পেঁছে প্রণয় বললো স্নিগ্ধকে, তোর আর কী! রাতে তো যেতে হবে না। দরজা বন্ধ। কাল সকালে আমায় গুলি-খাওয়া বাঘকে ফেস করতে হবে। যত্ত ঝামেলা সব আমার।

স্নিগ্ধ বললো, চুপ কর তুই।

বলেই, কলিকে বললো, আপনারা কিছু মনে করেন নি তো? দাদুর এই দোষ। মন্দার হোটেলে সুন্দরী যুবতী এলেই তাঁদের ডেকে এরকম ধানাই-পানাই শুরু করবেন। আচ্ছা! ইজ্জতে লাগে, কি না, বলুন তো! আমি না হয় অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ, পেটের জন্যে ছোট্ট হোটেল চালিয়ে খাই, তা বলে কি দাদু আমাকে এবং এই প্রণয়কেও রোজ রোজ নীলামে চড়াবেন? আপনাদের মতো অ্যাকমপ্লিশড, শহুরে, সফিস্টিকেটেড মেয়েদের কি বিয়ে করার ছেলের অভাব? কোন্ দুঃখে আপনারা··।

তাছাড়া ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে কীরকম ইনসালটিং একবার ভাবুন তো!

প্রণয় বললো।

পর্ণা বললো, সত্যিই তো। সবই বুঝছি। তবে আমরা তো মনে কিছুই করিনি। দিদিমা-দাদুরা নাতিদের জন্যে অমন করেনই। সে নাতি কানা-খোঁড়া, অশিক্ষিত যেমনই হোন না কেন! আমরা কিছুমাত্রই মনে করিনি। কী বল্ কলি? এখন আপনারা কিছু মনে না করলেই হলো। আপনার দাদু চমৎকার মানুষ। রীতিমতো গুণী মানুষ।

দু'হাত ওপরে ছুঁড়ে স্নিগ্ধ বললো, রিয়্যালি ইম্‌পসিবল্।

প্রণয় বললো, আপনি দারুণ গান গানতো। গান শুনেই তো আমরা উপরে গেছিলাম আসলে। ভাগ্যিস উপরে গেছিলাম!

আসলে কি করতে উপরে গেছিলেন তা আপনারাই জানেন।

পর্ণা বললো।

সীরিয়াসলি বলছি।

প্রণয় বললো, পুরো গানটি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছি দুজনে। উপরে না গেলে আজ আপনাদের বিপদ তো হতেই পারতো, আমাদেরও সম্মান ধুলোয় লুটোতো। প্রি-হিস্টরিক মানুষটিকে কী করে বোঝাবো যে সময় পাল্টে গেছে, ওঁদের যুগ আর নেই, প্রত্যেক যুবক-যুবতীরই অতীত আছে, নিজস্ব রুচি, পছন্দ-অপছন্দ আছে, বিয়ে করা ছাড়াও প্রচুর কাজ-কর্ম আছে। অথচ কে বুঝবে এসব? ছিঃ। রোজ রোজ নিত্যনতুন মহিলাদের কাছে এই অপমান আর ভালো লাগে না।

রোজই কি ইনি এমন করেন? মানে হোটেলের যুবতী গেস্টসদের ডেকে পাঠান? আমার কিন্তু মনে হলো না তা।

কলি বললো।

একেবারেই মনে হলো না। এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

পর্ণা বললো।

তাই ? মনে হলো না আপনার ?

ধরা-পড়া, আন্-নার্ভড্ গলায় প্রণয় বললো।

সত্যিই তো ! আমরা তো মেয়ে ! অপরিচিত-অর্ধপরিচিতদের কাছে রোজ রোজ রিজেক্টেড হতে যে কেমন লাগে সে অভিজ্ঞতা তো আমাদের বহু প্রজন্মেরই। তাই আপনাদের কষ্টটা অবশ্যই বুঝতে পারি।

'আর্লি লাঞ্চ' সারতে সারতেও বেশ দেরি হয়ে গেলো।

সে কথা বলতেই হন্‌সো বললো, চল্লিশ মিনিট মতো লাগবে মাত্র সাইকেল রিকশাতে যেতে।

ফিরতে রাত হয়ে গেলে?

কোনো ভয় নেই। যাবার সময়েও পথে বহু মানুষ পাবেন এবং ফেরবার সময়েও। ফেরার সময় তো গান গাইতে গাইতে, মহুয়া খেয়ে বকর-বকর করতে করতে ফিরবে সকলে। তার উপরে দুদিন বাদেই পূর্ণিমা। উজলা হয়ে থাকবে পথ, গাছ-গাছালি, বন-পাহাড়। আমাদের এখানে ছিনতাই, রাহাজানি বা অন্য কোনোরকম ভয়ই নেই। সে সব ভয় আপনাদের বড় বড় শহরে।

প্রণয়বাবুকে দেখলাম না তো!

কলি শুধোলো।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে হন্‌সো বললো, কী জানি কোথায় গেছে! আমিও দেখছি না দাদাকে সকাল থেকেই।

আর ম্যানেজারবাবু?

হন্‌সো নির্ভুল মেয়েলি ইনটিউশানে স্থির চোখে তাকালো কলির চোখে, তার চোখের মণি কলির মণিতে টায়ে টায়ে ফেলে।

তারপর বললো, তাঁকেও তো দেখছি না। গেছেন কোথাও। কেন বলুন তো? কিছু কি বলবো স্নিগ্ধদাকে?

না, না। বলতে হবে না কিছুই।

কালিদা রিকশা ঠিক করেই রেখেছিলো। রিকশা আসতেই কলি, দু-আঙুলে একটু মৌরী তুলে মুখে ফেলেই বললো, চলি।

আপনার বন্ধুর খাবার কি ঘরেই পাঠিয়ে দেবো?

তেমন তো বলেনি। একটা নাগাদ মনে হয় নিজেই খবর দেবেন।

ওঁর শরীর কি খারাপ? দেখে আসবো গিয়ে?

না না। শরীর তো ভালোই। বই পড়ছেন শুয়ে শুয়ে। চলি।

আচ্ছা। বেলাবেলি চলে আসবেন। এ-সময়ে প্রায় রোজই ঝড়-বৃষ্টি হয় সন্ধের দিকে।

তাই আসবো।

রিকশাটা যখন গেটের কাছে এগিয়ে গেছে, তখন দেখলো যে ঠাট্টা করে যে-গাড়িকে পর্ণা বলে, 'সোফার-ড্রিভন লিমুজিন', সেটি দাঁড়িয়ে আছে গ্যারাজের সামনে। একটি ছেলে তাকে ধোওয়া-মোছা করছে। কলির হাসি পেলো সেদিকে তাকিয়ে। এই গাড়ির আবার এতো যত্ন! কুয়োতলাতে নিয়ে গিয়ে ঝপাং ঝপাং করে কয়েক বাল্টি জল ঢেলে দিলেই যথেষ্ট হয়। তা না, আবার ধোওয়া-মোছা!

রিকশাওয়ালার বয়সও কলির মতোই হবে। সুন্দর স্বাস্থ্য তার। চেহারাও। মাথায় বাবরি চুল। কুচকুচে কালো। পাথরে কোঁদা বলে মনে হয় শরীর। সরু কোমর। কোমর থেকে চওড়া হয়ে উঠে এসেছে বুক। তারপরই কোনো মহীরুহের মতো ছড়িয়ে গেছে চওড়া কাঁধ দু'পাশে। দু বাহু; নবীন, শালপ্রাংশু। দু পায়ের কাফ্‌মাস্‌লও দেখার মতো। সমস্ত শরীরটিই যেন এক ছবি। অশেষ মনোযোগের সঙ্গে বিধাতা এঁকে গড়েছেন। না যত্ন, না প্রসাধন; না মড-জামাকাপড়ের বাহুল্য, ধুতি আর হাফ-হাতা একটি গেঞ্জি, সাদা-রঙা; তাতেই যেন রূপের বন্যা হইছে।

কলি ভাবছিলো, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কেবল মেয়েদেরই বর্ণনা থাকে। শরীরের বর্ণনা তো বটেই! কবে যে তেমন মহিলা সাহিত্যিকেরা আসবেন! যাঁদের চোখের আর কলমের মধ্যে দিয়ে একদিন অনাবিষ্কৃত পুরুষেরা আবিষ্কৃত হবে। মেয়েরা যে চোখে পুরুষদের দেখেন সেই চোখে তো পুরুষেরা নিজেদের দেখবার ক্ষমতা রাখেন না! জানে না কলি, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এই ঘাটতি কবে পূরিত হবে।

তবে কবিতার ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। অনেকই নবীনা মহিলা কবির কলমে পুরুষ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। আফটার অল, প্রজাতি হিসেবে পুরুষও তো একেবারে ফ্যাল্‌না। তাছাড়া নারীর পূর্ণতার জন্যে এতোদিন পর্যন্ত তো পুরুষকে দরকারও হয়েছে। ভবিষ্যতেও হয়তো হবে। তবে কোনো বিশেষ পুরুষের সান্নিধ্য ছাড়াই হয়তো মেয়েরা ভবিষ্যতে পূর্ণতা পাবে। পর্ণার মতো সীমেন-ব্যাঙ্কের খোঁজ করা নারীর সংখ্যা আধুনিক পৃথিবীতে হয়তো প্রতিদিন ক্রমশই বাড়তে থাকবে। মানিয়ে-নেওয়া কিছু স্বাধীনতা, ভালো লাগা, রুচি বন্ধক দেওয়াতেও মেয়েদের এখন প্রবল আপত্তি। এই আপত্তিও প্রতিদিন ঘোরা হবে। রজনীরই মতো।

তোমার নাম কি?

রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো কলি।

দল্‌মা।

সে কি? পাহাড়ের নামে নাম?

হুঁ। আমি তো জেঠ-শিকারের সময়ে দল্‌মা পাহাড়েই জন্মেছিলাম।

শিকার তো করে পুরুষেরা। তোমার মা সেখানে কি করতে গেছিলেন?

মা গেছিলো মারাংবুরুর পুজা চড়্হাতে। সিখানে গিয়ে বেথা উঠলো। কি করেক ? পাহাড়েই থেইকে যেতে হলো। আর আমি জন্মালম, পাহাড়ের মতো শরীর নিয়ে, দল্মা পাহাড়ে। পুর্ণিমার রাতে।

বাঃ!

বাঃ শব্দটা যে কেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো বুঝতে পারলো না কলি। শব্দটা উচ্চারণ করেই লজ্জা পেলো।

দল্মা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকালো কলির দিকে।

নিজের মনেই হাসলো। সংক্ষিপ্ত, এক শব্দের হাসি; যেমন করে আদিবাসী প্রাণীরা নিজের মনে হাসে।

কলি অপ্রতিভ হলো। এমন আজকাল মাঝে মাঝেই হয়। নিজেকে পুরো-পুরি অপ্রতিভ করে দিয়ে মনের অত্যন্ত গভীর কোনো প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে কোনো কথা, মনের মধ্যে জমে-থাকা পাতা-পুতা, অ্যাল্গি, ফাঙ্গাই সব ঠেলে-ঠুলে উপরে উঠে আসে। এসে, নিজের নিজস্ব গতিতে মুখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। বড়ই বিপদ! সে-কথাকে থামানো যায় না।

ঝুম্কাতে যেতে পথে কী কী জায়গা পড়বে ?

কলি শুধোলো দল্মাকে।

সে তো কত জায়গাই পড়বে।

বলোই না।

সে চিহর্ডিগা, কুক্ড়াপানি, চিঁড়িয়ানালা, হুড়ুক্পাথর······আরো কত্ত জায়গা।

তোমার বয়স কত ?

কি বললে দিদি ?

আবার ঘাড় ঘুরোলো দল্মা বাঁদিকে। সঙ্গে-সঙ্গে রিকশার হ্যান্ডেল ডানদিকে ঘুরে গেলো।

বলছি, তোমার বয়স কত ?

হিঃ। সিটা বলতে লারব।

সে কি ? তোমার বয়স কত তুমি জানো না ?

না দিদি।

তোমার মাও জানেন না ?

হ্যাঁ। জানে বটেক। সি জানবে না কেনে ? জনম দিলো!

জিগেস করোনি কখনও মাকে ?

দুর্। কী হবে ? বয়সের মনে বয়স যায়, আমার মনে আমি। তাকে তো আমার কুনো দরকার লাই।

চুপ করে রইলো কলি। কী বলবে জবাবে ভেবে পেলো না।

এইখানে পথটা একটি চড়াইয়ে উঠছে। পথটা কিঞ্চিৎ পাথুরেও।

রিকশাওয়ালা দল্মা দম টেনে টেনে উঠছে চড়াই। কথা বলতে পারছে না। তা দেখে কলি চুপ করে গেলো।

বলো উঠলো, আমি নেমে যাই ? নেমে গেলে তোমার সুবিধে হবে ?

বাঁ-হাতটি ক্ষণিকের জন্যে উপরে তুলে ইঙ্গিতে দল্‌মা বারণ করলো নামতে কলিকে।

কিছুক্ষণ পরেই চড়াইটি ওঠা শেষ হলো। পাথরে-কোঁদা দল্‌মার শরীরের আবরণী গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে গেলো সপ্‌সপে হয়ে। কলির খুব ইচ্ছে করছিলো একটি ধবধবে সাদা ধোপাবাড়ি থেকে সদ্য-আসা তোয়ালে দিয়ে দল্‌মার পিঠটি মুছে দেয়। কিন্তু···

হয় না। স্নিগ্ধ হলেও বা হতো। প্রণয় হলেও হয়তো হতো। কিন্তু এ যে দল্‌মা! আর ও যে কলি।

এই ভারতবর্ষের 'সংহতি' আসতে অনেকই দেরী আছে এখনও। দলে দলে খেলোয়াড়, নাট্যকার, কথাকার, আঁকিয়ে, গাইয়েদের দলা-দলা করে রোজ রাতে টি. ভি.তে দেখিয়ে আর অর্থহীন প্রলাপের মতো গান গেয়ে এ কাজ হবে না। যেদিন কলিরা নির্দ্বিধায় দল্‌মাদের পরিশ্রমের ঘাম-গড়ানো পিঠ নিজহাতে মুছিয়ে দিতে পারবে, যেদিন দল্‌মারা তাদের শিক্ষাতে, আর্থিক অবস্থাতে আর একটু উঁচুতে উঠে আসবে আর কলিরা নেমে আসবে স্বেচ্ছাতেই, একটু নিচুতে; সেদিনই তা সম্ভব হতে পারে। ন্যাশানাল ইনটিগ্রেশানটা অন্তর্জগতেব ব্যাপার, বহির্জগতের নয়।

দল্‌মা বললো, তুমি দিদিটা ভালো আছো। কিন্তু নেমে গিয়ে কতটুকু সুবিধে করতে তুমি দিদি? আমাদের যে অনেক অসুবিধে, অনেক রকমের অসুবিধে।

কলি মাথা নাড়লো। সম্মতির। মুখে কথা বললো না।

বেশ লাগছে এখন। রোদ এখনও ভালোই লাগছে। হয়তো দু-তিনদিনের মধ্যেই খারাপ লাগতে শুরু করবে। হাওয়াটা এখনও ঠাণ্ডা। কাল মাঝরাতেও একটু বৃষ্টি হয়েছিলো। ঘুমোচ্ছিল বলে বোঝে নি। বাইরে বেরোতেই বুঝতে পাচ্ছে। জায়গাতে জায়গাতে, যেখানে মাটি অসমতল, সেখানে দোলাগুলিতে মাটি ভিজে আছে। জলও জমে আছে অল্প অল্প। রাতে বৃষ্টি হওয়াতে এ ক'দিনে গাছে-পাতায়-ঘাসে যে লাল ধুলোর আবরণ পড়েছিলো তা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চারদিকের চাপ চাপ উজ্জ্বল মনোরম ক্লোরোফিল চোখকে তৃপ্ত করছে। একটি ছোট্ট সবুজ পাখি, তার লেজটি মাঝখান দিয়ে চেরা, চিরিপ্-চিরিপ্ করে ডাকতে ডাকতে উড়ে বেড়াচ্ছে এই বন-পথে খুশির হর্‌রা তুলে দিয়ে। গাছ-গাছালি, বন, পাখি এই সবই মানুষকে কত সুখী করে, তার মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে, তাকে মানুষ করে রাখতে এরা যে কতখানি জরুরী তা কলি বোঝে।

ওর বন্ধু অনিন্দিতা কানাডার টোরোন্টো শহরে থাকে স্বামীর সঙ্গে। তার কাছে শুনেছে যে টোরোন্টো শহরের মধ্যে মধ্যে নাকি স্বাভাবিক বন আছে। হাতের কাছের গাছ কাটেনি সে দেশের মানুষ, মানুষের ব্যবসা বা জীবিকা বা বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে। একটি গাছ কাটলে নাকি সে দেশে দশ বছরের জেল হয়। কবে যে এমন সব নিয়ম নিজেদের দেশেও চালু হবে! হয়তো হবে, যখন একটিও গাছ আর অবশিষ্ট থাকবে না।

এবারে পথে লোকজনের দেখা মিলছে। 'All roads lead to Rome! সকলেই হাটে চলেছে। ফেরবার সময়েও হয়তো দেখবে এই রকম। সকলেই হাট সেরে ঘরে ফিরছে।

পর্ণাটা হোটেলে একা কি করছে কে জানে। ও যেমন এমোশানাল হয়ে গেছে, ওকে একা থাকতে দেওয়াটাও ঠিক নয়। দুজনে একসঙ্গে বেড়াবে, মজা করবে বলেই তো এসেছিলো! অথচ কী যে হলো! যখন বললো ও যে, হাটে যাবে না, তখন মনটা বেশ খারাপই হয়ে গেছিলো কলির। এখন কিন্তু ভালোই লাগছে।

কাহ্লিল জিবরান্-এর কবিতা আছে না? দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও ফাঁক থাকা উচিত—'spaces between togetherness'—নইলে সে সম্পর্কও একঘেয়ে হয়ে যায়। আর বন্ধুত্বের মধ্যে তো থাকা উচিতই! সবসময়ে মানুষ কী করে যে হল্লা করে, একই বন্ধুদের সঙ্গে, একই আলোচনা, একইভাবে দিনের পর দিন? তা ভাবলে ও বিষণ্ণ বোধ করে। যে মানুষ নির্জনতা, একাকীত্বর সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে পারে না তার মনুষ্যত্বের বিকাশই বোধ হয় সম্পূর্ণ হয়নি। ও একা না থাকলে, একা না এলে; কী এতো কথা এমন করে ভাবতে পারতো!

হাতঘড়িটা দেখলো একবার। বাবাঃ, প্রায় এক ঘণ্টা হতে চললো। তবে দূরে ঝুমকার হাট দেখা যাচ্ছে এখন। দূরাগত কোলাহল, মানুষ, প্রাণী, যানবাহনের মিশ্র আওয়াজ কানে আসছে।

ঠিক এমনই সময়ে পেছনে একটি ঝরঝর ধড়ফড় শব্দ শুনতে পেলো।

আওয়াজ শুনে মনে হলো কোনো লজঝর লরী আসছে বুঝি!

শব্দটা কাছে এগিয়ে এলো। তারপর একেবারে ওর পেছনে এসে গেলো। তারপরই আবার শুরু হয়ে কলিকে অতিক্রম করে চলে যেতে শব্দটা থেমে গেলো একেবারেই!

কলি দেখলো স্নিগ্ধ। তার ফোর্ড গাড়িতে।

কী ব্যাপার?

হাওয়াতে বুকের কাপড় সরে গেছিলো। শাড়ি টানতে টানতে বললো, আপনি? কোথায় চললেন?

কাজে যেতে হচ্ছে টাটাতে। কখন ফিরবেন আপনি? হাট থেকে?

ফেরাটা তো আমার হাতে। এখুনিও ফিরতে পারি আবার অনেক দেরী করেও ফিরতে পারি।

ফিরতে ফিরতে আমার বিকেল হবে। পাঁচটা-টাঁচটা।

আমার সঙ্গে ফিরবেন?

স্নিগ্ধ বললো।

ফিরলে তো মন্দ হওো না। কিন্তু রিকশা নিয়ে এসেছি যে! যাওয়া-আসার কড়ার করে দিয়েছে কালিদা।

ও। সেটা তো মস্ত বড় সমস্যা নয়। দলমাকে পয়সাটা পুরো দিয়ে দিলেই তো মামলার নিস্পত্তি হতো। তারপর আপনি গাড়িতেই ফিরুন কী

হেলিকপটারে, তাতে ওর কি এসে যাবে ?

আমার তো কাজ বেশিক্ষণের নয়। চুড়ি তো কিনতে এসেছি। চুড়ি কেনা হয়ে গেলে কি হাঁ করে বসে থাকবো আপনার পথ চেয়ে ?

চুড়ি কিনে নিয়ে আমার সঙ্গে যেতেও পারতেন টাটাতে। বেশ লং-ড্রাইভ হতো।

না বাবা। আপনার এ-গাড়িতে দূরের সফরে যেতে ভরসা হয় না। যদি আবারও কখনও এখানে আসি, তখনই যাবো নয়। একটা মারুতি-টারুতি কিনে নেবেন ততদিনে।

আবার যদি আসেনই তখনই দেখা যাবে।

বলেই, স্নিগ্ধ বললো, ঠিক আছে। আমি এগোলাম তাহলে।

স্নিগ্ধ অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিবে এগিয়ে গেলো।

মনটা হঠাৎই খারাপ হয়ে গেলো কলির। পরিষ্কার দেখতে পেলো যে আকাশ যেমন মেঘে ছেয়ে যায় তেমনই স্নিগ্ধর মুখটা কালো হয়ে এলো ধীরে ধীরে। আশাভঙ্গতায়। নিজের জন্যেও দুঃখ যে হলো না এমনও নয়। তাও হলো। কিন্তু পর্ণা ? পর্ণা আজই সকালে বলেছে 'সোফার-ড্রিভন লিমুজিন'এর কথা ! আজই যদি এই গাড়িতে স্নিগ্ধব সঙ্গে সন্ধে কবে ফেরে তাহলে বাক্য-বাণের আর শেষ থাকবে না ! স্নিগ্ধকে তো এতো কথা বলা গেলো না এতো অল্প সময়ে। তাছাড়া বলা উচিত হতো না হয়তো। ও দুঃখ পেয়ে চলে গেলো। ভারী হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছিলো ওকে। ফিকে-হলুদ একটি স্পোর্টস-গেঞ্জি পরেছে। ঘাড় অবধি নামা চুল। চোখে কালো ফ্রেমের মোটা চশমা। প্রফেসর-প্রফেসর ভাব।

চলে গেলো। স্নিগ্ধ চলে গেলো। ভুল বুঝে চলে গেলো। জীবন এরকমই। যে কাছে থাকলে ভালো লাগে, সে কাছে থাকতে চাইলেও কাছে তাকে রাখা যায় না ! আর দূরে চলে গেলে সে সহজে আবার কাছেও আসে না। সোজা কথা সোজা করে বলতে চাইলেও কখনওই বলা যায় না। জীবনের ট্রাজেডি এই।

যতই দিন যাচ্ছে ততই একটু একটু করে বুঝতে পারে কলি এখন এই কথাটা যে, জীবন একরকমই ; তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে কব্জা করে রাখবার সমস্ত উপাদান নিজের হাতের নাগালে থাকলেও তাকে কব্জা করা আদৌ যায় না। আঁজলা গলে গড়িয়ে পড়ে যায় !

ঝুমকার হাট থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে স্নিগ্ধ গাড়ি দাঁড় করিয়ে হুডুর মোড়ের পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান খেলো একটা। সঙ্গে একটু জর্দা। পান ক্বচিৎ-কদাচিৎ খায়। তবে যখন খায় তখন জর্দা দিয়েই খায়। নইলে, ঘাস-ঘাস লাগে। পান খাওয়াটা বাহানা। আসলে আঘাতটা সামলে উঠতে চাইছিলো। তখনও ওর দু'চোখের মণিতে হলুদ আর লাল ফুল ফুল সিল্কের শাড়ি-পরা ছিপছিপে, বুদ্ধিমতী কলির রৌদ্রোজ্জ্বল ছবিটি প্রতিফলিত ছিল। কলির অলক উড়ছিলো হাওয়াতে। এলোমেলো হাওয়াতে। দুরন্ত শাড়িকে ডানহাতে পায়ের কাছে নামিয়ে এনে শাসন করছিলো সে। পুরো দৃশ্যটিই কেমন

মেয়েলি, নরম ; নয়নাভিরাম। ভারী ভালো লেগে গেছে স্নিগ্ধর কলিকে। কিন্তু হলে কী হয় ! অগেকার দিন তো আর নেই। আজকালকার পুরুষ ও নারীর ভালো লাগতে পারে একে অন্যকে, ভালোবাসতেও পারে তারা দুজন দুজনকে, ভালোবাসছে যে তা না জেনেও ; কিন্তু মুখ ফুটে যে কিছুতেই বলতে পারে না, আমি তোমাকে···।)

সেই সব সহজ সারল্যের দিন মরে গেছে কবে। জীবন এখন বড়ই কমপ্লিকেটেড, কুটিল, আবর্তময় হয়ে গেছে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' এই প্রাগৈতিহাসিক সরল সত্যবন্ধ বাক্যটি কেউ যদি উচ্চারণ করতে পারেও তবে আজকাল তা যাত্রার ডায়ালগ্-এর মতোই শোনায় এবং যে শোনে সেও হয়তো ভাবে যে, এ বড় সস্তা ভালোবাসা !

পান খেয়ে গাড়িতে বসে ভাবছিলো 'মন্দার হোটেল'-এর স্নিগ্ধ যে, ও তো এলিজিবল্ ব্যাচেলরও নয়। প্রোজেক্টগুলো শুরু হলে তখন সে কভেটেবল্ ব্যাচেলর হবে। কোনো বাঙালীর মানসিকতা, ব্লু-প্রিন্ট, প্রোজেক্ট-রিপোর্ট এসবে বিশ্বাস করে না। জলজ্যান্ত প্রমাণ চায়। বহুতল বাড়ি হয়ে গেলে তখন ফ্ল্যাট কেনে, অনেক বেশি দাম দিয়ে। যখন আরম্ভ হয় তখন কেনবার সাহস করে না।

স্নিগ্ধ গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিলো যে কলি কি এতোই বোকা ! স্নিগ্ধর আজকের স্থিতিশীলতার অভাবটাই শুধু তার চোখে পড়লো ? তার চরিত্রর দৃঢ়তা, সে যে অন্য দশজনের মতো নয় ; এ সত্যটা কলির চোখ এড়িয়ে গেলো কি করে ? আশ্চর্য !

আশ্চর্য ! কত গেস্টসই তো এ হোটেলে এসেছেন এবং আসবেনও কিন্তু বিধুভূষণকে এরকম উতলা হতে এর আগে আর কখনওই দেখেনি স্নিগ্ধ।

অত তাড়াই বা কিসের এবারে ? 'দ্যা গ্রেট প্যাট্রিয়ার্ক' কি মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছেন ? শেষের দিন কি এগিয়ে এলো ?

এসে গেলাম দিদি আমরা ঝুমকার হাটে ! আমি কি আপনার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো ?

কেন ? মানে ?

না, যদি কিছু কেনো, তাহলে গিয়ে বয়ে নিয়ে আসবো।

কী কিনবো তারই তো ঠিক নেই। তাছাড়া বইবার মতো কিছু কেনার তো নেইও আমার দল্মা !

যাই হোক, আমি এই টিলাটার, এই যে ; এই বাঁয়ের টিলার চার গাছের নিচের ছায়ায়, ঐ চায়ের দোকানটার সামনে আছি। আপনার দরকার হলে ওদিকে তাকাবেন। হাত তুলবেন একটু। আমি ঠিক বুঝে নেবো।

আর রিকশাটা ? রিকশাটা রাখবে কোথায় ?

এই তো এই বটগাছের ছায়াতে।

তুমি খেয়ে এসেছো ?

হ্যাঁ। হ্যাঁ।

টাকা লাগবে ?

না, না ?

তাহলে আমি এগোই ?

হ্যাঁ, যান দিদি।

হাটের মধ্যে নেমে আসতেই ওর আলাদা, শহুরে, কোনো বিভেদকারী সত্তা আর রইলো না। ভীড়ের মধ্যে, মিশ্র শব্দের মধ্যে, নিজের দেশের মেয়ে-মরদের ঘামের আর সর্ষের ঘানির খোলের গন্ধের মধ্যে, দিশি মুরগির ডিম আর মোরগার গায়ের গন্ধেব মধ্যে বহুবর্ণা জামা কাপড়ের মেয়ে-পুরুষের মধ্যে ও নিজেকে ইচ্ছে করেই হারিয়ে দিলো।
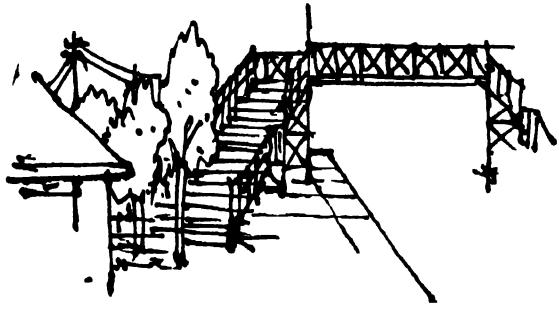
দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর পর্ণা ঘুম লাগিয়েছিলো। পাখির ডাকের মধ্যে কলকাতার সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকালের দৈনন্দিনতাতে কত ক্লান্তি যে জমে ওঠে সারা বছরে, তা বোঝা যায়, বাইরে এলে। এমন জায়গাতে বা জঙ্গলে এলে তো বোঝা যায়ই !

পাখিদের ডাকে সমস্ত শিরা-উপশিরা, ধমনী-উপধমনী, স্নায়ুরা সব যেন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ছুটি চাই ; ছুটি চাই। কলকাতায় যে কতখানি শব্দদূষণ ও ধোঁয়াধুলোর দূষণ আছে তা এখানের একটা ছোট্ট পাখির ডাকে কান পাতলে এবং সুনীল আকাশের দিকে চাইলেই বোঝা যায়। কলকাতার মানুষ অচিরেই সম্ভবত কোনো এক ভোরে উঠে দেখবে যে, তারা সকলেই একই সঙ্গে মরে গেছে ঘুমের মধ্যে।

সেদিনের দেরী নেই বেশি।

সাদা শাড়ি পরলে একদিনে শাড়ি কালো হয়ে যায়। ওর অফিসের পুরুষ সহকর্মীরা বলে যে, জামার কলারে কালো দাগ হয়ে যায় একদিনে। জামাতেও কালোর ছোপ।

একটু আগেই ওর ঘুম ভেঙে ছিলো। আলসেমি করছিলো শুয়ে শুয়ে। এমন সময়ে কে যেন দরজাতে বেল দিলো।

কালিদা ?

দরজা খুলে দেখলো, চা নিয়ে এসেছে কালিদা।

আমার বন্ধু কোথায় ?

তিনি তো ঝুমকার হাটে গেছেন দুপুরেই খেয়ে দেয়ে। আপনি তো খেলেনও না !

নাঃ। ভালো লাগছিলো না। ওমা ! এতো সব কী এনেছো ! কালিদা ?

প্রণয়বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

প্রণয়বাবু ফিরে এসেছেন ?

কোত্থেকে ?

কলকাতায় যাবেন বললেন যে !

হুঃ। প্রণয়বাবুর কথা! কোনটা রসিকতা আর কোনটা নয়, বোঝা ভারী মুশকিল।

তোমাদের ম্যানেজারবাবু কোথায় গেলেন? আমার বন্ধুর সঙ্গে নাকি?

না, তা নয়। উনি গাড়ি নিয়ে গেছেন টাটাতে।

টাটা যাওয়ার রাস্তায় কি ঝুমকার হাট পড়ে?

কালিদা ট্রেটা নামিয়ে রেখে একটু ভেবে বললো, হ্যাঁ তা পড়ে। ঝুমকা আর এখান থেকে কতটুকু রাস্তা! পাঁচ-সাত কিলোমিটার হবে বড় জোর।

তাই?

এঁজ্ঞে হ্যাঁ।

তা, এতো সব কি এনেছো?

দুপুরে খাননি তো!

তাই বলে এত্ত? আছে কি কি?

এই একটু মোহনভোগ, সুজিটা কড়া করে লাল করে ভেজে, মধ্যে ভালো গাওয়া ঘি, কিশমিশ, লবঙ্গ, দারচিনি দিয়ে।

বলেই, একটু থেমে বললো, আমাদের রহিম রাঁধে ভালো।

আঃ। আর কি?

আর এট্টু এঁচড়ের চপ। এঁচড় সবে উঠেছে তো।

আঃ। আর?

আর এট্টু পুদিনার চাটনি আর সাগুর পাঁপড়।

আর কিছু ছিলো না?

এঁজ্ঞে। আরো কিছু আনবো? চা আছে পটে।

আরো কিছু আনবে কি? আমি তো ভাবছি তোমাদের আসল কারবারটা কি। চোরাচালান-টালান করো না কি? অন্য কোনো ধান্দা না থাকলে তো এই 'মন্দার হোটেল' চলারই কথা নয়। মাথা খারাপ আছে তোমার বাবুদের! এ তো ব্যবসা নয়, লঙ্গরখানা। দাতব্য চিকিৎসালয়!

আমি যাই?

হ্যাঁ।

কালিদা চলে গেলো দরজা টেনে দিয়ে।

দারুণ করেছে কিন্তু মোহনভোগটা! দিদিমা ঠিক এমন করতেন। বিহারী কায়দায়। দিদিমা ভোলানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। যেদিন গান-টান হতো গুরুভাই গুরুবোনেরা সব আসতেন সেদিন। দিদিমা ঠিক এমনই মোহনভোগ রাঁধতেন সেদিন। অবশ্য সস্তার দিন ছিলো। এখন তো দারচিনি লবঙ্গ কিশমিশ-এর দাম জিজ্ঞেস করতে গিয়েই হার্ট-অ্যাটাক হয়। মা বকা-বকি করাতে গত সপ্তাহেই গেছিলো সন্ধেতে অফিস থেকে ফিরে। উরে বাবাঃ। কী করে যে সংসার চালায় মা, তা মা-ই জানে। কিন্তু কী করে যে 'মন্দার হোটেল' চলে সেটা আরো বড় আশ্চর্য। এই হোটেল এইভাবে চললে আর মাস দুয়েকের বেশি চলতেই পারে না। ও নিশ্চিত।

চা খেয়ে, শাড়িটা বদলে, একটি সিল্কের শাড়ি পরলো। তারপর বাথরুম

থেকে ঘুরে এসে মুখটা একটু ফ্রেশ করে নিয়েই বেরিয়ে পড়লো।

রিসেপ্শনে প্রণয় অথবা হন্সো কেউই ছিলো না।

কালিদা শুধোলো, যাওয়াটা কোন্দিকে হবে?

যেদিকে দু'চোখ যায়।

দু'চোখ তো সবদিকেই যায়। বলেন তো রিকশা ডেকে দিই? জানাশোনা।

পর্ণার মনে হলো এই কালিদা রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে কমিশন পায়। মানে, দালালি।

বললো, ঠিক আছে। দাও ঠিক করে।

তা যাবেন কোন্দিকে? ঝুম্কার দিকে? মানে, হাটে?

না, না। ওদিকে যাবো না। বলেইছি তো! যাবো, যেদিকে দু'চোখ যায়।

নিয়ে এলো রিকশাওয়ালা, কালিদা।

রিকশাওয়ালা একটু সন্দিগ্ধ চোখে চাইলো পর্ণার দিকে। তারপর পর্ণাকে রিকশায় চড়িয়ে 'রায়চৌধুরী লজ'-এর গেটটা পেরিয়েই বাঁদিকে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে বললো, স্টেশনের দিকে যাবেন? ভালো গোল-গাপ্পা বাটাটা-পুরীর দোকান আছে দিদি।

স্টেশনে এখন কোনো গাড়ি আসবে? মানে রেলগাড়ি?

স্টেশনে তো গাড়ি আসতে যেতে থাকেই! কোন্ গাড়ির কথা বলছেন?

না। কোনো বিশেষ ট্রেন নয়। যে-কোনো ট্রেন।

রিকশাওয়ালা মাথা পেছনে ঘুরিয়ে একবার দেখলো সওয়ারীকে। ভাবলো, মাথার গোলমাল-টোলমাল নেই তো!

মুখে বললো, টিশানের দিকেই যাবো তো?

হ্যাঁ। তাই চলো।

আসলে, ও যে এতোটা সময় ঘুমিয়েছিলো তা ঠিক বুঝতে পারিনি। সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। তবে চিন্তারও কারণ নেই। চাঁদ তো রোজই জোর হচ্ছে ক্রমশ। সন্ধের পরে নদপুরা জায়গাটার রূপই অন্যরকম হয়ে যায়। এমন আকাশ, এমন চাঁদের আলো, এমন সব মিশ্রগন্ধবাহী হাওয়া, এমন রাতচরা পাখির ডাকের কথা কলকাতায় বসে তো ভাবাই যায় না। মনটাই যেন কেমন অন্যরকম হয়ে যায় এমন চাঁদের রাতে। সব অভিযোগ, অনুযোগ ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। সকলকেই ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে। এমনকি সুবর্ণকেও। কলির সঙ্গে মান-অভিমানও করতে ইচ্ছে করে না। আসলে, পর্ণা আর কলির মধ্যে এমন বন্ধুত্ব যে, কলেজের মেয়েরা ঠাট্টা করে বলতো 'তোরা কি লেস্বিয়ান না কি রে?' আগেকার দিনে ঐ শব্দটির আজকের মতো এমন চল ছিলো না। কিন্তু কেন কে জানে, ঐ শব্দটি কেউ উচ্চারণ করলেই পর্ণার গা ঘিনঘিন করে। কলিও তাই বলে। অথচ পর্ণার ব্যক্তিগত জানাতেই এমন দুটি জুড়িকে ও জানে যারা কোনো পুরুষকে সহ্য করতে পারে না। দুজনে দিব্যি আছে ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া করে। ওয়ার্কিং-গার্লস।

স্টেশনের কাছে পেঁছে চাট-এর দোকানের দিকে যাচ্ছিলো রিকশা। পর্ণা-

বললো, না না, স্টেশনের দিকেই চলো।

স্টেশনের গেটে পৌঁছেই নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটতে গেলো। টিকিটবাবু বললেন, দরকার নেই। কেউই কাটে না এখানে। চলে যান ভিতরে।

যে-কোনো রেল স্টেশনে এলেই পর্ণার মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। মনে হয়, কত জায়গাতে যাওয়ার ছিলো; যাওয়া হলো না। কত অদেখা জায়গা দেখার ছিলো, দেখা হলো না। অথচ জীবন কী দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

সেদিনই অফিসের নীলিমাদি বলছিলেন: এখন বুঝতে পারবি না, দেখতে দেখতে বোঝবার আগেই পঞ্চাশে এসে পৌঁছলেই বুঝতে পারবি কী চট্ করেই না জীবনটা ফুরিয়ে গেলো রে পর্ণা। স্বপ্নের মতো মনে হবে সব কিছু। ছেলেবেলা, বাবা-মা, ভাই-বোনদের স্মৃতি, স্কুল-কলেজের জীবন, দাম্পত্য, অপত্যবোধের জীবন। তারপরই সব একে একে দূরে সরে যাবে আর তুই একা দাঁড়িয়ে থাকবি ধু-ধু প্রান্তরের একলা শিমুলের মতো দিনান্তবেলায়। হাওয়া উঠবে একটা চুপিসাড়ে, অনুচ্চে কথা বলবে অচেনা পাখি। তোর খুব অভিমান হবে সকলের উপরে। অভিমান হবে নিজের উপরে।

মনে হবে, জীবনটা ফুরিয়ে গেলো, অথচ তাকে নিয়ে করার মতো কিছু-মাত্রই করা হলো না আদৌ। কথাগুলি মিথ্যা অভ্যেসের বোঝা বয়ে 'সকলেই করে' এমন একাধিক জিনিস করে করে, দস্তুরের দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে এই একটিমাত্র জীবন শেষ হয়ে গেলো। দাঁত থাকতে যেমন মানুষে দাঁতের মর্যাদা বোঝেনা, জীবন থাকতেও তেমন জীবনের দাম বোঝে না কেউই!

পর্ণা বলেছিলো, তোমার এসব কথা বলা মানায় না নীলিমাদি! তোমার কী সুন্দর স্বামী!

নীলিমাদি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, হ্যাঁ, অন্যর স্বামী মাত্রই সুন্দর। সর্বগুণসম্পন্ন। আইডিয়াল!

তোমার অমন সোনার টুকরো ছেলে ও মেয়ে।

তা তারা সোনার টুকরো নিশ্চয়ই কিন্তু আমার তারা কেউ নয়। তাদের বাবারও নয়। হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্বার্থপর; কেরিয়ারিস্ট। ছেলে তো অ্যামেরিকা থেকে ফিরবেই না, অ্যামেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছে। গ্রীন কার্ড পেয়ে গেছে। মেয়ে তো থাকে বম্বেতে। দু-তিন বছরে একবার করে আসে। তাও এ-বছর আসবে না। নাতি-নাতনীরা মারাঠী বলে। অধিকাংশ বছরেই কলকাতায় আসতে পারে না, এই নোংরা, সুযোগ-সুবিধাহীন শহরে আসতে চায়ও না। হলিডেতে যায় বিদেশে। এবারে যাচ্ছে গ্রীস্-এ। পলকক্স-এর 'দ্যা আইল্যান্ড' ছবিটি দেখে গ্রীসভক্ত হয়ে উঠেছে খুবই আমার মেয়ে-জামাই।

আপনিও যান না।

আমি? আঁটবো না রে পর্ণা। Slot সব আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। আমরা সব old coin! নতুন Slot-এ ঢুকবেই না। এটা অনুযোগের কথা নয়, ঈর্ষার কথা নয় রে; এটা একেবারে স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট। ওরা অন্য জেনারেশান। কথায় কথায় সে-কথা ওরা বলেও। আমাদের সঙ্গে মেলে না

ওদের। তেলে-জলে মিশ খায় না।

তা আপনি আর সুবীরদাও হলিডেতে যান না কেন?

আলাদা করে?

হিহি।

সুন্দর হাসেন নীলিমাদি।

বললেন, তোর সুবীরদার হাঁটুতে, গোড়ালিতে, কোমরে বাত। সে তো বলতে পারিস একরকমের গৃহবন্দীই। তার উপর হার্টের গোলমাল আছে। বাইপাস করা উচিত, কিন্তু করতে রাজী হয় না। বলে, আমার জীবনের দাম কি? আমি কি সত্যজিৎ রায়? জীবনে করার মতো কিছুই করার না থাকলে খামোখা বেশি বেঁচে লাভটা কি? পৃথিবীতে বড় বেশি মানুষ হয়ে গেছে। কাজ ফুরোলেই চলে যাওয়া উচিত।

পর্ণা বলেছিলো, বাঃ রে! তা কেন? নিজের কাছে প্রত্যেকেরই নিজের জীবনের দাম থাকে। সবাইকে যে সত্যজিৎ রায় বা মহম্মদ আলি হতে হবেই তাব মানে কি আছে?

তাছাড়া, আমিও জোর করি না। সারাটা জীবন মানুষটা অফিসের পরও টিউশানি করে এবং ছুটির দিনে চার-চারটি টিউশানি করে ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে পড়িয়ে 'মানুষ' করলো। আনন্দ করার সময়ে কিছুই করতে পারিনি। তখন আমরা বছরে একদিন সিনেমাতেও যাইনি। ভেবেছিলাম, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে আমাদের স্যাক্রিফাইস-এর কথা বুঝবে। কিন্তু…

আমাদের সঙ্গে যাবেন নীলিমাদি? আমি আর আমার এক বন্ধু, সে খুব ভালো মেয়ে, ভালো লাগবে আপনার; নিদপুরা বলে একটি নন-ডেসক্রিপ্ট জায়গাতে যাবো। খুব নাকি ভালো জায়গাটা।' অথচ কলকাতার খুব কাছে। যাবেন?

নীলিমাদি ম্লান হেসেছিলেন। বলেছিলেন তোর সুবীরদা তো যেতে পারবেন না পর্ণা। বাষট্টি বছর বয়সেই উনি প্রায় পঙ্গুই হয়ে গেছেন বলতে গেলে।

বাঃ রে! সুবীরদা সাতটা দিন থাকতে পারবেন না একা? তাছাড়া কেষ্টই তো সব দেখাশোনা করে।

পর্ণা বলেছিলো।

না, না পারবেন না কেন? আমি যদি আগে মরে যাই তবে তো সারা জীবনই থাকতে হবে একাই।

তবে?

ওঁর দোষ কি? আমি যেমন কোথাওই যাইনি, কিছুই করিনি; উনিও তো করেন নি। নিজেরা সাধারণ স্কুলে পড়েছিলাম তাই জেদ ছিলো ছেলে মেয়েকে লা মার্টস্ আর লোরেটোতে পড়াবো। আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষাতে টিফিন নিয়ে যেতাম বাসে করে। তখনও এই চাকরিটি নিইনি। প্রয়োজন হয়নি। তারপর ওরা যেমন উঁচু ক্লাসে উঠতে লাগলো ওদের পড়াশুনোর বইপত্তর জামা-কাপড়চোপড়ের খরচাও তেমন বাড়তে লাগলো। ওঁর সব টিউশানির রোজগারেও

কুলোলো না। তখন আমি এই চাকরিটি নিলাম। তোদের মতো প্রফেশানাল কোয়ালিফিকেশান তো কিছু ছিলো না। সাধারণ এম. এ.। তাও ইতিহাসে। তবু ওঁর বস্-এর মুসাবিদাতেই চাকরিটা হয়েছিলো। তোর সুবীরদার আর আমার জীবন একই রকম, একতারে বাঁধা। ছেলেমেয়ে ছাড়া আমাদের কিছু-মাত্রই ছিল না জীবনে। ছেলেমেয়ে আমাদের ভুলে গেছে বলতে গেলে এখন। তাই এই হঠাৎ বিযুক্তির সঙ্গে কী করে কম্প্রোমাইজ করবো বুঝে উঠতে আমরা দিশেহারা। টিভি আছে। ঐ টিভিই আমাদের সব। যতটুকু সময় পাই ঐ ইডিয়ট-বক্সএর সামনে বসে থাকি।

টাকা পয়সাতো পাঠায় দুজনেই।

নীলিমাদির দু কানের লতি লাল হয়ে গেলো।

বললেন, পাঠায়, পাঠায়। ছেলে মেয়ের টাকায় বেঁচে থাকবোই বা কেন? চলে যাচ্ছে। চলে যাবে! কোনোই দুঃখ নেই আমাদের।

মিথ্যা কথা নীলিমাদি। দুঃখ নেই কোনো আপনাদের?

পর্ণা ওর চোখে চোখ রেখে বলেছিলো।

নীলিমাদির দু চোখ জলে ভরে এসেছিলো। অদ্ভুত এক স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠেছিলো ওঁর মুখে। বলেছিলেন, তুই অনেক ছোট পর্ণা, তোকে একটি কথা বলি। সুখ কখনও নিজের সুখ দিয়ে হয় না। পরের সুখটাই সুখ; তোর আসল সুখ। যে সব পাগলা মানুষ আজকের দিনেও দান ধ্যান করেন, নাম করবার জন্যে নয়; এমনই স্বভাব বলে, তাঁরা এ কথাটা জানেন। অন্যকে সুখী দেখার মধ্যে যে সুখ, সেই সুখ তুই নিজেকে সুখী করে কিছুতেই পাবি না। অন্য দশজনের সুখের মধ্যেই তোর সুখ লুকিয়ে থাকে। সরাসরি তা দেখা যায় না। বয়স হলে বুঝতে পারবি। নাতি নাতনীর ছবি দেখে যা সুখ, চিঠি পড়ে যা সুখ, তাদের টেপ-করা কবিতা ও গান ক্যাসেটে শুনে যা সুখ, সেই সুখ আমরা নিজেরা আর অন্য কী ভাবে পেতাম বল?

পর্ণা বলেছিলো। এটা একটা লেম এক্সকিউজ। নিজেদের ভুলিয়ে রাখার জন্যে মনগড়া Explanation। এটা সত্যি নয় নীলিমাদি। আমি বিশ্বাস করি না আপনার কথা।

সত্যিরে সত্যি। বিশ্বাস কর। সত্যি।

বলতে বলতে, নীলিমাদির চোখ জলে ভরে এসেছিলো। সেটা আনন্দে না দুঃখে তা এখনও পর্ণা বুঝতে পারে না।

এই সব ভাবতে ভাবতে ওভারব্রিজটার ওপরে উঠে এলো। সত্যি! কত মানুষের কতরকম দুঃখ থাকে, যা নিরসনের কোনো ক্ষমতাই অন্যর হাতে নেই। এতোজনের দুঃখের কথা ভাবলে নিজের কোনো দুঃখকেই আর বড় বা বিশেষ বলে মনে হয় না। নীলিমাদির কথা ভাবতে ভাবতে সুবর্ণর কথা মনের মধ্যে জড়িয়ে গেলো।

সুবর্ণ খুবই দুঃখ পেয়েছে। বেচারী। আসলে সে তো যা দাবী [illegible] নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর কাছেই জানিয়েছিলো। বিয়েই যদি করতে [illegible] তো ঐটুকু ঔদার্য পর্ণা দেখাতে পারলো না? পাগলামিই না হয় [illegible]!

সেটুকুও সইতে পারলো না? সুবর্ণ অফিস থেকে ফেরার সময়ে একেকদিন তার জন্যে একেকরকম খাবার নিয়ে আসতো। কী আনতো বলতো না আগে।

বলতো, গেসস্? গেসস করো তো।

ওর মধ্যে একটা ভীষণ মজার, আনপ্রেডিকটেবল্, জীবনকে-ভালোবাসা মানুষ ছিলো। তেমন মানুষ চারপাশে বেশি মেলে না। জীবনকে দারুণ ভালোবাসতো বলেই বোধহয় জীবনকে, শরীরকে নিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেন্টে ও বিশ্বাসী ছিলো! কে জানে! ভুল করলো কি পর্ণা?

একটা ট্রেন আসছে। কলকাতার দিক থেকেই। এখুনি সন্ধেও হয়ে যাবে। এই ট্রেনেই বোধহয় এসেছিলো ওরা। তবে সেদিন ট্রেন অনেক লেট ছিলো। ঝড়বৃষ্টিও ছিলো। আজ আকাশ পরিষ্কার। পশ্চিমের আকাশে জ্বলজ্বল করছে সন্ধ্যাতারা। সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিমে আর চাঁদ উঠছে পুবে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে দেখলে ট্রেনগুলোকে অদ্ভুত লাগে। স্টেশনের ঘণ্টি, কুলিদের হাঁক-ডাক, ফেরিওয়ালাদের চিৎকারের মধ্যে ট্রেনটা এসে গেলো। সবসুদ্ধু দশ-পনেরোজন যাত্রী নামলেন। তাদের দুজনের কোলে-কাঁখে হাঁস-মুরগি এবং পাঁঠা। একজনের ঝাঁপিতে সাপ। বোধহয় বেদেনী। মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থেকে ট্রেনটা চলে গেলো। আউটার সিগন্যাল পেরিয়ে যেতেই সিগন্যালের সবুজ বাতি আর ট্রেনের গার্ড-কামরার পেছনের লাল বাতিটি জ্বলজ্বল করতে লাগলো। একটু পর লাল বাতিটি ক্রমশ ছোট হতে হতে একটি পাহাড়ী বাঁকে মিলিয়ে গেলো।

সমস্ত প্লাটফর্ম, স্টেশন, রেল লাইনে এক নিবিড় নিস্তব্ধতা নেমে এলো। পর্ণা, যেখানে একটু আগে রেলগাড়ির পেছনের লাল আলোটি মিলিয়ে গেলো, সেই দিকেই চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। এই সান্ধ্য প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ধীরে ধীরে তার বুকের ভেতরে উঠে এলো।

পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো, কী হচ্ছে?

চমকে উঠলো ভীষণ ভয় পেয়ে, পর্ণা। একেবারে সুবর্ণর গলা। ও ঠিক এমনি করেই পেছন থেকে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতো, কী হচ্ছে?

চমকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলো, স্নিগ্ধ।

আপনি?

কিছুটা অবাক হওয়া, কিছুটা বিরক্তির গলাতে বললো পর্ণা।

তারপরেই বললো, আপনি এখানে কি করছেন?

মানুষ কত ইরেস্পনসিবল হয় তাই ভাবছি।

আমার কথা বলছেন? আমি কিন্তু রেলে কাটা পড়ে মরবো বলে ওভার-ব্রিজে এসে দাঁড়াইনি।

না। আপনার কথা বলিনি। এই ট্রেনেই আমার আটজন গেস্টস্ আসার কথা ছিলো। তাদের জন্যেই টাটাতে গেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, পিটার স্কট হুইস্কি আর ব্ল্যাক লেবেল বিয়ার ছাড়া কিছু ছোঁন না তারা। রাতের রান্নাও প্রায় হয়ে এলো। আর দেখুন! হাইট অফ ইরেসপন্সিবিলিটি।

চার্জ করে বিল পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা তো আছেই।

তাঁরা আবার বিনা পয়সার গেস্টস্। পাটনার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কলকাতার বস্ এবং তাঁর ফ্যামিলি। তাঁদের ফার্স্ট ক্লাসের আটখানা টিকিটও আমি প্রণয়কে কলকাতায় পাঠিয়ে বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। আর দেখুন!

কী করবেন এখন?

চিন্তার গলায় বললো পর্ণা।

কী আবার করবো? রান্না যা হবে তা আপনাদের জোর করে খাওয়াবো। হেমব্রমকে ডেকে পাঠাবো। কালিদারা খাবে। সেটা কথা নয়। কথা হচ্ছে, ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা বারে বারে পুট-অফফ্ হয়ে যাওয়াতে আমার ভারী খারাপ লাগছে। এই ন্যাশানালাইজড ব্যাঙ্কের অধিকাংশই যেরকম হয়েছে, তাতে মনে হয় না যে এরা চায় দেশে গ্রান্ড-স্কেল, লার্জ-স্কেল, স্মল-স্কেল কোনো ইন্ডাস্ট্রিই হোক। এর চেয়ে যে-কোনো বিদেশি ব্যাঙ্কের ব্যবহার, আন্তরিকতা, কমিটমেন্ট ভালো এবং বেশি। আমি সীরিয়াসলি ভাবছি, চলে যাবো গ্রিন্ডলেজ-এ লক-স্টক-ব্যারেল নিয়ে। এনাফ ইজ এনাফ। আর পারা যাচ্ছে না। কী ব্যবহার! যেন সব জমিদার। হাতে মাথা কাটছে সবাই। কাজের বেলাতে লবডংকা আর শুধু এই আনো আর সেই আনো।

আপনি কি ঝুমকার হাটে গেছিলেন?

না। বললাম যে, টাটাতে গেছিলাম।

দেখা হয়নি আমার বন্ধুর সঙ্গে?

ও হ্যাঁ। তা হয়েছিলো। যাবার সময়ে। ঝুমকার হাটের একটু আগে।

আপনার গাড়ি নিয়ে যাননি?

হ্যাঁ।

কোথায় গাড়ি?

ঐ তো।

দেখিনি তো। কখন এলেন? শব্দও পাইনি। গাড়ি তো আপনার নিঃশব্দ নয়!

ঐ ট্রেন আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পৌঁছলাম। সেই শব্দেই···

আমার বন্ধুকে নিয়ে গেলেই পারতেন টাটাতে।

নীলিমাদির কথাগুলো যেন ওর কানে বেজে উঠলো। পরের সুখকে নিজের সুখ করে নেওয়ার মতো সুখ আর কিছু নেই। আহা বেচারী কলি! নাহয় একটু সুখীই হতো!

বলেছিলাম। তা উনি রাজি হলেন না। বললেন, হাট করতে এসেছেন, টাটায় গিয়ে কী করবেন? আসলে আপনি ছিলেন না তো; থাকলে হয়তো যেতেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম না! কী লজ্জার কথা; আপনি ক্ষমা করেছেন তো?

আমি কে ক্ষমা করার? তাছাড়া খারাপ কাজ তো আপনি কিছু করেননি। দোষ যদি কিছু থাকে, তা তো প্রণয়ের।

তিনি কি সত্যিই রেসিগনেশান দিয়ে চলে গেলেন ? আজই বিকেলে কলকাতায় যাবেন বলেছিলেন। তাই ভাবলাম, স্টেশনে এসে যদি তাঁকে আটকানো যায়।

স্নিগ্ধ হো হো করে হেসে উঠলো।

হাসি দেখেই বোঝা যায় মানুষটি খুব উদার। ছিঁক্ ছিঁক্ করে ছুঁচোর মতো হাসেন না।

স্নিগ্ধ বললো, ও হচ্ছে গ্রেটেস্ট ইমপোস্টার অন আর্থ। ও এসব বলেছে বুঝি আপনাকে ? সত্যি ! ইন্‌করিজিবল্।

না। দোষ তো আমারই।

কোনো দোষ হয়নি। যদিও আমি নিজে মদ খাই না কিন্তু যেসব মানুষে গুনে গুনে মদ খান তাঁরা যে মানুষ বিশেষ সুবিধের হন না তা আমি লক্ষ করেছি।

কী করে বুঝলেন ?

না, সেইসব মানুষের লুকিয়ে রাখার কিছু থাকে। পাছে বেসামাল হয়ে সেসব কথা বলে ফেলেন অথবা নিজের ভিতর থেকে আসল নোংরা চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে ইমেজ নষ্ট করে দেয়, সেই ভয়েই খান না। বেশ করেছেন আপনি। আবার করবেন। এ কী অফিসের বস্‌এর পার্টি যে, অত সাবধান হতে হবে ? বেড়াতে আসা কেন তাহলে ? রোজকার রুটিন ভাঙার আরেক নামই তো ছুটি। অসময়ে চান করবেন, অসময়ে খাবেন, অসময়ে ঘুমোবেন, না-গুনে জিন্ খাবেন, তা না হলে ফিরে গিয়ে আবার জোয়ালে জুতবেন কেমন করে ? মাঝে-মাঝেই অভ্যেসকে, নিয়মকে যাঁরা না ভাঙেন তাঁরা কোনো-দিনই নিয়মানুবর্তী হতে পারেন না। এ আমার দেখা আছে।

বাবা', আপনার মতামত, পছন্দ-অপছন্দ তো খুব স্ট্রং দেখছি।

যা বলেন। তা, এখন ফেরা হবে তো ?

আমার যে রিকশা আছে।

সত্যি ! আপনারা দুজনেই একরকম। দেখছি, রিকশাই আপনাদের দুজনের জীবনেরই fixation.

পর্ণা হাসলো। বললো, বন্ধু আপনার গাড়িতে চড়লো না হয়তো আমারই ভয়ে। আমারও কি ভয়ডর বলে কিছু নেই ?

স্নিগ্ধ আবার হাসলো হো হো করে।

বললো, ঠিক আছে। কাল আবার দুজনকে একসঙ্গে করে কোথাও যাওয়া যাবে।

আর অন্যজন ?

প্রণয় ? হ্যাঁ, সে তো থাকবেই। সে না থাকলে হাসাবে কে ?

খুব মজার মানুষ কিন্তু।

খুব ভালো ছেলো। ওর মতো বন্ধু পেয়েছি এ আমার পরম আনন্দ। জানেন তো, নিজের চেয়ে অবস্থাপন্ন, সৌভাগ্যবান মানুষের প্রকৃত বন্ধু হতে হৃদয়ের প্রচণ্ড ঔদার্যর প্রয়োজন হয়। স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ক্ষুদ্র মানুষই এতো বড় মাপের হয়ে উঠতে পারে না।

কলি এতো আনন্দ বহুদিন পায়নি।

নিজে কোনো কথা না বলে অগণ্য অচেনা মানুষের কিছু বোধ্য, কিছু দুর্বোধ্য কথার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে এ-দোকান থেকে সে-দোকান, সে-দোকান থেকে এ-দোকান করে কিছু কিনে, কিছু নেড়েচেড়ে ; কী করে যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো বুঝতেই পারলো না।

একটু পরেই দিন ফুরোবে।

জীবনও বোধহয় এমনি করেই ফুরিয়ে যায়। অনবধানে। কিছু কিনে, কিছু নেড়েচেড়ে, আর কিছুর প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি মেলে, এক সময়ে হঠাৎই উপলব্ধি করতে হয় যে, বেলা পড়ে গেছে। কত কিছুই কেনা হলো না, নাড়াচাড়া হলো না, আলো-ঝলমল কত দোকানে ঢোকা পর্যন্ত হলো না।

তীব্র অভিলাষের কত কিছুই অনিচ্ছায় ছেড়ে আসতে হলো অবধানে এবং অনবধানে ; এই জীবনে।

কলির খুবই ভালো লেগেছিলো চারদিকে এতো হাসি-মুখ দেখে। কারো কাঁখে বা পিঠে শিশু। কারো হাতে কেরোসিনের তেলের শিশি। কারো হাতে মোরগা, পা-বাঁধা ; মাথা-নিচু করে ঝোলানো। কারো হাতে এঁচড়। কেউ ছাগল-পাঁঠা বেচছে, কেউ কচি আম, কেউ-বা গোড়, তীব্রগন্ধী জংলী লেবু ; ওদের যৌবনেরই গন্ধ যে, লেবুর গায়ে।

তেল চুঁইয়ে পড়ছে কপালে কপালে। দগদগে ম্যাঙ্গানীজ মাইনের খোঁদলের মতো লালরঙা সিঁদুর, সিঁথিতে। সিঁদুরের টিপ কপালেও। এখানের মেয়েরা বিবাহিতা হয়েও সেই বন্ধনের চিহ্নটা লুকিয়ে রাখতে চায় না সযতনে। কলিদের কলকাতায় আজকাল মোটামুটি মধ্যবিত্তদের সমাজে তো সিঁদুরের ব্যবহার উঠেই গেছে! কী কপালে, কী সিঁথিতে!

আস্তে আস্তে দলমা যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলো, সেদিকে এগোতে লাগলো কলি। দেখলো, বটগাছের ছায়াটা দীর্ঘ হয়েছে। একটু পরই সন্ধে হবে।

দলমা ওকে দেখতে পেয়েই টিলাটা থেকে নেমে এলো। বটগাছের তলা ছেড়ে।

হাট করা হলো দিদি ?

হ্যাঁ।

চা খেয়েছেন !

না। কোথায় ভালো চা পাওয়া যায় ?

ভালো চা মানে, আমাদের মতো ভালো। আপনাদের খাওয়ার ... এখানে কোথায় পাবেন ? চলুন, রিকশাতে বসুন, নিয়ে যাচ্ছি আমি।

চায়ের সঙ্গে টা পাওয়া যাবে ?

টা ?

শব্দটার মানে না বুঝতে পেরে তাকালো দলমা কলির দিকে।

'টা' মানে চায়ের সঙ্গে খাবার মতন কিছু। নোনতা।

দলমা হেসে বললো, পকোড়া খাবেন ?

কোথায় ?

ও চায়ের দোকানেই পাওয়া যাবে।

চলো।

দলমা ফেরার পথ ধরলো।

হাটে প্রায় সকলেই মহুয়া খেয়েছে। শালপাতার দোনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারদিকে। সকলেই হাসছে। কেউ কেউ উঁচু গলায় কথা বলছে। কোথাও বা মুরগি লড়াই হচ্ছে। কলি ভাবছিলো, যে ওরাও মুরগি। তানার সঙ্গে বাঁধা ছুরি নিয়ে অনুক্ষণ লড়াই করে যাচ্ছে, রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ; অথচ পাশে-থাকা মানুষও জানতে পাচ্ছে না।

কোথাও বা ওরা গাছতলায় বসে জমিয়ে মহুয়া খাচ্ছে। এখন খাবে বহুক্ষণ। কেউবা চুট্টা ফুঁকছে বসে বসে।

দলমা রিকশা দাঁড় করালো হাটটা যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানে।

বললো, আপনি রিকশাতেই বসুন। আমি এনে দিচ্ছি।

একটু পরেই শালপাতার দোনাতে করে গরম গরম ফুলুরি এনে দিলো দল্‌মা। নানারকম সবজি, ব্যাসন দিয়ে ভাজা। কাঁচলঙ্কার কুচি দেওয়া। বেশ ঝাল। কিন্তু সুস্বাদু। গেলাসে করে চা-ও এনে দিলো একটি ছোট্ট ছেলে। গুঁড়ো চা। চামড়া-পোড়া গন্ধ তাতে। কিন্তর দুধ ও চিনি ঢেলে তাকে পেয় করা হয়েছে। তাই খেলো, তারিয়ে তারিয়ে। পশ্চিমাকাশে সূর্য ডুবছে। পূবাকাশে চাঁদ উঠছে থালার মতো। চা আর পকোড়া খাওয়া শেষ হলে, কলি বললো, তুমি খেলে না ? দল্‌মা ?

আমি তো ওখানেই খেয়ে নিলম।

পয়সা নিয়ে যাও। কত ?

পঁচাত্তর পয়সা। পঁচিশ পয়সা চা আর পঞ্চাশ পয়সা ফুলুরি।

আর তোমার ?

আমি আমার পয়সা দিয়ে দিয়েছি।

আহা ! কেন দিলে ?

একটা টাকা দিয়ে কলি বললো, দোকানের ঐ ছোট ছেলেটাকে দিয়ে দিও

পঁচিশ পয়সা।

দলমা গিয়ে পয়সা দিতেই ছেলেটি এসে দাঁড়ালো রিকশার পাশে। বললো. কি হবে? পয়সা?

তোমাকে দিলাম বকশিস।

না, না। আমি বকশিস নিই না। মালিক বকবে।

কলির রাগ হলো। ভাবলো, দিনে দশ ঘণ্টা খাটিয়ে নিচ্ছে হয়তো একটু খাওয়ার বিনিময়ে, তাও আবার ওরা দু'পয়সা উপরি পেলেও খবরদারি!

মুখে বললো, কেন বকবে? তুমি তো চাওনি। আমিই দিয়েছি।

না। তাহলেও! বকবে মালিক।

কলি নিরুপায়ে পয়সা ফেরত নিলো। ভাবছিলো, কলকাতার কোনো বাজে রেস্টুরেন্টেও বেয়ারারা কেমন লোলুপ চোখে চেঞ্জের দিকে তাকায়। বকশিস দিলেও সেলাম করে না। তাদের মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। দু টাকা দিলে, পাঁচ টাকার লোভে তাকিয়ে থাকে। বকশিস যে ব্যবহারের দ্বারাই অর্জন করতে হয়, তা যে কোনো ন্যায্য দাবী নয়; এ-কথাটা কলকাতা শহরের মানুষে বোধহয় ভুলেই গেছে। বেয়ারা থেকে করণিক, করণিক থেকে অফিসারেরা, সকলেই ভুলে গেছেন। বকশিস এর নাম বিভিন্ন, বিভিন্ন স্তরে। কিন্তু সকলের মানসিকতাই এক। মাইনেটাই উপরি আর উপরিটাই ন্যায্য পাওনা হয়ে গেছে এখন। তাই ভারী ভালো লাগলো কলির ঝুমকার হাটের ঝুপড়ির দোকানের ছেলেটির ঐরকম ব্যবহার। ছেলেটির পরনে একটি ছেঁড়া খাকি-প্যান্ট। বগল-ছেঁড়া কালো সুতির গেঞ্জি একটি। কিন্তু গেঞ্জির কালিমা তার হাসিকে কালো করতে পারেনি একটুও।

দলমা শুধোলো, এবারে যাবো?

কলি বললো, চলো। একেবারেই আলো পড়ে গেছে। ছায়ারা ঝুপড়ি হয়েছে। একটি মৃদু হাওয়াতে, পিচের পথে পথের দু পাশের পাথরে শুকনো পাতা মচমচ শব্দ করে নড়াচড়া করছে।

কলি পায়ের কাছে নামিয়ে রেখেছে হাট-করা সামগ্রী। গরুর গলার ঘন্টা, কাঁচের চুড়ি, জংলী ঘাস দিয়ে বানানো ছোট দুটি চুবড়ি, পেতলের আর রুপোর টুকটাক গয়না। নানারঙা রঙিন রেকটাঙ্গুলার পাথরের মালা, গরুর গলার। নিজেরা সাজবার এবং ঘর সাজাবার কত কী জিনিস।

একটু এগোতেই চাঁদের আলো স্পষ্ট হলো। কিঁচির কিঁচির শব্দ করে চলছে রিকশা। মাঝে মাঝে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাচ্ছে দলমা। উল্টো করে আটকানো, উল্টো করে বসানো একটি পেতলের বাটিতে লোহার শিক দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে শব্দ করছে আর তার সঙ্গে মুখেও নানারকম শব্দ করছে।

আস্তে! একী! পাশ দাও হে বুড়ো! এতো তাড়া কিসের হে তোমার? ইত্যাদি।

একটু পরই ফাঁকাতে এসে পড়লো। এখন এলোমেলো হাওয়াতে চাঁদের কুচি উড়তে লেগেছে অভ্রকুচিরই মতো। ঝকঝক করছে নীলাকাশ। নানা মিশ্র গন্ধ ভেসে আসছে পাহাড়ের দিক থেকে দ্রুত ছুটে-আসা হাওয়ায়।

নানাকথা ভাবতে ভাবতে চলেছে কলি। এমন নিরবচ্ছিন্ন, বিরক্তিহীন, অছিদ্রিত ভাবনা কলকাতাতে বসে ভাবাই যায় না। মন এখানে যে-কোনো বিষয়েই কেন্দ্রীভূত হয়, তাকে কেন্দ্রীভূত করতে চাইলেই। কাজ, ঘড়ি, টেলিফোন, আগে না-জানিয়ে-আসা অতিথি, কেউই নিজের নির্লিপ্তিকে বিস্রস্ত করে না। ভারী ভালো লাগে তাই।

টাটা এখান থেকে কতদূর ?

কী জায়গা ?

টাটা। জামশেদপুর।

ও। তা অনেক দূর।

তোমাদের ম্যানেজারবাবু কি এই পথেই ফিরবেন ?

তিনি তো ফিরে গেছেন সেই কখন।

তাই ? কখন ? তুমি দেখেছো ?

হ্যাঁ। তখন তো আপনি হাটের একেবারে অন্যকোণে। এই ঘণ্টাখানেক আগে হবে। ম্যানেজার ছিদোঁবাবু গাড়ি থামিয়ে আপনাকে কিছুক্ষণ খুঁজে আবার গাড়ি স্টার্ট করে চলে গেলেন।

তোমাকে বললেন না কিছু ?

আমাকে ? নাঃ। আমার সঙ্গে তো দরকার ছিলো না কিছু।

একটু চুপ করে থেকে, কলি বললো, এঁরা লোক কেমন ?

কিন্তু কথাটা শুধিয়েই লজ্জা পেলো খুব নিজেই। কে জানে, কী ভাবলো দলমা।

কলি তো এসেছে দুদিনের জন্যে। এই দলমারা তো স্নিগ্ধদের অনেকই কাছের লোক।

কারা ?

একটু অবাক হয়ে বললো দলমা ?

মানে, তোমাদের এই ম্যানেজারবাবুরা।

ওঁরা দেও দিদি। মানে আপনাদের ভাষাতে দেবতুল্য মানুষ। উনি, ওঁর বাবা, ওঁর দাদু সবাই। সবাই দেও। কেউ বড়হা দেও, কেউ বুড়হা দেও এই যা।

ওঁর বাবাকে তুমি দেখেছো ?

কার ?

আহা। স্নিগ্ধবাবুর।

হ্যাঁ। দেখবো না কেন ? তখন তো আমি খুবই ছোট। পকেট ভর্তি চকোলেট থাকতো তাঁর যখনই পথে বেরুতেন তখনই। আমাদের দেখলেই পকেট থেকে মুঠো মুঠো চকোলেট বের করে দিতেন। তখনকার দিনে চকোলেট, এদিকের কেন, অনেক জায়গার ছেলে-মেয়েরাই চোখে দেখেনি।

তোমাকে উনি চিনতেন ?

আমাকে কী করে চিনবেন! এরকম কত বাচ্চাই তো ছিলো চিকনডিহি, নিদপুরা আর তার আশেপাশে। তবে আমার বাবা ওঁকে চিনতেন। উনিও

চিনতেন বাবাকে। নাম ধরে ডাকতেন।

কী করে।

বাবা খুব ভালো শিকারী ছিলেন। বাবা ওঁর সঙ্গে শিকারে যেতেন। চিকনাডিহ্, হুলুক পাত্থর, রুমাঝুমা, হিল্‌কিহেতু, কত্ত জায়গায় জঙ্গলে, দল্‌মা পাহাড়ে। যেদিন হুলোয়া হতো প্রত্যেক হুলোয়া করনেওয়ালাকে বাবু ভোজ খাওয়াতেন।

শিকারটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার।

একটু বিরক্তির গলাতে বললো ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের আজীবন সদস্য কলি।

কে বলেছে? আপনাকে এ খবরটি কে দিলো?

রাগের গলাতে বললো দল্‌মা।

সকলেই বলে! তাছাড়া, তোমরা কী জানো? কতটুকু জানো? তোমরা কি ইকোলজি বোঝ? না, গ্রীন-হাউস এফেক্ট? না; এসব কথা তোমাদের সঙ্গে···

ভাবলো, কোথায় কী বলছে! উলুবনে মুক্তো ছড়ানো!

তারপর বললো, তোমরাই তো সর্বনাশ করলে বনের পশুদের, পাখিদের। আর তোমাদের ঐ বাবুরা, স্নিগ্ধবাবুর বাবারা আর তারা নিজেরা।

বাজে কথা, একেবারেই। আমরা আদিবাসী। দল্‌মা ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে বললো। জঙ্গলেরই মানুষ আমরা। শিকার তো পৃথিবীর পত্তন যতদিন হয়েছে, ততদিন থেকেই আছে। সর্বনাশ, শিকার বা শিকারীরা করেনি, করেছে সরকারের আমলারা আর দেশের লোভীরা। ব্রিটিশের আমলে আইন-কানুনের কত্ত কড়াকড়ি ছিলো। বাবার কাছে শুনেছি; কারোরই সাহস ছিলো না তখন একটি বাড়তি গাছ কাটে বা একটি বাড়তি জানোয়ার শিকার করে। সকলেই নিয়ম মেনে চলতো তখন। দেশ যেই স্বাধীন হলো সঙ্গে সঙ্গে সকলেই স্বাধীন হয়ে গেলো। আইনের ভয় চলে গেলো। শাস্তির ভয় চলে গেলো, পুলিশের ভয় চলে গেলো, আমলাদের ঘুষ খাইয়ে ঠিকাদারেরা ইচ্ছেমতো বনজঙ্গল সাফ করে দিতে লাগলো। ইচ্ছেমতো জানোয়ার মারতে লাগলো পেশাদার শিকারীরা, ব্যবসাদারদের টাকা খেয়ে, দেশে বিদেশে চামড়া বিক্রি করার জন্যে। কেউই দেখবার রইলো না।

অই?

না তো কি? জঙ্গলে থাকলেই না আপনি জানতেন কিসে কী হয়!

তারপর বললো, যারা সত্যিকারের ভালো শিকারী তারা চিরদিনই নিয়ম মেনেই শিকার করেছে। তারা বনজঙ্গলকে, তারা পশুপাখিকে জানতো, ভালো বাসতো। শিকার কী জিনিস তা যারা জানে না তারাই আমাদের মিছিমিছি দোষে। এখন তো বই পড়ে আর চৌপাইয়ে শুয়ে বা ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে বসে সকলেই রাজা-উজির মারে। সকলেই সব জেনে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে চরা-ফিরা-করা ঘরের গরুর ডাক শুনেই যাদের নাড়ি ছেড়ে যাবে তারাই এখন

সব বাঘ-বিশারদ হয়ে উঠেছে। যারা শিকারীদের বুট পালিশ করতো, গা মালিশ করতো, বন্দুক-রাইফেল, জলের বোতল, খাওয়ার বেতের ঝুড়ি সব বয়ে নিয়ে যেতো, তারাই এখন শিকারীদের শ্রাদ্ধ করে। হাসি পায় লোকগুলোকে দেখে। শিকার মানে কি শুধুই তীর চালানো বা বন্দুকের ঘোড়া টানা? ওরা কিছুই জানে না বলেই ওরকম কথা বলে। ঐ ধরনের মানুষ চিরদিনই সব বিষয়েই অমন সবজান্তাগিরি করে এসেছে। ওদের কথা শোনাটাই আমাদের মূর্খামি।

বাবাঃ! তোমাকে তো কথাটা বলাই ভুল হয়েছে দেখছি। এতো রেগে যাবে জানবো কি করে?

কলি বললো, অ্যাপলজেটিকলি।

তা নয়। তবে আমরা আদিবাসী। শিকার আর বনই তো আমাদের জীবন। কেউ শিকার নিয়ে কিছু বললে তাই মাথাতে রক্ত চড়ে যায়। আমাদের নিজেদের জীবনে তো কোনো আনন্দেরই অভাব ছিলো না। কী ভালো আর কী ভালো না, তা বাইরে থেকে জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে শহুরে মানুষেরা। সকলের ভালোমন্দ কী এক? আপনার সুখ আর আমার সুখ কি এক?

ঠিক আছে। আর বলবো না। এবারে বলো, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

কলি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললো।

দল্‌মা একটা ছোট চড়াই ওঠে, একটু দম নিয়ে; তারপর বললো, মা।

বৌ নেই?

ছিলো। কিন্তুক এখন নেই।

সে কী? গেলো কোথায়?

সে এখন হুকু রাপাজ-এর সঙ্গে থাকে। আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আজকে এসেছিলো তো হাটে। হুকু, আমি তার ও অনেক গল্প করলম বসে, বিড়ি খেলম, ওরা তো এখনও রয়ে গেলো। মোরগা-লড়াই দেখছে, মহুয়া খাচ্ছে।

হুকু রাপাজ-এর সঙ্গে চলে গেলো কেন? হুকু রাপাজ-এর কি আছে, যা তোমার ছিলো না?

হাঃ।

হাসলো দল্‌মা।

বললো, কার যে কী থাকে, আর কার যে কোথায় কতটুকু খাম্‌তি তা স্বামী-স্ত্রীই বলতে পারে। বাইরের মানুষে জানবে কি করে?

তোমার কষ্ট হয় না?

কষ্ট? কষ্ট কেন হবে? এই দিশুম্‌ সেই দিশুম্‌-এ মেয়ের কি অভাব? তাছাড়া বুধির সঙ্গে তো আমার কোনো ঝগড়া ছিলো না। একদিন হঠাৎ কার্মা নাচের আসরে ওদের পীরিত হয়ে গেলো। মানুষে সব লুকোতে পারে শুধু পারে না পীরিত আর নেশা। ধরা ঠিকই পড়ে যায়। দেখলাম হুকুর জন্যি বুধি খুবই কষ্ট পাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হলো, রোগা হয়ে যেতে

লাগলো। অথচ আমিও ওকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলাম একদিন। ও-ও খারাপ বাসেনি। বুঝলাম যে, আমার ভালোবাসাটা অতোখানি ভালোবাসা ছিলো না। বুধি লজ্জাও পেতো খুব। তাছাড়া হুকু তো আমারও ছেলেবেলার বন্ধু। তাই ছেড়েই দিলম ওকে। যা রে যা। যার পায়রা, তার ঘরে যা।

তুমি আবার বিয়ে করবে না?

করবো, তাড়া কিসের? মেয়ের কি অভাব নাকি? যেদিন দুজনের দুজনকে পছন্দ হয়ে যাবে, সেদিনই করবো।

ও!

কলি, সংক্ষিপ্ত স্বরে বললো! একটি শ্বাসও পড়লো ওর। সাইকেল রিকশার আওয়াজে শোনা গেলো না তা।

ভাবছিলো, পর্ণা সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। ডিভোর্স হয়ে যাওয়া মানেই যে জীবন শেষ হয়ে যাওয়া, তা আদৌ নয়! জীবন অন্য বাঁক নিয়ে চললো, শুধু, নতুন করে।

সামনেই অন্য একটা পথ ডানদিক থেকে এসে এ পথে পড়েছে। অনেক দূরে উদোম মাঠের মধ্যে ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের লাল আলোটা দেখা যাচ্ছে। স্টেশনের আলো। ঐ পথটা স্টেশনের দিক থেকেই এসেছে। দেখলো, একটা রিকশা আসছে ঐ পথ বেয়েই।

দলমা হঠাৎই বললো, ছোট্ট জীবন দিদি। এই জীবনে সকলেরই সুখে থাকাটা বড্ডই দরকার। একজন মানুষের উপরে তো অন্য মানুষের সুখ নির্ভর করে না। বুধি, হোকই না হুকুকে নিয়ে সুখী! আমি অন্য মেয়ে দেখে লিবো। সুখের অভাব কথায়? এই চাঁদের আলোরই মতো, শিমুলের বীজ-ফাটা তুলোরই মতো, সুখতো ভেসে বেড়াচ্ছে সব্ব দিশুম-এ। হাত বাড়ালেই হলো। ওর জন্যি এতো মারামারির দরকারটা কি? হুকু আর বুধির অসুখ হলে কি আমার সুখ বাড়তো? কি দিদি? তব্বে? এই হচ্ছে আসল কথা। শুধু নিজের সুখেই সুখ হয় না দিদি। সকলে সুখী হলেই আসল সুখ।

ঐ পথের রিকশাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো মোড়ের দিকে।

পর্ণা চেঁচিয়ে বললো, বাবাঃ। হাট করলি বটে তুই! আমি তো ভেবেছিলাম তোর পেছনে দশজন মানুষ তোর সওদা বয়ে নিয়ে আসবে। সারাটা দিন করলিটা কি?

'তা সওদা কিছু কম করিনি।

বললো কলি।

তাই? কই, খুব বেশি কিছু এনেছিস বলে তো মনে হচ্ছে না।

সবকিছুই কি চোখে দেখা যায়? না হাতে ধরা যায়?

তা অবশ্য ঠিক।

তুই কী করলি সারাদিন? ঘুমোলি, পড়ে পড়ে?

দুটো রিকশা পাশাপাশি চলতে লাগলো।

পর্ণা বললো, খাবি নাকি? ভেলপুরী? তোর জন্যেই এনেছি।

ফিরে গিয়ে ওজন নিলে 'মন্দার হোটেল'-এর ওপরে রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে হবে।

সে যা হবে তা হবে। 'ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মর্তমান মাটি করিও না।'

কলি হেসে উঠলো পর্ণার কথাতে। ওদের স্কুলের গেমস টিচার অনুরূপাদি এমন করে বলতেন। বর্তমানকে 'মর্তমান' বলতেন। কিছু মনেও থাকে বটে পর্ণার!

এই যে!

বলেই, এগিয়ে দিলো হাতটা পর্ণা ওর রিকশাতে বসেই।

কলি হাত বাড়িয়ে ভেলপুরী নিতে নিতে বললো, কী করলি সারাটা দিন, বললি না? তুই?

এপাশ ওপাশ করে ঘুমোলাম। তারপর জম্পেস্ করে চা আর দশপদ 'টা' খেয়ে স্টেশনের দিকে গেছিলাম।

দশপদ 'টা' মানে?

সে তুই কালিদাকে জিগগেস করিস।

কেন? স্টেশনে কেন? সেখানে কি?

এমনিই!

প্রণয়বাবুর সঙ্গে দেখা হলো কি? উনি কি সত্যিই চলে গেলেন কলকাতা?

দেখা তো হয় নি। তবে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে হলো। স্নিগ্ধবাবু।

উনি কী করতে গেছিলেন স্টেশনে? গলায় জোর করে উদাসীনতা এনে শুধোলো কলি।

ঔৎসুক্য চাপতে গিয়েও চাপতে পারলো না।

তা কী করে বললো! ওভারব্রিজের ওপর থেকে কলকাতা থেকে আসা ট্রেনের নিচে লাফিয়ে পড়ে সম্ভবত আত্মহত্যার মতলব আঁটছিলেন স্নিগ্ধবাবু। এমন সময়ে, আমি গিয়ে পড়ায়…।

তবুও উদাসীন গলাতে কলি বললো, তোর সবতাতেই ইয়ার্কি।

ইয়ার্কি নয় সখী, ইয়ার্কি একদমই নয়। মন তার, দেখলাম, খুবই খারাপ।

কেন? মন খারাপ কেন?

তা কী করে বললো? মানুষের মন, আর হাঁসের পেট; কখন খারাপ হয় তা কে বলতে পারে?

কলি হেসে উঠলো পর্ণার কথায়। হাসতে ইচ্ছা না করলেও। কারণ কথাটা পর্ণার নয়, প্রণয়ের। একদিন কথায় কথায় বলেছিলো।' প্রণয়ের সব কথারই এমনই ছিরি। গ্রাম্যতা দোষ আছে ছেলেটার কিন্তু কথাগুলি শুনতে মজাই লাগে। বিশেষ করে এইরকম অফুরন্ত অবকাশের দিনে।

হাসি থামিয়ে কলি বললো, তা সে গেলো কোথায়?

কে?

প্রণয়বাবু।

কে জানে!

'প্রণয় পরম রত্ন যত্ন করে রেখো তারে
বিচ্ছেদ তস্করে আসি যেন কোনোরূপে নাহি হরে।'

বুঝেছো পর্ণা ?

কলি আবৃত্তি করার মতো করে বললো।

তারপরই বললো, এই গানটা আমাকে শোনাবি। বহুদিন শুনিনি তোর গলাতে।

দেখা যাবে।

হোটেলে পৌঁছে দলুমার ভাড়া মিটিয়ে দিলো কলি। বললো, থ্যাংক উ্য।

দলুমার কালো মুখটি গরমে বেগুনি হয়ে উঠেছিলো। হাসলো একটু ও। গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে।

বকশিসও দিতে গেলো কলি। কিন্তু নিলো না দলুমা। বললো, কালিদাদা তো ভাড়া ঠিকই করে দিয়েছে আগে থেকে। বকশিস নাই বা দিলেন।

পর্ণা মাঝে পড়ে বললো, তুমি তো বহুদূরে গেছিলে। দিদি দিচ্ছে, নাও। বকশিস তো বকশিসই!

নাঃ।

বলে, সাইকেল রিকশার হ্যান্ডেল ঘোরালো দলুমা।

আশ্চর্য! না কেন ?

পর্ণাই বললো আবার।

দলুমা মাথা নিচু করে, হেসে বললো, লোভ বেড়ে যায়।

তারপর কলির দিকে ফিরে বললো, আবারও রিকশার দরকার হলে কালি-দাদাকে বলে দেবেন দিদি আগে।

রিকশাটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলো দলুমা।

পর্ণা বললো, আমরা দু'পাতা ইংরিজি পড়ে ভাবি যে সব জানি। অথচ দ্যাখ্, প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই কত কী শেখার আছে আমাদের!

কলি চলে-যাওয়া দলুমার দিকে চেয়েছিলো।

সামনে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে প্যাডল্ করছিল দলুমা। 'রায়-চৌধুরী লজ'-এর হাতার মধ্যে আলো-আঁধারির মধ্যে দিয়ে রিকশাটা আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছিলো। ঘামে সপ্‌সপ্ করছিলো গেঞ্জিটা। কাঁকরে কিরকির শব্দ উঠছিলো সাইকেল রিকশার নাচনেতে।

কলি সেদিকে চেয়ে ভাবছিলো, এতোক্ষণের ভার লাঘব হওয়াতে নিশ্চয়ই খুব হালকা লাগছে এখন দলুমার।

দলুমার হাত দুখানি ধরে এসেছিলো। পায়েও ভার ঠেকছে বড়। কী হলো, কে জানে! প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দেওয়ার পর তো উল্টোটাই হবার কথা! এমন তো হয় না কখনও! হাত দুটো আলাদা আলাদা করে হ্যান্ডেল থেকে তুলে বারবার ঝাঁকালো দলুমা। দুটি পাও। তারপর এগিয়ে চললো, হুলাকুর মোড়ের দিকে। যদি স্টেশনের কোনো প্যাসেঞ্জার পেয়ে যায়, সেই আশাতে।

কিনলি কি কি ?

করিডোর দিয়ে ঘরের দিকে এগোতে এগোতে শুধোলো পর্ণা।

অনেক কিছু।

চল্ দেখাবি।

এখনই? তার চেয়ে চল্ বাগানে একটু বসে যাই। তারপর চান করে সব খুলে মেলে দেখাবো তোকে। গরুর গলার হারটা যে কী সুন্দর!

কোন গরুর গলাতে পরাবি?

গরু, না, বলদ বল!

সরী।

ঘরের দরজা খুলে জিনিসগুলো রেখে আবার ঘর তালা বন্ধ করে বাগানের দিকে এগোলো ওরা।

বাগানে তখন কেউই ছিলো না। একটি নবাবিবাহিতা দম্পতি দোলনা ছেড়ে উঠে চলে যাচ্ছিলো।

পর্ণা দূর থেকেই বললো, আমরা কিন্তু ঐ কোণের বেঞ্চে বসবো। আপনাদের ওঠার দরকার নেই।

মেয়েটি বললো, না না। আমরা উঠতামই।

ওরা যখন চলে গেলোই, তখন কলি আর পর্ণা গিয়ে দোলনাতেই বসলো।

দেখলে মনে হয়, সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে। দুজনে দুজনের কাছে একেবারে আনকোরা নতুন। শরীরে, মনে। নারে? ভাবলেই বেশ লাগে!

কলি বললো।

পর্ণা ফিসফিস করে বললো, 'পাঁচ নম্বর বাথরুম-স্লিপারের সঙ্গে আটনম্বর জগিং শু—একেই বলে আইডিয়াল ম্যাচ।'

ওরা চলে গেছে কি না দেখে নিয়ে কলি খুকখুক করে হেসে উঠলো।

এও প্রণয়েরই কথা।

সে মানুষটা গেলো কোথায় বল তো?

কলি শুধোলো।

কে জানে! গেলে, যাক যে চুলোয় খুশি। না এলেই ভালো। আর তো মাত্র দুটি দিন। মায়া না বাড়ালেই ভালো।

তা যা বলেছিস। মায়া বড় খারাপ।

মায়া বসুর কথা বলছিস?

পর্ণা বললো, না। 'মা' চলে যায়। 'য়া' থাকে, যার নিজস্ব কোনো পরিচয় এবং মানেও নেই।

এও প্রণয়েরই কথা।

দুজনেই হেসে উঠলো।

সত্যি! আমরা যা হাসছি না এ-ক'দিন। ভীষণ ভয় করছে রে। এতো হাসি ভালো নয়।

বাগানের কোণ থেকে ঠিক সেই সময়ই বেড়াল দুটো কাঁদতে শুরু করলো আবার। এই সময়ে বেড়াল কাঁদে না। বছরের এ সময়ে তো নয়ই!

পর্ণা এদিক ওদিক তাকালো। ওর মুখ শুকিয়ে গেলো। বললো, দেখলি! তোকে বলেছিলাম!

তুই ভারী সুপারস্টিসাস্। এ যুগে সত্যিই চলে না তোকে নিয়ে।

কলি রাগের গলাতে বললো।

তবু যাই বলিস। অন্য কোনো ব্যাপারে নয়। শুধু এই ব্যাপারে। বেড়াল কাঁদলেই একটা না একটা অঘটন ঘটবেই। ছেলেবেলা থেকে দেখা আছে আমার। আজ মাকে একটা ফোন করতে হবে খাওয়ার পরে। মনে করিয়ে দিস তো।

তা করিস। তা তো রোজই করলে পারিস। বেশি দূর তো আর নয়!

গণশা।

এই গণশা।

ওপর থেকে বিধুভূষণের গলা পাওয়া গেলো। বারান্দাতেই বসে আছেন নিশ্চয়ই। চাঁদের আলোর বন্যার মধ্যে।

গণশা এসে বারান্দা থেকেই হুম্-হুম্-হুম্ করে বেড়াল দুটোকে তাড়াবার চেষ্টা করলো। তাতেও তাদের কাঁদুনি বন্ধ না-হওয়ায় সম্ভবত মগ্-এ করে এক মগ্ জল এনে অদৃশ্য বেড়ালদের দিকে দোতলা থেকেই প্রায়ান্ধকারে সেই জল ছুঁড়ে দিলো। তাতেই কাজ হলো। বেড়াল দুটো সম্ভবত বাড়ির পেছন ঘুরে ফাঁকা গ্যারাজগুলোর দিকে চলে গেলো। তাদের অপসৃয়মান গলার আওয়াজে বোঝা গেলো।

কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো ওরা দুজনেই। বাগানে চাঁপার গন্ধ ছিলো তীব্র। হাসনুহানার গন্ধ। রজনীগন্ধা। লতানে জুঁই।

পর্ণা বললো, এতো তীব্র গন্ধে সাপ আসে, জানিস। চারদিক যা ঝুপড়ি!

কলি বললো, তোকে নিয়ে সত্যিই চলে না। বেড়াল। সাপ। এরপর বাঘ আনাবি। চল্ ঘরে যাই। চানও করতে হবে আমাকে। আজ এক্ষুণি করবো। শোবার সময়ে আর করবো না! ঘেমে, নেয়ে গেছি।

চল্।

পর্ণা বললো উঠে পড়ে।

দেওয়ালের কাছে কাছে গাছ-গাছালির ছায়ার ঝুপড়ি-ঝুপড়ি অন্ধকারের দিকে চেয়ে পর্ণার বুকের মধ্যেটা ছম্ ছম্ করে উঠলো। এক লহমার জন্যে সুবর্ণর কথা মনে হলো। আজকাল, দিনের মধ্যে বহুবারই হয়। আর মনটা খারাপ হয়ে যায়। ওর তলপেটে একটা ব্যথা ছিলো। ডাক্তার বলেছিলেন, হার্নিয়া। অপারেশন করে নেওয়া ভালো, নইলে যখন-তখন বিপদ হতে পারে। স্ট্র্যাংগুলেটেড হয়ে যাওয়ার মতো খারাপ জিনিস আর নেই। কে জানে! সুবর্ণ অপারেশান করিয়েছে কি না এতোদিনে। যখন-তখন বিপদ হতে পারে। কিন্তু কিছু তো করার নেই। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। পর্ণা যে-কারণেই ভয় পাক না কেন, সুবর্ণ ওকে জোরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতো। সব ভয় কেটে যেতো ওর।

নারী, তা সে যত বড় স্বাবলম্বীই হোক না কেন কখনও কখনও একজন পুরুষকে তার বড়ই প্রয়োজন হয়! সুবর্ণ খুবই কাছে ছিলো একসময় তার।

তাই, পর্ণা একথা বোঝে।

এ-কথার স্বরূপ কলি বুঝবে না। পরে হয়তো বুঝবে কোনোদিন। কী যে করে পর্ণা! নিজেই বোঝে না। ওর চোখ ছলছল করে উঠলে, মা বলেন, যা ঘটে গেছে তা ঘটে গেছে। আজকাল ডিভোর্স তো ঘরে ঘরেই হয়। তা বলে, কেউ এতোদিন পরে এমন কান্নাকাটি করে তা তো দেখিনি! তাছাড়া ডিভোর্স তো তুইই চেয়েছিলি। তোর এই ঢঙ বুঝি না আমি!

পর্ণার চোখ আরও ছলছল করে।

কলি সবসময় ওকে বলে, আনন্দ কর, আনন্দ। অতীত ভুলে যা।

কী করে বোঝায় পর্ণা ওদের! সুবর্ণ ভারী ভুলো মনের ছেলে। রোজই অফিস যাবার সময় রুমাল আর চশমা নিতে ভুলে যেতো। ওর প্লাস-পাওয়ারের চশমা, তাও পাওয়ার সামান্যই। তবু লেখাপড়ার সময়ে লাগেই। প্রতিদিন পর্ণা বেডরুম থেকে দৌড়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে সুবর্ণর হাতে পৌঁছে দিতো।

সুবর্ণ হেসে বলতো, তুমি না থাকলে আমার কী যে হবে তাই ভাবি!

দু'চোখ জলে ভরে আসে পর্ণার সে সব কথা ভেবে। কী চমৎকার শাশুড়ি, সবই কী চমৎকার। সেই পরিবারের গায়ে, স্বামীর গায়ে কলঙ্ক লেপে সে একটা সামান্য কারণকে ম্যাগনিফাই করে নিজের তো বটেই, সুবর্ণরও এতো বড় সর্বনাশটা করে এলো।

অল্প ক'দিন আগে ওদের কমোন ফ্রেন্ড মমতা ফোন করে পর্ণাকে বলেছিলো, সুবর্ণ বলেছে, বিয়ে আর নয়। ওয়ান্স্ বিটন, টোয়াইস শাই। ওয়ান্স্ ইজ এনাফ্। এনাফ্ ইজ এনাফ্।

বিধুভূষণ শব্দহীন রাতে মেয়েদুটির বাগানের দোলাতে-বসা কথোপকথন শুনেছিলেন। ঠিক তারপরেই বেড়াল দুটি কাঁদতে লাগলো। তিনি নিজে অত্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কিন্তু এই একটি ব্যাপারে তাঁর সংস্কার বড় গভীর।

স্ত্রী যেদিন চলে গেলেন ভোরের আলো ফোটার আগে, সেই রাতেও সারারাত এই বাগানেই বেড়াল কেঁদেছিলো। পুত্র ও পুত্রবধূর বেলাতেও তাই। 'রায়চৌধুরী লজ'-এর সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও বেড়াল কাঁদলেই এই বাড়ির প্রায় সকলেরই মন খারাপ হয়ে যায়। স্নিগ্ধ ছাড়া। তার মন সত্যিই সবরকম সংস্কারমুক্ত।

স্ত্রী, ছেলে, বৌমা সকলেই এক এক করে তাঁকে ছেড়ে গেলেও তাঁর পড়াশুনো ও গানবাজনার সখ নিয়ে বিধুভূষণ বেশ দারুণই বেঁচেছিলেন এতোদিন। তাঁর বাঁচার রকম ও ব্যাপ্তির মধ্যে এতোটুকুও অপূর্ণতা ছিলো না। একা হলেও; ভেবে এসেছিলেন যে, তিনি একজন যথার্থ শিক্ষিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ। আর্থিক অনটন তাঁর কোনো কালেই ছিলো না। যতদিন বাঁচেন, তা হবেও না। কিন্তু যাঁদের অর্থ নেই তাঁরা একথাটা প্রায়ই বোঝেন না যে, অর্থ কতিপয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে পরিগণিত হলেও মানুষের জীবনে অর্থই একমাত্র কাম্য বস্তু নয়! তার পরম প্রার্থনা নয়। অর্থের অভাব মেটবার পরেও অনেকই অভাব থেকে যায়, সে সবের তীক্ষ্ণতা ও জ্বালা অর্থের অভাবের চেয়েও অনেকই বেশি তীব্র। এই দেশের অধিকাংশ মানুষই অর্থকষ্টে ক্লিষ্ট বলে এই ভাবনাকে বিলাসিতা বলেই ভাবেন হয়তো। কিন্তু তেমন ভাবাটা বোধহয় ঠিক নয়।

কিন্তু যা নিয়ে বিধুভূষণ সাম্প্রতিক অতীত থেকে খুবই বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত, তা হচ্ছে এই যে, তাঁর এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার নিটোল বোধে কিছু-দিন ধরেই একটু চিড়, একটু ফাটল অনুভব করছেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন যে, একজন অশেষ কৃতি মানুষেরও একটা সময়ে পেঁছবার পরে বেঁচে থাকার আর কোনো মানে হয় না। কাজ, সব কাজই ফুরিয়ে যাবার পরও

শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কুরুচিকর। বিধুভূষণ আজকাল প্রায়ই ভাবেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সব দেশই এমন আইন আনবে, যা প্রত্যেক মানুষকেই তার নিজের খুশিমতো পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার অধিকার দেবে।

অধিকাংশ মানুষই মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য নিয়ে আদৌ ভাবনাচিন্তা করেন না বলেই হয়তো এই সব ভাবনা তাঁদের মস্তিষ্কে আসে না। মাথার ওপরে ছাদ; খাদ্য আর পরিধেয় থাকলেই তাকেই বেঁচে থাকার যথেষ্ট অনুপ্রেরণা বলে মনে করে, মনকে চোখ ঠেরে অধিকাংশ মানুষই স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে, নিজের স্বাস্থ্যের এবং পারিপার্শ্বিকের তীব্র ও ঘন ঘন প্রতিবাদ সত্ত্বেও যেন তেন প্রকারেণ বেঁচে থাকতে চান।

একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত বিধুভূষণও তাই চেয়েছিলেন! এতোদিন, মৃত্যুচিন্তা বা তাঁর জীবনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে এমন ভাবনা একেবারের জন্যেও ভাবেননি। কিন্তু যৌবনের দূতী ঐ মেয়ে দুটি, পর্ণা আর কলিকে দেখবার পরই ওঁর মন বড়ই উচাটন হয়েছে!

না, যুবতীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন যে এমন নয়। এই আকর্ষণ ব্যক্তিগত কারণে নয়। কারণটা সম্পূর্ণই প্রতিফলিত। পর্ণা ও কলির প্রেক্ষিতে, যৌবনের ঝলমলে হাস্যময়ী, লাস্যময়ী সুগন্ধী রূপের পটভূমিতে, নিজেকে বড়ই বেমানান বলে বারবার মনে হয়েছে তাঁর। এই পৃথিবী বৃদ্ধের নয়, জরাগ্রস্তর নয়, পরনির্ভরের নয়, এ যে যৌবনেরই! এই কথাটা খুব উচ্চরবে অথচ নিরুচ্চারে শুনতে পাচ্ছেন। নিজের কানে, ওয়াকম্যান কানে লাগিয়ে যেমন করে কিছু শোনা যায়, অন্যের অগোচরে। তেমন করে। এই পৃথিবী স্নিগ্ধ, প্রণয়, হনসো, রামদয়াল, কলি এবং পর্ণাদেরই। এখানে বিধুভূষণরা বেকার। ফালতু।

কাজ যে নেই, তা নয়। তাঁর শেষ কাজ ছিলো; স্নিগ্ধ, প্রণয় আর হনসোকে জীবনে গুছিয়ে বসিয়ে দিয়ে যাওয়া। সেইটেই তাঁর শেষ ব্যস্ততা।

আজ এতো অস্থির ও ব্যতিব্যস্ত হবার কারণও সেটিই।

এই মাত্র ক'দিন আগেই এই 'Settle' করার কথা তোলাতে প্রণয় খুব জোরে হেসে উঠেছিলো। বলেছিলো, বড়দাদু তুমি 'এবারে সত্যিই বুড়ো হচ্ছো। তোমাদের সময় কী আর আছে? যখন সমস্ত পৃথিবীই Prepetually Unsettled অবস্থাতে এসে পেঁাছেছে, তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই কিছুমাত্র স্থিতিস্থাপকতা নেই; সেখানে আমাদের মতো অতি সামান্য মানুষের জীবনকে 'Settle' করে দিয়ে যাবে এই ভাবনাটাই তো ভুল! মস্ত ভুল। এই পৃথিবীতে 'Stability' বা 'Equilibrium' বলে কোনো ব্যাপারই বেঁচে নেই আর। ঐ শব্দটি অর্থনীতিবিদদের শাস্ত্রেই শোভা পায়। যদি বা কোনো কিছু 'Equilibrium'-এ এসে পেঁাছোয়ও ঘটনা হিসেবেই, তাও পুরোপুরিই 'uustable' এখন।

বিধুভূষণ কদিন ধরেই ভাবছেন এসব নিয়ে। প্রণয় যাই বলুক, ওরা অনেক জানতে পারে, কিন্তু সব জানে না। বিধুভূষণ তাঁর দীর্ঘ সফল

জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতাতে এতোদিনে যা কিছু শিখেছেন তার সবই কি মিথ্যা ?

মেয়েদুটিকে বড়ই পছন্দ হয়েছিলো ওঁর। কিন্তু বাবার নাম জানেন না, ঠিকানা জানেন না, পারিবারিক পটভূমির কিছুমাত্রই জানেন না। মামার-বাড়ির দিকেরও কিছুমাত্র নয়। এদের দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, আজকাল প্রত্যেক ছেলে মেয়েই বোধ হয় একক সত্তার, Sole Entity হয়ে গেছে! তাছাড়া এরা প্রত্যেকেই যেন পটভূমিহীন স্বয়ম্ভূ। পটভূমির আর কোনো প্রয়োজন নেই। ভূমিকা নেই। এদের অতীত নেই ; ভবিষ্যৎও নেই। কলি, কলি : পর্ণা, পর্ণা। তাদের নিজেদের চেহারা, আচার ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষাটুকুই শুধুমাত্রই বিচার্য। বাবা ভিখারী না রেসুড়ে, মা দজ্জাল না মিষ্টিস্বভাবা, সচ্চরিত্রা কী দুশ্চরিত্রা এসবের বিচারের কোনো প্রয়োজনই আজকাল আর নেই বোধহয়।

তিনি যে-ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করেছিলেন, সেই-ইংল্যান্ডে, সেই সময়েব ইংল্যান্ডেও এসবের বাছবিচার ছিলো। এখন বোধহয় সেখানেও আর নেই। কে জানে! তাঁর নানা পুরোনো অতিপরিচিত পৃথিবীর খোলসটাতেই শুধু বদল হয়নি, পাহাড়ই ন্যাড়া হয়নি, জঙ্গলই পাতলা হয়নি শুধু, পৃথিবীর অন্তর্জগতের চেহারাটিও মনে হয় যেন পুরোপুরিই বদলে গেছে। তাঁর এই নিদপুরার 'রায়চৌধুরী লজ'-এর দোতলাতে বসেও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, টি. ভি.-র মাধ্যমে, এই নির্মম ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন। এবং বিদায়ক্ষণে এই বদলটা যে পৃথিবীর জন্যে বিশেষ শুভ কিছু আদৌ বয়ে আনবে না, তা ভেবে প্রায়ই আতঙ্কিতও হন।

বড় সাধ হয়েছে তাঁর, ওদের হাতগুলি এক করে দিয়ে যান।

আগামীকাল দুপুরে ওরা খাবে বিধুভূষণের এখানে। কালই ওদের দুজনের বাবার নাম ঠিকানা সব সংগ্রহ করে নেবেন। তারপর কালই চিঠিও লিখে দেবেন তাঁদের কাছে। তাঁদের সস্ত্রীক আসতে নিমন্ত্রণ জানাবেন তাঁর ব্যক্তিগত অতিথি হিসাবে 'রায়চৌধুরী লজ'-এ। বাঁদর দুটোকে তাঁরা নিজেরাই দেখে যান স্বচক্ষে একবার। তাঁদের মেয়েরা অন্য কোনোদিক দিয়েই যে জলে পড়বে না 'সে কথাও নথিপত্র, ব্যালান্স-শীট ইত্যাদির দ্বারা বুঝিয়ে দেবেন বিধুভূষণ তাঁদের যথেষ্ট প্রত্যয়েরই সঙ্গে।

আজকালকার মা-বাবা। 'রেস্তো'র কথাটা ভালোই বোঝেন সকলেই। বিধুভূষণ শুধু চান যে, যে-ক'টা দিন আর আছেন তারই মধ্যে এই শেষ কাজটি সুসম্পন্ন করে দিয়েই যেন যেতে পারেন। আর কিছুমাত্র পিছুটান নেই তাঁর।

গণশা এসে বললো, খাবার আনি বাবু ?

কী খাবার ?

নিজের মনের মধ্যে জমে-ওঠা অসহায়তা, বিরক্তি, ক্রোধ সব উৎসারিত হয়ে ছিটকে পড়লো গিয়ে গণশার ওপরে।

স্বপ্নভঙ্গ হলো বিধুভূষণের। বিরক্তির সঙ্গে আবারও বললেন, কী খাবার ?

রোজই তোর সেই একঘেয়ে খাবার খেয়ে খেয়ে ঘেন্না ধরে গেলো।

ইদানীং হঠাৎ হঠাৎই এইরকম বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, অভিমান ধীর স্থির মিষ্ট-ভাষী বিধুভূষণের উপরে দখল নেয়। যখন নেয়, তখন ওঁর নিজের বা অন্য কারোই করার কিছুমাত্র থাকে না। বড় অকারণে, অসময়ে, অপাত্রে তীব্র তিক্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ফেলেন।

বিধুভূষণ বললেন, তোদের জন্যেই আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে আজকাল। বৈচিত্র্য বলে জীবনে কি কিছুমাত্রই থাকতে পারে না? সবকিছুই কি এমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যাবে? হয়ে থাকবে? কী? এনেছিস কি? খাবার?

মুরগির স্যুপ, এঁচড়ের চপ, ক্যারামেল কাস্টার্ড।

গণশা বললো।

ছুঁড়ে ফেলে দে। আমি আজ পোলাউ আর মাংস খাবো। সঙ্গে বেগুনভাজা।

ও বাবা। সে সব করতে সময় লাগবে যে!

গণশা বিপদে পড়ে বললো। গলার স্বরে একটু বিরক্তিও ঝরলো।

যতখানি সময় লাগবার লাগুক। আমাকে তোরা সকলে মিলে যে জড়-পদার্থ বানিয়ে তুলবি, তা আমি হতে দেবো না। তোরা ভুলে যাস না আমার নাম বিধুভূষণ রায়চৌধুরী। তোদের ইচ্ছেমতো খাবো, ইচ্ছেমতো শোবো, তোদের দয়াতে বেঁচে থাকবো আমি? না। সেটি হচ্ছে না। যে ক'দিন আছি আমি আমার ইচ্ছেমতোই বাঁচবো। আমি কি তোদের দয়ার ভিখারি? কী ভাবিস তোরা আমাকে? অ্যাঁ। কী ভাবিস?

বলেই, লাঠিটাকে ঠুকলেন বারান্দার মার্বেলে। তিন চারবার।

ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। মাংস, মানে কিসের মাংস?

গণশা বিরক্তিমাখা গলায় বললো, ব্যাজার মুখে।

গণশার এই উদাসীন ভাব বিধুভূষণকে আরো তিক্ত ও ক্রুদ্ধ করে তুললো।

ঘাড় গণশার দিকে ঘুরিয়ে বললেন, কিসের মাংস মানে? হারামজাদা। আমি কি বাঘের মাংস খেতে চাইছি?

প্রচণ্ড রেগে উঠে বিধুভূষণ বললেন।

গণশা ভাবলো, ডঃ প্রসাদকে ফোন করতে হবে। প্রেসারটা বড্ডই গণ্ডগোল করছে আজকাল।

তালে? চিকিন?

গণশা এবার নরম গলায় শুধোলো।

চিকেন আবার মাংস হলো কবে থেকে? সে তো পাখি। রামপাখি।

তবে? চিকিন নয়তো কিসের মাংস?

তবে কি আবার? মাংস মানে, পাঁঠার মাংস। কচি পাঁঠার মাংস। আমি কি তোমার কাছে ভিল্ চেয়েছি, না ভেনিসন্?

এই রাতে, কার পাঁঠার বাচ্চা ধরতে যাবো আমি?

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবি হারামজাদা! কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস?

বিধুভূষণ এবারে সত্যিই ফুরিয়ে যাবার কাছাকাছি এসেছেন। ফুরিয়ে যাবার আগে বোধহয় বড় বড় মানুষও এমন আত্মম্ভরী, ছোট হয়ে ওঠেন।

গণশা হঠাৎ বলে উঠলো, এমন গালাগালি করলে কিন্তু ভালো হবে না।

কী বললি? গালাগালি? নিমকহারাম। এটা গালাগালি? তোর কাছে এটা গালাগালি? কবে থেকে? অ্যাঁ? কবে থেকে?

শোরগোল শুনে স্নিগ্ধ নিচ থেকে দৌড়ে এলো।

এখন রাতের খাবার-এর সময়। অতিথিরা প্রায় সকলেই ডাইনিং-হল-এ এসে খাচ্ছেন।

কী হয়েছে দাদু? গণশাদা, কী হয়েছে?

কী হয়েছে তা বাবুকেই জিগগেস করো। সর্বক্ষণ ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে আছি, সারাজীবন নিজের বৌ ছেলের মুখ দেখলাম না; উদয়াস্ত পরিশ্রম করছি আর সবসময় এই গালাগালি ভালো লাগে না। সবসময়ে, নিমকহারাম। হারামজাদা! তোমরাই কি আমাকে দিয়েছো শুধু? আমার জন্যে করেছো? আর যা দিয়েছে, তা কি আমি অস্বীকার করেছি কোনোদিনও? আমি কি বদলে কিছুই দিইনি? সবসময়ই বাবু বলেন, তোর জন্যে এই করেছি আর সেই করেছি। ভাল্লাগে না আমার। দূর ছাই!

ওকে আমার সামনে থেকে চলে যেতে বলে দে স্নিগ্ধ। ও যদি ওর ভালো চায় তো এখুনি চলে যাক।

চিৎকার করে উঠলেন বিধুভূষণ।

নইলে আমি ওকে গুলি করে শেষ করে দেবো। কাল থেকে আমি কুকুর পুষবো একটা। ভালো জাতের কুকুর। যার পেডিগ্রী প্রশ্নহীন। আমার সামান্য যতোটুকু কাজ তা তারাও ট্রেনিং পেলেই করে দেবে। মানুষের উপরে আমার আর বিশ্বাস নেই। মানুষের মতো এতো বড়ো অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্ন প্রাণী বিধাতা আর সৃষ্টি করেন নি।

গণশা চলে গেলো সামনে থেকে। আর কিছু না বলে।

কী হয়েছে আমাকে তো বলবে? কী দাদু? আমাকে বলো, কি হয়েছে?

স্নিগ্ধ বিধুভূষণের পাশে চেয়ার টেনে বসলো।

আমি একটু পোলাও আর মাংস খেতে চেয়েছি, তা হারামজাদা বলে কিনা, এতো রাতে কার পাঁঠার বাচ্চা ধরে আনবো? সাহস দ্যাখ্ একবার।

কারো পাঁঠার বাচ্চাই আনতে হবে না। আজই আকবর কসাই কচি পাঁঠা আস্তু কেটে হোটেলের কালকের লাঞ্চ-এর জন্যে দিয়ে গেছে। বড় ফ্রিজ-এ তুলে রাখা আছে। আমি এখুনি, রাঁধিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মিষ্টি পোলাউ খাবে তো দাদু? তুমি যেমন পছন্দ করো, সামান্য জাফরান দেওয়া? আর মাংসটাকি দই দিয়েই করতে বলবো, না ঠাকুমা যেমন করে তোমার জন্যে রান্না করতেন, তেমন করে?

বিধুভূষণের দুচোখ জলে ভরে গেলো।

একটি সংক্ষিপ্ত চাপা শব্দ, বুকের গভীর থেকে উঠেই আবার গভীরে নিমজ্জিত হলো।

বিধুভূষণ স্নিগ্ধর পিঠে হাত রাখলেন। গভীরতম প্রদেশ থেকে উঠে আসা গভীর কৃতজ্ঞতার হাত, এই কৃতঘ্ন পৃথিবীতে।

তারপরেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

স্নিগ্ধ বুঝলো, বিধুভূষণের মুখনিঃসৃত ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দটি হৃদয়ের আশীর্বাদেরই প্রকাশ। যে আশীর্বাদ কুবেরের সব বিষয়-আশয় দিয়েও কেনা যাবে না।

স্নিগ্ধ বললো, তোমার গণশাদাকে বলার কি দরকার? যা বলার আমাকে অথবা প্রণয়কে ডেকে বলবে। তোমার বাড়ি, তোমার ঘর, তুমি হচ্ছো গিয়ে বটগাছ। আমরা সব তোমার আশ্রিত, তোমার ছায়াতেই তো···তোমার···

বলতে বলতে স্নিগ্ধর গলা ভারী হয়ে এলো আন্তরিক শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়।

স্নিগ্ধ ভাবছিলো, আশ্চর্য! এতো লেখাপড়া শেখা, আধুনিকতা, সবই মাঝে মাঝে মিথ্যে হয়ে যায়। ভাবাবেগ মানুষেরই রোগ, কুকুরদের গায়ের আঠালিরই মতো। তাও তো ওদের ভেট্-এর কাছে নিয়ে গিয়ে ডি-ওর্মিং করানো যায় কিন্তু মানুষে বাইরে যতই আধুনিক হোক না কেন তার ভাবাবেগ অদৃশ্য ভাইরাস্-এর মতো তার ভিতরে থেকে যায়ই! লুকোনোই থাকুক আর প্রচ্ছন্নই থাকুক, যে মানুষের ভাবাবেগ নেই, সে বোধহয় ROBOT। পুরোপুরি মনুষ্যত্বহীন হয়ে যায় সে মানুষ!

স্নিগ্ধ, গণশাদার কথাও যে ভাবছিলো না তাও নয়। গণশাদার পুরো পরিবার যে আজকে শুধু স্বচ্ছলই নয় শিক্ষিতও, তার মূলে দাদুই। দাদুর সঙ্গে এইভাবে কথা বলাটা সত্যিই বড় কৃতঘ্নতার ব্যাপার। তাছাড়া, 'হারাম-জাদা' তো দাদুর গালাগালি নয়; আদর। চিরদিনের আদর। নিমকহারামও বলতে পারেনই। এতো নুন যে খেয়েছে সে যদি গুণ না গেয়ে এমন ব্যবহার করে তাহলে তো মনে দুঃখ হতেই পারে। তবে দাদু একটা কথা বোঝেন না যে 'প্রত্যাশা' কথাটাই আজকের অভিধানে অচল হয়ে গেছে। একটা সময় আসছে যখন রাজা-মহারাজার পক্ষেও আর চাকর-বাকর রাখা সম্ভব হবে না। কারণ, কাউকেই সুখী করে রাখা যাবে না সব দিয়েও। একদিন না একদিন তারা অন্যরকম ব্যবহার করবেই করবে। আর তা করলে, সেদিন,মনে হবে, এতোগুলো বছর ভুল করে এতো কিছু তার জন্যে করা হলো। হৃদয়ের এতো উষ্ণতা, এতো আন্তরিকতা নষ্ট করা হলো, আর···

আজকাল কাজের জন্যে মানুষ রাখলেও তার সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক একদমই গড়ে তোলা উচিত নয়। সম্পর্কটা শুধু টাকার, লেনদেনেরই হওয়া উচিত। পুরোপুরি যে-কোনো সম্পর্কে মনকে জড়ালেই দুঃখ সেখানে অনিবার্য। এতোদিনে একটু একটু করে বুঝছে স্নিগ্ধ। কিন্তু দাদুদের প্রজন্মের মানুষেরা যে পৃথিবীর এই কংকালসার ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট চেহারাটা দেখেননি, জানেন না।

স্নিগ্ধ গলা পরিষ্কার করে বললো, আগামীকাল থেকে সকালে ব্রেকফাস্টের পরে এবং বিকেলের চায়ের পরে কালিদাদা নিজে এসে তোমার অর্ডার নিয়ে যাবে দুপুরের ও রাতের খাবারের। আমাদের হোটেলের সেট-মেনুর একই

খাবার তোমার আর একদিনও খেতে হবে না দাদুভাই। তুমি দেখে নিও। শুধু দিশি গরু, উট আর বাঘের মাংস খেতে চেও না। আর যা চাইবে তাই খাওয়াবো আমরা তোমাকে। মানুষের মাংস খেতে চাও, তো তাও খাওয়াবো। আমি আর প্রণয় আমাদের গায়ের মাংস কেটে দেবো তোমার জন্যে।

আমরাও দেবো। যদি দাদু চান।

পেছন থেকে নারীকণ্ঠে কারা যেন বললো।

বিধুভূষণ তাড়াতাড়ি ঘুরে বসতে গিয়ে হুইস্কির গ্লাসটা উল্টে পড়ে গেলো।

মনে মনে বললেন, গুড। গুড সাইন।

স্নিগ্ধ চম্‌কে চেয়ে দেখলো পেছনে। চেয়ে দেখে, কলি আর পর্ণা। হাসছে আর বলছে।

কী হয়েছে দাদু? কোনো কষ্ট? আপনার নাতিরা বুঝি আপনার দেখাশোনা করছে না ঠিকমতো? কী অন্যায় বলুন তো! আমরাই এবার থেকে দেখাশোনা করবো আপনার। আপনার দুই নাতিরই বিয়ে দিয়ে দিন যাতে এমন বাউণ্ডুলেপনা না করতে পারেন আর আপনারও ঠিকমতো যত্ন-আত্তি হয়। ততদিন না হয় আমরাই দেখবো।

বিধুভূষণ আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন। চোখ দিয়ে দরদরিয়ে জল পড়তে লাগলো। কিন্তু নিঃশব্দে। মনে মনে নিরুচ্চারে নিজেকে বকলেন, স্টপ ইট্। স্টপ ইট্। ওল্ড সেন্টিমেন্টাল ফুল! স্টপ ইট্।

স্নিগ্ধ বললো, আমি যাই তাহলে দাদু?

বলেই, কলিদের দিকে ফিরে, গলা নামিয়ে বললো, আপনারা খাওয়া ছেড়ে উঠে এলেন কেন?

আপনি দৌড়ে এলেন যে উপরে! তাই।

তাতে আপনাদের কি?

একটু রুক্ষ গলাতেই বললো স্নিগ্ধ। আমি তো হোটেলের ম্যানেজার। আপনারা আমার অনার্ড গেস্টস্। আমার ব্যক্তিগত সমস্যাতে জড়িয়ে পড়ে নিজেদের মজা নষ্ট করার কী দরকার আপনাদের? খান-দান, মজা করুন। দুদিনের জন্যে তো এসেছেন। এসব আলগা দরদে কারোই উপকার হয় কি কোনো?

পর্ণা বললো, সেটা আমাদেরই ভাবতে দিন। দাদু তো আমাদেরও দাদু। দাদুর চেঁচামেচি আমরাও শুনেছিলাম।

কলি ফিসফিস করে স্নিগ্ধকে বললো, সব দরদই প্রথমে আলগাই থাকে। সময়ে ফেভিকল্‌এর মতো স্থায়ী হয়ে সেঁটে যায়।

কী দাদু। রাগারাগি করছিলেন কেন?

কলি বললো হেসে। এবারে গলা তুলে, বিধুভূষণকে।

স্নিগ্ধ।

বিধুভূষণ তাকালেন। কলির কথার কোনো উত্তর না দিয়ে!

বলো, দাদু।

বলেই, স্নিগ্ধ ঘুরে দাঁড়ালো।

একটা হুইস্কির বোতল বের করে দিয়ে যা তো আমাকে। এটা শেষ হয়ে গেলো। নতুন একটা গ্লাসও দিয়ে যা। ঐ গণশাটাকে আমার ঘরে আর ঢুকতে দেবো না। ওকে কিছু বলবি না।

কটা খেয়েছো, দাদু ?

দুটো।

বড় ?

হ্যাঁ ?

আরও খাবে ? ডঃ প্রসাদ কিন্তু তোমাকে...

আমার বাঁচার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে স্নিগ্ধ। এই মুহূর্তে আমার মতো সুখী, রিলিভড্ মানুষ আর দুটি নেই। আই প্লেড আ লং ভেরী লং ইনিংস। ওয়েল, আ ব্রিলিয়ান্ট ইনিংস, ইফ আই মে সে সো। নাউ ইটস্ টাইম টু কল ইট আ ডে।

এতো সুখী হলে হঠাৎ ? গণশাদার জন্যে তো দুখীও কম ছিলে না একটু আগে।

বলেই, দেরাজ খুলে একটি 'পাসপোর্ট' হুইস্কির বোতল বের করে শ্বেত-পাথবের গোল টেবলটার উপরে রেখে, খুলে নতুন একটি গ্লাসে একটু হুইস্কি ঢেলে দিলো স্নিগ্ধ।

সুখী কেন, তাও তুই বুঝতে পারছিস না ? কী বলো, মেয়েরা ? তোমরা বুঝেছো তো ?

স্নিগ্ধ বললো, বেশি খেয়ো না দাদু। তোমার ডিনার তৈরি হয়ে গেলেই প্রণয়কে দিয়ে আমি পাঠাবো উপরে। মাংসটা আমিই রান্না করে দেবো আজকে।

ও মা ! তা কেন ? আমি আর পর্ণাই রাঁধি না। ফর আ চেঞ্জ।

স্নিগ্ধ বললো, থ্যাঙ্ক উ্য। কিন্তু আজকে নয়। আজকে আপনারা চলুন, খাওয়া মাঝপথে রেখে উঠে এসেছেন।

তারপর বললো, দাদু তোমাকে সামনে বসে খাওয়াবে প্রণয়। দুজন গেস্টস এসেছেন টাটা থেকে। ঘরে বসে রাম্ খেয়ে অল্ রেডি ড্রাঙ্ক হয়ে গেছেন। তাঁদের নিয়ে ঝামেলা হতে পারে বলেই আমার থাকতে হবে নিচে।

এমন গেস্টস রাখিস কেন ? বের করে দে হোটেল থেকে।

কাল দেবো।

চলি দাদু আমরা।

কলি বললো।

বিধুভূষণের কানে যেন কোনো অচেনা পাখি ভোরের শিস দিয়ে গেলো।

মেয়েরা পুরুষের জীবনের কতবড় শূন্যতা যে পূরণ করে তা যদি এই ব্যাচেলর গবেট দুটো জানতো ! তার উপর এমন মেয়েরা ! না, না। যৌবনের কোনো বিকল্প নেই। যৌবনের স্বরের কোনো বিকল্প নেই। দুটি কানে যেন মধু ঢেলে দিলো কেউ।

কাল আসছো তো মা দুপুরে? তোমরা?

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বিধুভূষণ বললেন।

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই আসবো। মনে আছে।

হ্যাঁ। কাল আমি নিজে মেনু ঠিক করবো তোমাদের জন্যে। দেখবে। তোমাদের সঙ্গে কত যে কথা আছে মেয়েরা! ঈশ্বর করুন, যদিও সেই বুজরুক শালার উপরে আমার একটুও বিশ্বাস নেই; তবুও ঈশ্বর করুন, যেন কাল দুপুরে আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা পূরিত হয়।

কলি ও পর্ণা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

চলি দাদু। বেশি খাবেন না যেন। তাহলে কিন্তু আমরা আবার উপরে চলে আসবো আপনার খোঁজ নিতে।

কি?

এই হুইস্কি।

ওঃ।

বিধুভূষণ বললেন।

তারপর বললেন, তোমরা যদি এইজন্যেই আসো আবার, তবে তো···তবে তো আলবতই খাবো।

বলেই, হোঃ হোঃ করে হাসলেন বিধুভূষণ। হাসিটা নিজের কানেই একেবারে নতুন শোনালো বিধুভূষণের। এমন হাসি বহু বছর হাসেননি তিনি।

যাই দাদু।

যাওয়া নেই গো আমার নাতবৌয়েরা। এসো।

গলা নামিয়ে বললেন বিধুভূষণ।

লজ্জায় কান লাল হয়ে গেলো ওদের দুজনেরই।

তাড়াতাড়ি চারধারে তাকিয়ে দেখে নিলো কথাটা আর কেউ শুনলো কি-না!

ফিসফিস করে কলি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে বললো, কী বিপদ!

একতলার ল্যান্ডিংয়ে স্নিগ্ধ দাঁড়িয়েছিলো। বাবুর্চিখানা থেকে এখুনি বেরিয়েছে।

ওদের দেখে বললো, গলা খাদে নামিয়ে; আপনারা একজন বৃদ্ধ, মৃত্যুপথযাত্রীকে যে এমন করে নাচাচ্ছেন, কাজটা কী ভালো হচ্ছে? কোন্ মিথ্যে দুরাশায় সেনাইল-হওয়া বেচারীকে কষ্ট পাওয়াচ্ছেন বলুন তো? এমন ছেলেমানুষী করছেন? ওঁদের কালের পৃথিবী যে আর নেই, সে কথাটা ওঁকে কে বোঝাবে? আপনারা যে ওঁর এই পাগলামিতে মদত দিচ্ছেন, এটা কি আপনাদের পক্ষে সততার কাজ হচ্ছে? ওঁর স্বপ্ন যে সত্যি হবে না তা তো আমরা প্রত্যেকেই জানি। আমি, প্রণয়, আপনারা। কী বলুন? জানি না কি? তবু সব জেনেও কেন আপনারা ওঁকে এমন করে নাচাচ্ছেন?

নাচাচ্ছি না। আমরা ওঁকে আদৌ নাচাচ্ছি না।

পর্ণা বললো।

একজন চমৎকার মানুষ, বৃদ্ধ মানুষ, যাতে দুঃখ না পান, যে-ক'টা দিন

আরও বাঁচেন ; যেন আনন্দেই বাঁচেন তারই একটু চেষ্টা করছিলাম মাত্র, আলাপের পর থেকেই।

কলি বললো।

আফটার অল, দাদু তো আপনাদের। আমাদের নয়। আমরা তো পরশু চলেই যাবো। তবু কাউকে সুখী করা কি এতোই অন্যায়? বিশেষ করে, যে মানুষের, বলতে গেলে কেউই নেই সংসারে। সত্যি খুশী করার কেউ তো নেই-ই! একটু মিথ্যে খুশীও কি ওঁকে দেওয়া যায় না?

পর্ণা বললো।

কেউই নেই বলছেন কেন? আমরা তো আছিই।

আহা! দিনে কতটুকু সময় আপনি দেন ওঁর জন্যে? আপনার এই সখের ব্যবসার চেয়ে উনি কি বেশি ইম্পর্ট্যান্ট নন? এই হোটেলের চেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট নন কি উনি?

স্নিগ্ধ দপ্ করে রেগে উঠে বললো, আই থিংক উ্য আর সারপাসিং ইওর লিমিটস্। আরনট্ উ্য?

ওয়েল! অ্যাজ উ্য মে থিংক্।

বলেই, দুটি হাত কাঁধ সমান উঁচুতে তুলে দুটি হাতের পাতা এক করে কলি বললো, কথাটা মনে রাখবো। আমরা দুজনেই। আর এমন বেয়াদপি হবে না।

পর্ণা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে হাতে মুখে 'তুহিনা' মাখছিলো। কলি 'বসন্ত মালতী' মাখে। মাখা হয়ে গেছে।

বিছানাতে আধশোয়া হয়ে বসে কলি বললো, আমাদের দিশি কোম্পানী-গুলোর জিনিস কতই না ভালো বল? তা নয়! অনেকের 'নিভিয়া' 'অয়েল অফ উলে' ইত্যাদি কত কিছু লাগে!

যা বলেছিস। 'ফোরেন' না হলে মন ভরে না। তবু যদি সত্যিই…।

কিন্তু দিশি কোম্পানীরা আর কতদিন? বাঙালীরা ভায়ে ভায়ে আর ভায়রা-ভায়ে ভায়রা-ভায়ে ঝগড়া করে প্রায় সব কোম্পানীইতো লাটে তুলে দিলো। তাছাড়া বিজ্ঞাপনও দেয় না। আজকাল বিজ্ঞাপন না দিলে কি চলে। বাজে জিনিস, বিজ্ঞাপনের জোরেই এক নম্বর হয়ে যায়।

আমেরিকার জেনারাল মোটরস-এর চেয়ারম্যান না প্রেসিডেন্ট কে এসে-ছিলেন অনেক বছর আগে কলকাতায়; একটি মীটিংয়ে বলেছিলেন, 'Advertise or Perish'।

এইসব কনস্যুমার গুডস্ তো বটেই, থার্ড ক্লাস গায়ক, লজ্জাহীন কবি সাহিত্যিক, চিত্রকরও সব এক নম্বর হয়ে যাচ্ছে শুধু বিজ্ঞাপনেরই জোরে। এখন বিজ্ঞাপনই সার। 'যার পেছনে মেডিয়া, সেই যাবে ভোঁদয়া'। প্রণয়বাবুর কথা। তাছাড়া বাঙালী ব্যবসাদারেরা বোধ হয় একটুতেই সন্তুষ্ট। মোটামুটি চলে গেলেই হলো। ব্যবসাতে যে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো উপায়ই নেই একই জায়গাতে! হয় ক্রমাগত ছুটতে থাকো, বাড়তে থাকো, লম্বা করতে থাকো নিজেকে, নয়তো পেছিয়ে পড়ো, এবং অবশেষে থেমে গিয়ে বিস্মৃত হও, দৌড় থেকে কেটে পড়ো, এই অপ্রিয় সত্য কথাটাই বাঙালী ব্যবসাদারেরা বোঝেন না। আশা করি কোনোদিন বুঝবেন। ভবিষ্যতে।

ভবিষ্যৎ বলে কি আর কিছু থাকবে তখন?

আর কী বোঝার সময় আছে? কলকাতা শহরের বুকেই বা বাঙালীর আছেটা কি?

চল্ আমরা চাকরি ছেড়ে দিই। একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করি।

চোখের নিচে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল বুলোতে বুলোতে কলি বললো, করলে মন্দ হয় না কিন্তু। এতো খাটনি ! আর পয়সার বেলাতে…

আরে যে-কোনো ব্যবসাই চাকরির চেয়ে ভালো। যে-কোনো ব্যবসা !

'যে-কোনো' কথাটার উপর খুব জোর দিয়ে বললো পর্ণা।

তুই কি রমলার মতো ব্যবসা করতে বলছিস ? নিজেদের বাড়িতেই ?

কোন্ রমলা ?

আরে রমলা সেন। নিউ আলিপুরের।

কেন জানি না, ওটা আমার পছন্দ নয়। রমলাকেও নয়। ওর ব্যবসাটাও নয়। ব্যবসা বা কাজের জায়গা আর বাড়ি সব সময়েই আলাদা আলাদা করে রাখা উচিত। নইলে, বাড়ির মর্যাদা থাকে না। বসার ঘরে কাস্টোমার, শোবার ঘরে কাস্টোমার, রান্নাঘরে কাস্টোমার। কাস্টোমাররাই বন্ধু, তারাই আত্মীয়, এমন করাটা আমার পছন্দ নয়। রমলাটা পারেও ! নিজের জীবনটাই কেউ জীবিকার জন্যে বিক্রী করে ? আর কত টাকা দরকার ওর ? আর কত ফুটানির ?

রমলা কি করবে ? দোকানটাতো ওর স্বামীর। ওর কোনো say আছে না কি ?

কী জানি বাবা ! আমি যদি কোনোদিন বিয়ে করি, আমার স্বামী, পুরুষ-মানুষ দিনরাত বাড়িতেই বসে থাকবে তা ভাবলেই গা-গোলায় আমার।

কলি বললো।

তোর এতো আপত্তি কিসের ? রমলার নিজের তো কোনো কমপ্লেইন নেই। ওতো বড়লোকী করেই সুখী।

ঠিক আছে। শোবার সময়ে এখন রমলাকে নিয়ে আলোচনা না করলেও চলবে।

ছোট্ট ঘর ভাড়া নেব একটা ব্যবসার জন্যে। নিজেদের পৈতৃক বাড়িতে কি আর এমনি ব্যবসা কবে লোকে ? বাবার বাড়িতে থাকা, বাবার বাড়িতে ব্যবসা ; এ সবই হচ্ছে বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ভাগ্যবানদেরও ? আর ভাড়া ? সেলামী কত দিতে হবে জানিস ?

যতই হোক। জোগাড় করে নেবো। আমরা মেয়েরা প্রত্যেকেরই বাড়িতে যে অব্যবহারের গয়না, নেহাত সেন্টিমেন্টাল কারণে ফেলে রাখি, তা বন্ধক দিয়ে বা বেচে দিয়ে টাকা তুলবো। তুই কি বলছিস ? ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় না ?

পর্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তুই এখনও ছেলেমানুষ।. রাণুকে দেখলি না ? নিজের ব্যবসার স্বপ্নে গর্নেরিয়ালের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিলো। এখন দোকানটাও গর্নেরিয়াল নিজে নিয়ে তার শিক্ষিত মডার্ন ছেলের বউকে দিয়ে দিয়েছে। আর রাণুর চলছে গর্নেরিয়ালের রক্ষিতা হিসেবে। হাই-সোসাইটির রক্ষিতা।

তুই বড় পেসিমিস্ট।

উঁহু। প্র্যাকটিক্যাল। অত বড় বড় ব্যাপার প্রথমেই ভাবলে চলবে না।

প্রথমে ছোট্ট স্কেলে করতে হবে। ধর, আমাদের গ্যারেজে কী তোদের পেছন-দিকের গলির দিকে মুখ-করা কয়লার ঘরে।

কয়লার ঘরে? ব্যবসা কিসের? তা কিছু ভেবেছিস? না, তোর নজরটাই নীচু। কয়লার ঘরে?

পাড়া অনুযায়ী ব্যবসা করতে হবে বইকী। মধ্যবিত্ত পাড়া হলে মধ্যবিত্ত-দের প্রয়োজনীয় গিফট্ শপ্। বই, নানারকম টুকিটাকি প্রয়োজনের জিনিস, রেকর্ড, ক্যাসেট, ছবি আঁকা, লেখালেখির জিনিস, কাগজ, একটু সৌখীন রাইটিং প্যাড, বাচ্চাদের স্কুলে যা লাগে তার যাবতীয় জিনিস। হাতের কাছে পেলে মানুষে দূরে যাবেনই বা কেন? আজকাল যাতায়াতটা যে কতবড় ঝক্কি হয়ে উঠেছে। তাছাড়া একটি সুন্দর ক্যাটালগ ছাপিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে দিয়ে এলে তারা ফোন করে জানালে তাদের বাড়িতেও পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করা যায়। এইভাবে বইয়ের ব্যবসা চমৎকার করা যায়। কলেজ স্ট্রিটের সব প্রকাশকের দোকান থেকে ক্যাটালগ এনে প্রত্যেক বাড়িতে মহিলাদের দেখাবে আমার মেয়েরা। কর্মচারী সব মেয়ে রাখবো।

আর পুরুষদের? তাদের দেখাবি না?

দূর। দূর। পুরুষেরা সব আকাট হয়ে গেছে। লেখাপড়া, গান শোনা এইসব সূক্ষ্মবৃত্তির সঙ্গে তাদের অধিকাংশরই আর কোনো যোগাযোগই নেই। পুরুষগুলো আটারলি অশিক্ষিত। যুগে যুগে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের কদর মেয়েরাই করেছে যে, একথাটা পুরুষ স্বীকার করলো কি না করলো তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু কথাটা সত্যি।

ক্যাটালগ দেখিয়ে কী করবি?

যে-বই আনতে বলবেন, 'আনতে বলবেনই, প্রত্যেক মহিলারই দু-একজন প্রিয় লেখক থাকেনই! সেই সব বই কলেজ স্ট্রিট থেকে কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ ডিসকাউন্টে পাবো। শতকরা। এই ডিসকাউন্ট তো রিটেইলারের ডিসকাউন্ট। আমরা জানিও না যে যে লেখক এক কপি বই বিক্রি হলে যা পান, যে রিটেইলার সেই বই বিক্রি করেন, তিনি লেখকের সমান এবং অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশিই পান। সেই লাভটুকুই আমাদের! একশো টাকার বই বিক্রি হলে কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা লাভ। হিসাবটা বোঝ। তুই এক হাজার টাকা সারা বছর ফিক্সড ডিপোজিটে যদি রাখিস তবে বছরের শেষে পাবি একশো টাকা। এখন বেড়ে হয়েছে একশো কুড়ি টাকা, আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে যদি প্রথম প্রথম সাতদিনেও তুই এক হাজার টাকার বই বিক্রি করতে পারিস তাহলে তোর লাভ হচ্ছে দুশো টাকা। কম করে। টাকাও তোর আটকে থাকছে না। মাত্র এক হাজার টাকা সারা বছর যদি এই ব্যবসাতে খাটাস তবে টাকাটা বাহান্নবার ঘুরবে। অর্থাৎ সারা বছরে হাজার টাকা লাগিয়ে তোর রোজগার হবে ধর দশ হাজার চারশো টাকা। লাভের টাকার সবটা খরচ না করে ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিলে লাভ বাড়বে লাফিয়ে লাফিয়ে! শতকরা কুড়ি ভাগ লাভ কম কথা নয়। অর্ডার পেলে তুই টাকা দিয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে বই এনে সেদিনই বই সাপ্লাই করে টাকা পেয়ে যাচ্ছিস। অনেক প্রকাশকেরা,

তাঁদের সঙ্গে একটু জানাশোনা থাকলে কারো রেকমেন্ডেশান থাকলে, কিছু টাকার ক্রেডিটও দিতে পারেন।

পর্ণা ড্রেসিং টেবল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললো, মন্দ বলিসনি। আসলে বাঙালীর ব্যবসা সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে এমনই যে, এয়ারকন্ডিশানড্ ঘর হবে, সুন্দরী সেক্রেটারী, সোফার-ড্রিভন গাড়ি ; ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকের কোটিপতি অবাঙালী ব্যবসাদারদের অনেকেই যে গোড়াতে মাথায় কাপড়ের গাঁটরী নিয়ে বা স্টেইনলেস স্টীলের বাসন নিয়ে ফিরি করে বেরিয়েছেন তা আমরা অনেকেই জানি না। চল্ ফিরে কলকাতায়। এ নিয়ে সিরিয়াসলি আলোচনা করবো।

কলি বললো, তোকে আমি কড়াইশুঁটির চপ্-এর রেসিপিটা দিতে পারি। শীতকালে, পার চপ পাঁচ টাকা। বড়লোক পাড়ায় যদি করিস দোকান। আর মধ্যবিত্ত পাড়ায় করলে দু'টাকা। দেখিস ! লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কিনে নিয়ে যাবে। শুধুই কড়াইশুঁটির চপ্। আর অন্য কিছু বিক্রি হবে না। সেখান থেকে। কোয়ালিটি যদি ভালো হয়, ভালো হয় কুকিং-মীডিয়াম, আর খেতে যদি স্বাদু হয় তো তোর বিজনেস 'ফেল' কখনওই করতে পারে না। বিশেষ করে, কলকাতার মতো 'কী-খাই' 'কী-খাই' শহরে।

হুঁ। পর্ণা বললো। ভাবতে ভাবতে।

বলেই, কান খাড়া করে রইলো।

কী হলো ?

কলি শুধালো ?

শুনতে পাচ্ছিস না ?

না তো। কি ?

কলি বললো।

বেড়াল কাঁদছে আবার।

নাঃ ! সত্যি তোকে নিয়ে চলে না।

তুই শুনতে পাচ্ছিস না ?

কই ? না তো।

সত্যিই শুনতে পাচ্ছিস না ?

সত্যি না।

তবেই সেরেছে ! দেখলি তো মাকে ফোন করবো ভাবলাম কিন্তু একেবারেই ভুলে গেলাম।

চল্ শুবি চল্। আমার ঘুম পেয়েছে। রোদের মধ্যে হাটে' সারা দুপুর ঘোরাঘুরি করেছি।

ঝড় উঠছে।

বাইরে কান পেতে পর্ণা স্বগতোক্তি করলো।

কলি হেঁটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালো। পেলমেট থেকে ঝোলানো পর্দা সরিয়ে দেখলো, সত্যিই বাগানের গাছপালা খুব জোরে আন্দোলিত হচ্ছে এবং বাগানের আলোগুলোর সামনে বড় গাছের ডালপালা নাচানাচি করাতে

সারা বাগানেই এক দুরন্ত আলোছায়ার নাচন শুরু হয়েছে। কত গন্ধর মিশ্রণে যে এই যূথবদ্ধ গন্ধ এদিক ওদিক ছুটছে তা বলার নয়। ঝড়ের এই রূপে, আলোছায়ার নাচনে, গন্ধর সমারোহে কলি মোহাবিষ্ট হয়ে গেছিলো। এমন সময়ে পেছন থেকে পর্ণা দৌড়ে এসে কলির দু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, জানালা বন্ধ কর, বন্ধ কর শীগগিরি।

চমকে চাইলো কলি পেছনে।

এমনভাবে কলির নাইটিটাকে খামচে চেপে ধরেছে পর্ণা যে মনে হচ্ছে দু কাঁধের জায়গাটুকুই ছিঁড়ে যাবে। মুখ ফিরিয়ে কলি পর্ণার মুখের দিকে তাকালো। দেখলো, ওর দুচোখ অস্বাভাবিক। পর্ণা যে মাঝে মাঝে এমন হিস্টিরিক কেন হয়ে যায় তা জানা ছিলো না।

পর্ণা বললো, বন্ধ কর, কলি। বন্ধ কর।

কলি জানালার পাল্লা দুটি বন্ধ করে দিলো। যখন বন্ধ করলো তখন একবারই শুনতে পেলো বেড়ালের কান্না।

চকিতে পর্ণার দিকে চেয়ে দেখলো ও, না, পর্ণা শুনতে পায়নি। অথচ আশ্চর্য! যখন কলি শুনতে পায় না, ও তখন শুনতে পায়!

ঘরে আরো দুটি জানালা ছিলো। খোলাই ছিলো। কিন্তু পেলমেট থেকে নামানো পর্দাতে ঢাকা। ওগুলোর কাছে গেলো না আর কলি। জানালা বন্ধ করে পর্ণাকে নিয়ে বিছানাতে গেলো।

পর্ণা একটি হালকা কচি-কলাপাতারঙা নাইটি পরেছিলো। পরীর মতো দেখাচ্ছিলো তাকে।

শুয়ে পড়।

কলি বললো একটু বিরক্তির গলাতে।

শুতে শুতে পর্ণা বললো, জানিস, আজ নীলিমাদি আর সুবীরদার কথা খুব মনে পড়ছিলো। তোকে বলেছিলাম তো ওঁদের কথা; বলিনি?

হ্যাঁ। বহুবার।

ড্রেসিং-টেবলের আলোটা নিভিয়ে হাতব্যাগের ছোট্ট টর্চটা জ্বালিয়ে খাটের দিকে আসতে আসতে বললো কলি।

খাটে উঠে টর্চটা নিভিয়ে দিলো। মাথার পাশে রাখলো।

আসলে বাগানের হ্যালোজেন আলোর একটি বড় ফালি লতাপাতার আঁকিবুকি কাজ নিয়ে ছাদের সীলিং-এ এসে পড়ে। আর সেই প্রতিসরিত আলোতে সারা ঘর পাতলা চাঁদের আলোর মতো এক আলোর আভাতে আভাসিত থাকে। আজ জানালা এবং পর্দাগুলো সবই বন্ধ ও টানা থাকাতে ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকার ঘরের মধ্যে পাখার আওয়াজ আলোহীন, শব্দময় আবহ সৃষ্টি করেছে।

ঘুমোলি? পর্ণা?

মাঝে মাঝেই ওর এইরকম মুড-অফফ্ হয়। তাই ভাবলো, হয়তো এখন কথা বলতে চাইছে না।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে চোখ মেলে থাকা যায় না। অথচ আজ হাটের

হাঁটাহাঁটি এবং বিধুভূষণের ঐ হঠাৎ উত্তেজনা বড় উত্তপ্ত ও উত্তেজিত করেছে কলিকে। অনেকসময়ে এক্সারসাইজ বেশি হয়ে গেলেও ঘুম আসতে চায় না। কী করবে ভেবে না পেয়ে চোখ দুটি বন্ধই করে ফেললো।

মিনিট পাঁচেক পর আবার ডাকলো, পর্ণা ঘুমোলি ?

পর্ণা তবু সাড়া দিলো না।

বালিশের পাশে-রাখা টর্চটা নিয়ে পর্ণার মুখে ফেলে দেখলো, পর্ণা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

অবাক হয়ে গেলো কলি। কথা বলতে বলতে এমন করে ঘুমোতে পারে মানুষ ?

কলির ঘুম আসছিলো না। ও বিছানা ছেড়ে উঠে টর্চ জেবলে আস্তে আস্তে জানালা খুললো। আলোর আভাসে ভরে গেলো ঘর। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো কলি। আসলে ইচ্ছে ছিলো পর্ণার সঙ্গে বিধুভূষণের ব্যাপাবটা নিয়ে একটু আলোচনা করবে। বৃদ্ধ ওদের বড়ই ভালোবেসে ফেলেছেন। তাঁর নাতিরাও তো মানুষ খারাপ নন। কিন্তু…।

তবু বিধুভূষণ আর ক'দিনই বা বাঁচবেন ? যদি তাঁকে সুখী করতে মিথ্যে কবেও কিছু কথা পর্ণা আর কলি কাল দুপুরে খাওয়ার সময়ে বিধুভূষণকে বলে যেতে পারে তাহলেও একটা পুণ্যকর্ম করা হবে।

ভাবছিলো, কলি।

বেশ বলেছিলো দলুমা রিকশাওয়ালা। তার বৌ, ভালোবাসায় বিয়ে করা বৌ, বুধি চলে গেলো তারই বন্ধু হুকুব সঙ্গে আর তাতে দলুমা রাগ করলো না একটুও। বুধির সুখ, হুকুর সুখটা যে দলুমারও সুখ ; এই কথাটা এমন সহজ এবং সবচেয়ে বড় কথা, সত্যভাবে বললো দলুমা যে, তাকে সম্মান না করে কোনো উপায়ই ছিলো না কলিব। দলমার জীবনের এই ঘটনার কথাটা বলতে হবে পর্ণাকে। দলুমা এও বলেছিলো, এই-দিশুম্-এ সেই-দিশুম্-এ মেয়ের কি অভাব ? বুধি গেলো তো কী হলো ! সুবর্ণর ব্যাপারে যদি একরম সহজ হতে পারতো পর্ণা, তবে সে আস্তে আস্তে এমন একটা মেন্টাল কেস হয়ে উঠতো না !

ভারী কষ্ট হয় কলির, পর্ণার কথা ভেবে !

তোর এতো অঙ্ক আমার দ্বারা হবে না।

প্রণয় বললো, দু'হাত ওপরে ছুঁড়ে।

কেন ? ক্যালকুলেটর তো আছে।

অথরিটির গলাতে স্নিগ্ধ বললো।

ক্যালকুলেটরে এতো অঙ্ক হয় না, কমপ্যুটার কিনে দে একটা।

দেবো, দেবো। সব দেবো। এটা তো এপ্রিল ? জুন মাস থেকে দেখবি দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে যাবে। তোর তখন যা ঘোরাঘুরি করতে হবে না প্যানা, পাগল হয়ে যাবি। এ-ক'টা মাস ঘুমিয়ে নে।

ঘোরাঘুরি করতে হবে তা জানি কিন্তু আমার একটা মারুতি জিপসি চাই। সাইকেলে করে তো আর মাল বইতে পারবো না।

তুই কী না করিয়ে নিলি আমাকে দিয়ে এ জীবনে!

এখনই কী! জীবনের তো বাকি আছে অনেক।

মহীন্দ্র জীপের একটা নতুন মডেল বেরিয়েছে। ফ্রেশ, পিঁজো এঞ্জিন। ডিজেল। পেছনটা খোলা। তোর পক্ষে আইডিয়াল। মানে একা চড়ার জন্যে।

প্রণয় সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললো, তা বটে। রায়চৌধুরী পরিবারে আমার বাবা কেন যে গাড়ি চালাতে এসেছিলেন! সেদিন থেকেই তো ফেঁসে গেছি আমরা হোল ফ্যামিলি। পেছনটা খোলা রেখেই কি আজীবন চালিয়ে যেতে হবে ?

স্নিগ্ধ হেসে ফেললো প্রণয়ের কথাতে।

এইসব কথা, খেলাচ্ছলেই বলা। তবু মাঝে-মাঝে স্নিগ্ধর মনে হয়, কোনো-দিন এই খেলাটা যদি খেলা আর না থাকে ? বনতলে গ্রীষ্মদিনে শুকনো পাতা খেলা করে পাথরের উপরে। হাওয়াটা সাপুড়ের মতো পাতাদের নিয়ে খেলে সাপুড়েদেরই মতো। কিন্তু কখনো সেই খেলার মধ্যে থেকেই, খেলতে খেলতেই পাতার ঘর্ষণে ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ ওঠে, আগুন লাগে; দাবানল ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিগন্তরে। আরম্ভটা খেলা হলেই যে শেষটাও খেলাই থাকবে তার কেনো গ্যারান্টি কি আছে ?

একটু ক্ষণ চুপ করে রইলো স্নিগ্ধ।

তারপর বললো, একটি জরুরী ক্যালকুলেশন দিয়েছি, মনোযোগ দিয়ে কর। সবসময়ে ইয়ার্কি কি ভালো লাগে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রণয় বললো, এবারে যা উপরে। দাদুর পোলাউ-মাংস নিয়ে। আমি তোর এগুলো শেষ করে চান করবো আরেকবার। তারপর দুটো রাম পেঁদিয়ে তারপরই খাবো। তোমার আপত্তি থাকলে তুমি আগে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে পারো রাজাবাবু।

সখ করে, ও মেজাজ ভালো থাকলে প্রণয় স্নিগ্ধকে রাজাবাবু বলে ডাকে।

তোর খাবার গরম করে দেবে কে?

কালিদা দেবে। না দিলে, বা কালিদা যদি শুয়ে পড়ে তবে নিজেই গরম করে নেবো। আমার তো বিলেতেই থাকায় কথা ছিলো। তুইও গেলি না আমাকেও যেতে দিলি না। গেলে তো রান্না-করা, বাসন-মাজা সব নিজেরই করে নিতে হতো। এখানে থেকেই নবাব হয়ে রইলাম।

তা রাজাবাবুর সঙ্গে থাকলে তো নবাবসাহেব হয়েই থাকতে হবে।

সেই।

আমি যাচ্ছি।

যা। আজ রাতে আবার বৃষ্টি হবে। ঝড়ও হতে পারে। কীরকম লালচে দেখেছিস পশ্চিমের আকাশ?

হুঁ।

বলেই, স্নিগ্ধ চলে গেলো উপরে।

প্রণয় একমনে হিসেবগুলো কষছিলো। এই প্রজেক্ট রিপোর্টের উপরেই ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্স টাকা দেবে। এতে গোলমাল হলেই মুশকিল। অমিতাভ ঘোষ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর; তাকে দিয়ে বলিয়ে দেওয়াতে এবারে মনে হচ্ছে হলেও হতে পারে। হলে ঘোষসাহেবের দয়াতেই হবে। নইলে, ব্যাঙ্ক যে কী বাঁদরামোই করেছিলো এতোদিন তা বলার নয়।

স্নিগ্ধ নেমে এলো যখন, তখন সিগারেটের বাট্-এ চারকোণা অ্যাশট্রেটা ভরে গেছে প্রণয়ের। প্রণয় মনোযোগ দিয়ে মাথা নিচু করে কাজ করছিলো। স্নিগ্ধর আসাটা লক্ষ্য করেনি।

কী রে? হলো তোর?

চমকে উঠলো প্রণয় স্নিগ্ধর গলার স্বরে।

আরো একটা সিগারেটের বাট্ অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললো, নাঃ। এখনও সময় লাগবে।

তাহলে ছাড়। কালকে ভোরে করিস। চল্ এখন। কালিদাকে বলবো আমার আর তোর খাবারটা ঘরেই দিয়ে যাবে। আমার ঘরেই দিতে বলছি। চট করে চান করে নে। কালিদারও ছুটি হয়ে যাবে। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেলো। কালিদার তো আবার ভোরে উঠতে হবে।

ঠিক আছে। কিন্তু গণদাদার ব্যাপারটা কাল একটু ইনভেস্টিগেট করতে হবে।

কী আবার ইনভেস্টিগেট করবি। বড়বাবুর প্রেসার বাড়তে পারে, আর গণশাদার বাড়তে পারে না ? মানুষ তো রে বাবা, না কি ? কোনো মানুষকেই, সে একদিন মুখ ফসকে বা শরীর খারাপ নিয়ে কী বলে ফেললো না ফেললো তা দিয়ে বিচার করতে নেই। বিচারটা সবসময়েই টোটালিটির উপরে হওয়া উচিত। গণশাদা দাদুর জন্যে যা করে, ঠাকুমা নিজেও অতখানি করতেন না। অন্য দেশ হলে গণশাদাদের সোনা দিয়ে ওজন করে তা দিয়ে রিটায়ার করিয়ে দেওয়া হতো।

প্রণয় কিছু বললো না। শুধু বললো, তা ঠিক।

চান করছিলে স্নিগ্ধ আর প্রণয় যে যার ঘরের বাথরুমে, এক-তলার অন্য দিকটাতে।

প্রণয়ের মনটা ভালো না। নানা কারণে। মায়ের সঙ্গে কাল একটু মনো-মালিন্য হয়েছে। কাল সারাদিন তো বাড়িতেই ছিলো। চিকনডিহ্ গ্রামের পাহাড়-এর মেয়ে সুগার সঙ্গে প্রণয়ের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা মায়ের বহুদিন থেকেই। অথচ প্রণয় জানে যে, সুগার সঙ্গে অনেক বছরের প্রেম আছে হুলুক পাত্থরের বিড়ি-পাতার ব্যবসাদারের ম্যানেজার হুলুক সাঁওতাল-এর সঙ্গে।

তাছাড়াও, স্নিগ্ধকে ছেড়ে, এই পরিবেশ ও জীবন ছেড়ে প্রণয় থাকতে পারবে না। এবং পারবে না বলেই ওর বিয়ে করতে হবে পুরোপুরি কোনো বাঙালী মেয়েকেই। এই পর্ণার মতোই কাউকে।

বাবা বাঁটু রুদ্র মাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন বলেই তাকেও যে সাঁওতালি সমাজেই ফিরে আসতে হবে বৈবাহিক সূত্রে এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া হন্‌সো তো রামদয়ালকে বিয়ে করছেই। বোন সাঁওতাল বিয়ে করলো আর ও করবে বাঙালী। বাবা মায়ের হিসাব ঠিক রইলো।

কিন্তু বিয়ে তাকে করছেটা কে ? 'বড় লোকের চামচে', এটা তো একটা কোয়ালিফিকেশন নয়। ···পর্ণার মতো মেয়ে··· । ভালো লাগলেই তো হলো না···

তাছাড়াও ও যখন সন্ধের আগে সাইকেলে ফিরছিলো চিকনডিহ্ থেকে 'রায়চৌধুরী লজ'-এ তখন দেখেছে ও পর্ণাকে সাইকেল রিকশা করে স্টেশনের দিকেই যেতে। এবং স্নিগ্ধও একটু পরেই বেরুলো স্টেশনে ব্যাঙ্কের অতিথিদের আনতে, গাড়ি নিয়ে। স্নিগ্ধ কি গাছেরও খাবে তলারও কুড়োবো মনস্থ করেছে ? কলি তো স্নিগ্ধরই। একবারওতো কলির দিকে ওর মনকে ও যেতে দেয়নি। পালিয়ে-যেতে-চাওয়া মুরগিরই মতো প্রণয় তার অবাধ্য মনকে দুহাতে চেপে ধরে দু উরুর মধ্যে গুঁজে রেখে বসে থেকেছে যাতে মন কলির দিকে দৌড়ে না যায়। তার কী এই পরিণাম। এই কী বন্ধুত্ব ?

স্নিগ্ধ ভাবছিলো, শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে, সাবান মাখতে মাখতে দাদুর কথা। দাদু একটু ড্রাঙ্ক হয়ে গেছেন আজ। জীবনে কখনও ড্রাঙ্ক দেখেনি দাদু অথবা বাবাকে। দাদুর জন্যে কষ্টও হয়। প্রত্যেক মানুষকেই হয়তো জীবনে এমন একটি বয়সে পৌঁছতে হয় এসে, যখন নিজের নিজস্ব কোনো ইচ্ছা বা সাধ আর বেঁচে থাকে না। নিজের ইচ্ছা এবং সাধকে অন্যের জীবনে

স্থানান্তরিত করে, আরোপ করে, সেই রোপিত ইচ্ছার বীজকে ফুল-ফলন্ত দেখতে বড় অধৈর্য হয়ে ওঠেন মানুষ। দাদুর এখন তেমনই অবস্থা। কলি আর পর্ণা খুবই বুদ্ধিমতী, সফিস্টিকেটেড এবং অ্যাকমপ্লিশড মেয়ে। ওদের জন্যে চিন্তা নেই। ওরা মনে কিছু করবে না ; করে নি। কিন্তু অন্য কেউ হলে? দাদুর জন্যেই এই 'মন্দার হোটেল'কে অচিরে 'For Mens only' করে দিতে হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাহলে কি চলবে হোটেল ?

সকলেই যদিও বলে 'লস'-এ এই হোটেল চালিয়ে লাভ কি ? 'লস'-এ আদৌ চলে না। গড়ে, মাসে তার হাজার পাঁচেক প্রফিট থাকেই। তাতে ওর আর প্রণয়ের পকেট খরচ তো চলে যায়, নিজস্ব প্রয়োজনের খরচও। সামান্য দান-খয়রাতিও। বর্তমানে চললেই হলো। ভবিষ্যৎ-এর কথা এক্ষুণি ভাবে না।

তবে সত্যি কথা বলতে কী কলিকে দেখবার পর থেকে স্নিগ্ধ ভবিষ্যৎ-এর কথা একটুও যে ভাবে না বা ভাবছে না তাও নয়।

হোটেলের রিসেপশানে ম্যানেজারের যেখানে টেবল-চেয়ার, সেই চেয়ারে বসে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখা যায়। তারই দুই ডালের মাঝে অনেক পাখি বাসা বেঁধেছে। বাসা বসন্তে বেঁধেছিলো। এখনও আছে। কী করে একটি একটি করে খড়-কুটো ঠোঁটে করে নিয়ে এসে যে তারা বাসা বেঁধেছিলো তা লক্ষ্য করেছে স্নিগ্ধ। কেন যে এ বছরেই লক্ষ্য করলো, কে জানে! কলিরা আসবার পর থেকে ওর নিজের মধ্যেও ঐ রকম বাসা বানানোর ইচ্ছা জেগেছে যেন অবচেতন মনে। এমন বোকা বোকা প্রাগৈতিহাসিক রোম্যান্টিক চিন্তা তার মনেও যে কোনোদিনও আসতে পারে তা ভাবেনি স্নিগ্ধ কখনও। অথচ এই বোকামির জন্যে নিজেকে কিন্তু বকা-ঝকা করতেও ইচ্ছে যায় না। এক ধরনের দুর্বোধ্য প্রশ্রয়ের বোধ কাজ করছে এখন ওর মনের ভিতরে ক'দিন হলো। একেই কি প্রেমে পড়া বলে না কি ? ইডিয়টিক। একটা ইডিয়ট হয়ে উঠছে স্নিগ্ধ রায়চৌধুরী। মাস্টারমশায়দের গর্ব, অধ্যাপকদের চোখের মণি, সতীর্থদের ইন্‌ডিস্‌পেন্‌সিবল স্নিগ্ধ।

ছিঃ ! ভাবা যায় না?

চান করে গরমের দিনে কখনও গা মাথা তোয়ালে দিয়ে মোছে না প্রণয়। এই এক জংলামি আছে তার। গ্রাম্যতাদোষ। বাথরুম থেকে বেরিয়ে জল-গড়ানো ভিজে চুল ও গায়ের উপর পায়জামা পাঞ্জাবি চড়িয়ে রাম্‌-এর বোতলটা নিয়ে স্নিগ্ধর ঘরে এলো ও বাথরুম স্লিপার ফট্‌ফটিয়ে।

কী খাবার ?

দাদুর জন্যে যখন হলো তখন কালিদা আমাদের জন্যেও রহিমকে বলে···। দ্যাখ হট-কেস-এ করে দিয়ে গেছে। হাউ থটফুল অফ হিম !'

বাঃ। ঝুগ্‌ ঝুগ্‌ ঝিও। ঝুগ্‌ ঝুগ্‌ ঝিও।

বর্গ 'জ'কে ঝ করে উচ্চারণ করে প্রণয় ইচ্ছে করে। জিকে বলে ঝি, জীকে বলে ঝী ; যেমন পাঁড়েজীকে পাঁড়েঝী ! লোকে জিগগেস করলে বলে, সি-পি-এম প্রত্যয়।

খাবি নাকি একটু রাম্‌ ? এক ফালি লেবু দিয়ে ?

বরফ আছে ঐখানে। কালিদা দিয়ে গেছে।

স্নিগ্ধ বললো।

বাঃ। দেবো তবে? তোকে?

দে একটু।

বাবাঃ, আজ কোন্ দিকে সূর্য উঠেছে? মনটা খুব খুশি খুশি লাগছে বুঝি রাজাবাবু!

বলেই, গান ধরে দিলো, 'ইচ্ছা করে, পরানডাহারে, গামছা দিয়া বান্ধি-ই-ই-ই…ইচ্ছা করে…'

স্নিগ্ধ চুপ করে রইলো।

রাম্ ঢেলে, বরফ দিয়ে, একটুকরো লেবু আর জল দিয়ে এগিয়ে দিলো প্রণয়। বললো, লিঝিয়ে রাজাবাবু।

স্নিগ্ধ হাতে নিয়ে চুমুক দিতেই প্রণয় বললো, দ্যাখ ছিঁদো, তোর কাছে জীবনে কিছুমাত্রই চাইনি। আজ তোকে একটু খুশি খুশি দেখে একটা জিনিস চাইতে খুব ইচ্ছা করছে। একটা ভিক্ষা। দিবি?

রাম-এর গ্লাসে একটা চুমুক দিতেই হুড়গুম দুরগুম করে ঝড় এলো।

প্রণয় লাফিয়ে উঠে বললো, দাঁড়া। জানালা বন্ধ করে আসি। নইলে আমার ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

কিসের ছবি?

পরে বলবো।

স্নিগ্ধও উঠে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলো। প্রচণ্ড ঝড় এসেছে। সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। গেল। সব আমের বোল আর লিচুগুলো নষ্ট হয়ে গেলো। বাগানের মধ্যের হ্যালোজেন ভেপার আলোটা পাগলের মতো মাথা নাড়াচ্ছে দুপাশে। গাছপালারা অগণ্য হাত উপরে ছড়িয়েছে তো না যেন মনে হচ্ছে ডাইনীর চুল উড়ছে। সঙ্গে ফুল উড়ছে, ঝরা পাতা; আর গন্ধ।

প্রণয় ফিরে এলো। এসে, একঢোকে রাম্টা শেষ করে বললো, দিবি তো? ভিক্ষাটা? উস্স্! বাইরে একেবারে পেলয় নাচন চলছে।

ঢং না করে বল্, কি চাস?

দিবি কি না বল্ আগে?

যেন আমার আজ্ঞার অপেক্ষাতেই আছিস চিরটাকাল!

তাহলে দিবি। ফাইন।

বল্।

একটা বৌদি চাই।

স্নিগ্ধ রাম্-এর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলো, একটা হেঁচকি তুললো। কিছুটা তারল্য ছিটকে গেলো।

হাসতে হাসতে ও বললো, অনুমান করেছিলাম বাঁদরামো একটা করবি। তবে এই কথাটা ভাবিনি।

ইয়ার্কি ছাড়ো। উত্তরটা দাও।

ছেলেমানুষী করিস না। এবারে যাবো।

আমার একজনকে পছন্দ হয়েছে খুব। তাকেই আমি বৌদি করতে চাই।

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ বললো, দ্যাখ প্যানা, সবসময়ে সব ইয়ার্কি ভালো লাগে না। তোরওতো বয়স হচ্ছে। সব জানিস শুনিস। দাদুকে কী করে ট্যাকল করবো আর ওদের কাছেই বা মুখ রাখবো কী করে এই ভেবে রাতে আমার ঘুম হচ্ছে না···। আর তুই···।

রাতে কার যে কেন ঘুম হচ্ছে না, সে তো জানার উপায় নেই অন্য কারোই। যাই হোক, তোর কথা মেনেই নিলাম।

প্রণয় বললো।

সব জেনেও ইয়ার্কি ভালো লাগে না।

কী সীরিয়াস প্রবলেম! কাল দুপুরেই দাদু কী করবেন তাতো আমি জানি। তুইও জানিস। ওবাও জানে। এখন ওরা কী বলবে অনুমান করতে পারি। ওরা কীই বা বলতে পারে? সত্যি। দাদুকে নিয়ে চলে না। সেনি-লিটি এসে গেলে বোধহয় মানুষের চলে যাওয়াই ভালো।

সেনাইল বলছিস কেন? বড় দাদুতো সেনাইল হননি। আর যদি কোনো-দিন হনও তো আমরা ওঁব মৃত্যুকামনা করার কে? উনি হচ্ছেন আমাদের মহাগুরু। সকলেবই। লাস্ট অফ দ্যা মোহিকানস্। দোতলার বারান্দাতে আর ঘরের সাম্রাজ্যেই পড়ে থাকেন যদিও কিন্তু একবার ডাকলেই আমাদের সকলকেই দৌড়ে যেতে হয়। বড়দাদু না থাকলে আমাদের কি হবে তা ভেবেছিস একবারও?

কী হবে?

সংসাবে মান্য করবার, ভয় করবার একজন মানুষও থাকবে না আমাদের। এই পৃথিবীতে ভয় পাওয়ার আর ভয় পাওয়াবার একজনও মানুষ যাদের জীবনে নেই তাদের মতো অভাগা আর কারা হতে পারে!

সেটা ঠিক। খুব সুন্দর করে বললি কথাটা কিন্তু তুই!

নে, খা এবারে। হট-কেসএ থাকলেও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খাবার।

তুই আরম্ভ কর। আমি আরও দুটো রাম্ খাবো। আমার জীবনে আর কী আছে বল? সারাদিন তোর খিদমদ্গারী করি শুধু দিনশেষে এই একটু রাম্ খাবার জন্যে।

"দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগলো চিতে'। গানটা শুনেছিস? সেদিন পর্ণা গাইছিলো বাগানে ঘুরে ঘুরে। নিজেকে শোনাবারই জন্যে। কিন্তু আমিও শুনেছি আড়াল থেকে। শুকনো ডাল কাটছিলাম বোগোনভোলিয়ার'। দেখতে পায়নি আমাকে।

আমিও শুনেছি।

তুই কোথায় ছিলি?

তোর আজ্ঞানুসারে বনবিড়ালদের ভয় পাওয়াতে গেছিলাম।

কই? বন্দুক তো চাসনি।

হাঃ! তুই শিকারী হয়েও এমন কথা বলিস! বাঘ কোথায় থাকে? কখন থাকে? এসব আগে জানবো, তারপরে তো ভয় পাওয়াবো। বাঘের মাসীর

বেলাতেও একই নিয়ম।

সে কথা থাক! আমার মনে হচ্ছে তোর দিনশেষে রাম্ খাওয়া ছাড়াও অন্য অনেক কিছু করবার ইচ্ছে যেন প্রবল হয়েছে মনে হচ্ছে!

ইয়ার্কি রাখ্। জানালাটা খুলে দে তো। ঝড় বোধহয় থেমে গেছে এতক্ষণে। বাঁচা গেলো। আবার দিনকয়েক প্রেজেন্ট থাকবে ওয়েদার।

তুই শুধু তোর কথাই ভাবছিস। আমের মুকুলগুলো সব গেলো। লিচুও গেলো।

যাকগে যাক। অনেক আম লিচু খাওয়া হয়েছে। প্রতি বছর মুকুল আসবে। লিচুর ফুলও।

জানালা খুলে দিতে দিতে স্নিগ্ধ শুনলো, বেড়াল কাঁদছে বাগানে। প্রণয়ও শুনেছে। স্নিগ্ধ কিছু বললো না। প্রণয় বললো, এঁরা আবার কাঁদেন কেন! বনবিড়ালগুলোই বা গেলো কোথায়? দূর! আমার মন ভালো লাগে না বেড়াল কাঁদলে।

থামতো। যত আজে বাজে কুসংস্কারের কথা। তোর লজ্জা করে না?

লজ্জার কি আছে? সংস্কার-কুসংস্কারতো মানুষের আদিমতম সঙ্গী। তোর নেই, ভালো কথা। কিন্তু কেন? তোর সেই সাহেব বন্ধু, গিলিগান্ না কী নাম যেন? কালো বেড়াল আমাদের সামনে পথ পেরিয়েছিলো বলে পনেরো মিনিট গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেনি? সাহেব বলেই মেনে নিলি আর আমার বেলায় যত দোষ!

স্নিগ্ধ উত্তর দিলো না। খাবার বের করে প্লেটে তুলে নিলো।

হঠাৎ প্রণয় বললো, বড়দাদুর মধ্যে এই একটা পরিবর্তন নজর করেছিস? কিছুদিন হলো?

কি?

অন্যমনস্ক গলাতে বললো স্নিগ্ধ।

বুড়ো যেন জ্বলে উঠেছেন। চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে যেমন উজল হয়ে ওঠে না···

বাবা; তোর আবার কাব্যিরোগ হলো কবে থেকে?

সঙ্গদোষে সব রোগই হয়, কাব্যিরোগ থেকে এইডস্।

তবে বলেছিস ঠিক। এই মেয়ে দুটি এসেই দাদুকে যেমন জাগিয়ে দিয়েছে তেমন···

প্রণয় বললো, শুধু কি বড়দাদুকেই? তোর মতো মড়া পর্যন্ত জেগে গেলো।

আঃ। সবসময় তোর এই······

কী বলছিলি বল?

বলছিলাম, দাদুকে যেমন জাগিয়ে দিয়েছে তেমন এদের দেওয়া আঘাতে চিরদিনের মতো নিভে যাওয়াও দাদুর পক্ষে আশ্চর্য নয়।

প্রণয় কোনো উত্তর দিলো না সে কথার।

কিছুক্ষণ বাদে স্নিগ্ধ বললো, জানিস প্যানা, আজই ভাবছিলাম, দাদুর

খাওয়া দেখতে দেখতে যে, আমাদের উচিত ওঁকে আরো অনেক বেশি সঙ্গ দেওয়া, ওঁর কাছে থাকা, ওঁর সঙ্গে গল্প করা। মানুষ বৃদ্ধ হলে শিশুর মতো হয়ে যান। অথচ আমরা একজন শিশুকে যে সময় দিই তার এককণা সময়তো দিই না বৃদ্ধদের। আমরা বোধহয় ভুলে যাই যে, আমরাও একদিন বুড়ো হবো।

কথাটা ঠিক। দাদু বড়ই খুশি হন আমরা কেউ কাছে থাকলে। তাছাড়া, আমরা বোধহয় খুব বোকাও। অমন একজন মানুষের সারাজীবনের অভিজ্ঞতার ছিটেফোটাও পেয়ে নিজেদের কত উপকার হতো অথচ আমরা দাদুকে মানুষ বলেই গণ্য করি না।

মানুষ বলে গণ্য করবো না কেন।

করি কি? যে সময়টুকু তুই টাটার দুটি অশিক্ষিত রাম্-সেবীদের কাল রাতে দিলি সেই সময়টুকুও কি রোজ দাদুকে দিতে পারিস? অথচ তোর এই 'মন্দার হোটেল' থাকলো কী উঠে গেলো তাতে কীই বা আসে যায়! দাদুতো অনন্তকাল এখানে থাকতে আসেন নি। তাঁর কাল তো শেষই হয়ে এলো। ইন্তেকাল-এর দেরী নেই বেশি। আমি যেটা বলছি, সেটা ম্যাটার অফ প্রায়রিটির কথা। বুঝতে পেরেছিস আশা করি।

হুঁ।

খেতে খেতে বললো, স্নিগ্ধ। বিষণ্ন মুখে।

প্রণয় এবারে খাবারটা নিলো।

স্নিগ্ধ উঠে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে সোফাতে বসলো ডান পায়ের উপর বাঁ পা তুলে। ধোঁয়া ছেড়ে বললো, প্রজেক্টটা আরম্ভ না করতে পারলে হাতে পায়ে মস্তিষ্কে মরচে পড়ে যাবে। বুঝলি! নিজেদের বড়ই অকর্মণ্য বলে মনে হয় আজকাল! একবার এই ভাবনা পেয়ে বসলে আর রক্ষা নেই। কত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রদের দেখেছি, বড় কিছু করবো করবো করতে করতে একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো জীবনে। কত সুন্দরী গুণবতী মেয়েকে দেখলাম, দারুণ বিয়ে করবো করবো করতে করতে সারাজীবন অবিবাহিতই রয়ে গেলো, বিয়েই আর করা হলো না। জীবনের সবু ব্যাপারেই একটা সময়-সীমা থাকেই। তার মধ্যেই ঘটনাটা ঘটাতে না পারলেই তা বাররড্ বাই লিমিটেশান্ হয়ে যায়।

ইয়েস।

প্রণয় বললো, মাংস খেতে খেতে।

একী! পোলাও খেলি না?

তুই তো জানিস, পোলাউ মিষ্টি লাগে বলে খাই না আমি।

তুই কি জামাই, বাড়ির? কালিদাকে বললেই তো ভাত বা রুটি' দিতো।

কালিদাকে বলে কি হবে! কোনোদিন কোনো বাড়ির জামাইতো হবো। তখন শাশুড়িকে আগে থাকতেই লিস্টি ধরিয়ে দেবো পছন্দ অপছন্দের।

সে আশাতেই থাকো। সে সব শাশুড়ি আর এক-শৃঙ্গ গণ্ডার ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। রেয়ার স্পেসি।

প্রণয় বললো, আমার হয়ে গেলো। দাঁড়া, বাসনগুলো পৌঁছে দিয়ে আসি, নইলে তোর ঘরে গন্ধ ছাড়বে রাতে।

বেলটা দিয়ে দে না।

যাঃ! কালিদা এখন চানটান করে পুঁটিকে নিয়ে খেতে বসেছে, মেয়ে-বাবাতে। এখনও কি ডাকা যায়। পুঁটিটা আবার রাম্-এর গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারে না।

সে কি! তুই কি ওর মুখের কাছে রাম্ খেয়ে মুখ নিয়েছিলি না কি?

বড় বাজে কথা বলিস। একদিন ঘরে এসেছিল খাবার নিয়ে। ঘরে বসে রাম্ খাচ্ছিলাম। ঘরে ঢুকেই বললো, ম্যাগো! প্যানাবাবু, কী ইঁদুরপচা গন্ধ গো তোমার ঘরে!

স্নিগ্ধ হেসে উঠলো।

প্রণয় বললো, তুই শুয়ে পড়! সুইট ড্রিমস্। গুড নাইট।
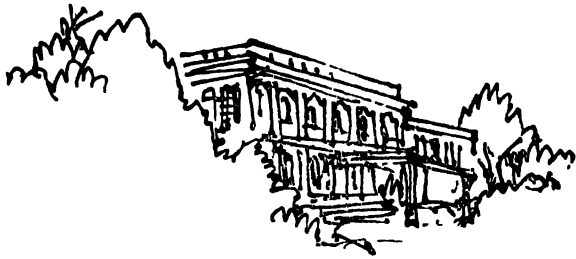
হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেলো কলির।

বাগানের আলোটা এসে ঘরে পড়ায় তার প্রতিসবণে অন্ধকার কেটে যায়। পর্ণা ঘুমোচ্ছে অঘোরে। কলি উঠে বাথরুমে গেলো একবার। তারপর জানালার কাছে গিয়ে জানালা সব খুলে দিলো। ঝড়-বৃষ্টির পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। স্নিগ্ধর দাদুর ঘর-বারান্দার দিক থেকে সরোদের শব্দ ভেসে আসছে। ক্যাসেট অথবা লং-প্লেয়িং রেকর্ড? কান খুলে শুনলো ও। খুব নিচুগ্রামে বাজছে, যাতে অন্য কারো অসুবিধা না হয়।

কি রাগ?

একটু পরই বুঝতে পারলো। মালকোষ।

বাজনা শুনতে শুনতে অনেক কথা ভাবছিলো ও।

গভীর রাতে এবং অন্য সময়েও সেতার, সরোদ, সন্তুর, সুরবাহার, বেহালা যে বাজনাই হোক না কেন তার একটা অন্য আবেদন থাকে। যে-কোনো কণ্ঠ সঙ্গীতই শ্রোতার বিশেষ ব্যক্তিগত মনোযোগ প্রত্যাশা করে। সুনন্দা পট্টনায়ক, শ্রুতি সাডোলিকার বা কিশোরী আমনকার-এর গানের ক্যাসেট চালিয়ে দিলে সামনে বসেই শুনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যন্ত্রসঙ্গীত অনেকটা অনুষঙ্গেরই মতো। আকাশে, বাতাসে, ঝরাপাতায়, ফুলের গন্ধেও তা মর্যাদা পায়। অনুরণিত হয়। মানে, এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, যন্ত্রসঙ্গীত অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক। হয়তো এতেও ঠিক বোঝানো যায় না কথাটা। মনে মনে যা বলতে চাইছিল।

আলি আকবর বা আমজাদ খান বা নিখিল চক্রবর্তীর' বাজনা শুনতে শুনতে, চান করা যায় বা রান্নাও করা যায় বা মনোমতো কাউকে চিঠি লেখা যায় কিন্তু গলার গান বাজালে তা সামনে বসেই শুনতে হয়। এইটে যেমন কণ্ঠসঙ্গীতের বিশেষত্ব তেমনই যন্ত্রসঙ্গীতের বিশেষত্ব। এই কারণেই হয়তো এবং অবশ্যই ভাষার বেড়া নেই বলেই; সমস্ত যন্ত্রসঙ্গীতই এতো সহজে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পারে। কণ্ঠসঙ্গীতের আবেদন মুখ্যত কোনো বিশেষ ভাষাভাষীদের কাছে, আর যন্ত্রসঙ্গীতের আবেদন সর্বজনীন; সর্বদেশীয়।

বাজনা এবং ছবি বুঝতে কোনো বিশেষ ভাষার ব্যুৎপত্তি লাগে না কারণ মানুষের সভ্যতার গোড়ার দিকেই ছবি ও বাজনাকে সে সঙ্গী করেছিলো। মুখের ভাষা তার ছিলো অবশ্যই এবং সে ভাষা কাগজে লিখে রাখার এবং মুদ্রণের ক্ষমতাও সে অর্জন করেছিলো সভ্যতার পথে অনেকদূর এগিয়ে আসার পরই। সেই কারণেই সাহিত্যের জগৎ অনেক বেশি সীমিত। কিন্তু তা মননের জগৎ। ছবি দেখে বা গান শুনে সমস্ত শ্রেণীর মানুষই কিছু না কিছু মতামত দিতে পারেন, যদিও তাঁদের ভালো লাগার প্রকাশ বা প্রকাশের মান হয়তো ভিন্ন হবে। কিন্তু সাহিত্যের জগতে কোনোদিনই সকলের প্রবেশাধিকার ছিলো না। কণ্ঠসঙ্গীতও সাহিত্যেরই মতো ভাষা-ভিত্তিক বলেই অত সহজে আন্তর্জাতিক হতে পারে নি যন্ত্রসঙ্গীত বা ছবির মতো।

জানালাতেই দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ কলি। কী আশ্চর্য সুন্দর সুগন্ধী রাত। অথচ কলি একা। এমন রাতে মালকোষের ভরসাতে কালোছায়া ঢলে-পড়া সাদা মার্বল-এর বারান্দাতে একজন বৃদ্ধ একা বসে রয়েছেন। তিনিও একা। বড় এক্কা। এই বাড়িরই একতলার অন্যপ্রান্তেই সুস্থ, ভদ্র, সভ্য দুই যুবকের বাস। তাঁরাও একা, তাদের স্বপ্ন-দেখা দীর্ঘ রাতে। পর্ণাও একা। ঘুমে অচেতন। একটু গভীরভাবে ভাবলেই বোঝা যায় যে, ওরা সকলেই একা।

যে-কোনো সৌন্দর্য বা শান্তিরই, যেমন এই জ্যোৎস্নালোকিত রাতের ; নিজের মধ্যে কোনো অপূর্ণতা নেই কিন্তু তার অনুষঙ্গে কতই না দীর্ঘশ্বাস, অপূর্ণতা ; অসঙ্গতি। এই জন্যেই বোধহয় কথায় বলে, কোনো কিছুই অবিমিশ্র সুখের বা দুখের নয়। অবিমিশ্র অনুভূতির নয়। জীবনও অবিমিশ্র সুখ বা দুখের দ্যোতক নয়। অনেক ছাড়তে হয় এখানে, তবেই অনেক আঁটে। যা আঁটে, তাকেও আবার জেটিসান্ করে ফেলে দিতে হয় জীবনের তরীকে বাঁচাবার জন্যে মাঝদরিয়াতে এসে। পর্ণা যেমন করেছে সুবর্ণকে।

এতো সব হিসাব-নিকাশ বোঝা ভারী মুশকিল। বোঝার চেষ্টা করাও বোধহয় উচিত নয়। জীবনে প্রণয়ের মতো বাঁচাটাই হয়তো সবচেয়ে বুদ্ধি-মানের মতো বাঁচা। জলের উপরে ভাসা কুটোর মতো। কোনোদিনই তার ডুবে মরার ভয় নেই।

বেড়াতে এসেছে কলি, বেড়াবে-টেড়াবে, খাবে-দাবে, যা করছেও ; মজা করবে, পড়ে পড়ে ঘুমোবে, কমে-যাওয়া জীবনীশক্তিকে পূরিত করে আবার গিয়ে কাজের জোয়ালে লাগবে, এই জন্যেই তো এসেছিলো এই নিদপুরাতে!

কিন্তু কেন যে এতো ভাবে! এই মুহূর্তেই ওর মনে হচ্ছে যে, শুধু নিজেরটুকু নিজে'তো কত কিছু করেই জুটিয়ে নেওয়া যায় ; মিটিয়ে নেওয়া যায়, তবু শুধু পেট ভরাবারই জন্যে কেন এই বিষম প্রতিযোগিতা ? বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশে চড়ার মতো নিরন্তর উন্নতির চেষ্টায় সবসময়েই তাকে সচেষ্ট থাকতে হবেই বা কেন ? কলি এও ভালো করেই জানে যে, কোনোদিনও ও যদি ওদের কোম্পানীর এম.ডি.-ও হয় তবেও তার হাহাকার যাবে না কখনওই। তাছাড়া, যা-কিছুই হারিয়ে ও সেই চেয়ারটি পাবে এবং যখন পাবে, তখন সেই চেয়ারের প্রকৃত তাৎপর্য আর কতটুকুই বা থাকবে তার কাছে ? এই

জীবন, এই লেখাপড়া-শেখা, এই চাকরি-খোজা, চাকরি-পাওয়া, চাকরি টিকিয়ে-রাখা, উন্নতি-করা, বন্ধু-পাওয়া, ভালোবাসা, বিয়ে-করা, সংসার-করা, ছেলেমেয়ের জন্ম-দেওয়া, তারপর একদিন চোদ্দ বছর বয়সী, লোম-ওঠা অশক্ত কুকুরের মতো করুণার পাত্র-হওয়া, বুড়ো-হওয়া ; এই যুগ যুগ ধরে মেনে নেওয়া সুপ্রাচীন বৃত্তটিকে কি কোনোখানে নিয়ে গিয়ে নিরিবিলিতে টেনে-হিঁচড়ে দুমড়ে-মুচড়ে চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ বা অক্টাগোনাল্ করে দেওয়া যায় না ? এতোদিনের সব মেনে-নেওয়া অভ্যেসকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ?

পারলে বেশ হতো। জীবন, অন্য কিছু নতুন কিছুর দ্যোতক হতে পারতো !

কলি ভাবে।

বিধুভূষণের আজ বড়ই দুঃখ হয়েছে।

গণশার ব্যবহার আজ তাকে তাঁর সারাজীবনের বিশ্বাস-অবিশ্বাস আশা-আকাঙ্ক্ষাকে টলিয়ে দিয়ে গেছে। তার ভিত ধরে টান দিয়ে সংসারের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে খোল-নলচেসুদ্ধু পালটে দিয়ে গেছে। জীবনের শেষে এসে যখন এই জীবনের গতিপ্রকৃতি বদলে দেবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাই তাঁর হাতে নেই ঠিক তখনই এই আঘাত যে তাঁকে পেতে হবে তা তিনি ভাবেন নি।

অন্য মানুষে হয়তো বলবেন, বাড়াবাড়ি। বলবেন, বেদনা-বিলাস। কিন্তু সে-কথা বললে তাঁরা অন্যায় করবেন বিধভূষণের প্রতি। বিধুভূষণ ভাবছিলেন।

মানুষটি অগণ্য মানুষকে খুশী করার জন্যেও তো কম করেন নি এক-সময়ে। তখন তো কেউই বলেন নি যে, তিনি সুখ-বিলাসে নিমজ্জিত ! যে-কর্মকে অন্যর সুখদায়িনী বলে মনে করেছেন তাই করেছেন আজীবন ! তাই যাদের জন্যে এতো কল্লেন, তারাই তিনি চলে যাবার আগে এমন ব্যবহার করবে তা স্বপ্নেরও বাইরে। যখন প্রত্যাশা সবচেয়ে বাড়ে তখনই বোধহয় আঘাত আসে।

তখনও হুইস্কি খাচ্ছিলেন বিধুভূষণ। এতো হুইস্কি একসঙ্গে গত তিরিশ বছরে খান নি। অন্ধকারে আজকাল চোখ-বন্ধ অবস্থাতে তিনি নানারকম আলো দেখতে পান। বহুবর্ণ আলো। চোখের পাতার নিচে। তবে বেশিই উজ্জ্বল নীল ও সবুজ। তাঁর বন্ধু রমেন বলেছিলেন : 'তোর সেরিব্রাল অ্যাটাক হবে।'

আজকাল সকলেই ডাক্তার। রিটায়ারমেন্টের পর এককেজন মানুষের এককেরকম বাতিক হয়। রমেনের ডাক্তারীর বাতিক হয়েছে। তবে, অবসরপ্রাপ্ত মানুষদের বাতিকটাই তো জীবন ! বেঁচে থাকবার অথবা নির্মম বাস্তব থেকে পালিয়ে যাবার একমাত্র পথ।

তাঁর আরেক বন্ধু বলেছিলেন, কী রে ? শুনিসনি তুই ? বাঙালদের একটা প্রবাদ আছে :

‘জন, জামাই, ভাগ্না
কভু না-হয় আপনা।’

মানে কি?

বিধুভূষণ ভ্রূকুঞ্চন করে শুধিয়েছিলেন। এই ‘রেফ্যুজি’দের প্রতি তাঁর কোনোদিনই বিশেষ দুর্বলতা ছিলো না।

‘জন’ মানে কাজের লোকজন। জামাই। এবং ভাগ্নে, মানে আমাদের বোনপো। এরা নাকি কখনও আপন হয় না। না, তুমি যতই করো তাদের জন্যে। বুঝেছো।

সেদিন কথাটা শুনে উনি হেসেছিলেন। কিন্তু আজকে মনে হয়, রমেন ঠিকই বলেছিলেন। থুড়ি, মানে ‘রেফ্যুজি’দের প্রবাদটা সত্যি! বাঙালগুলো ইন্টেলিজেন্ট হয়।

বিধুভূষণের বুকে শুধু গণশাই নয়, প্রত্যেকটি কাজের লোক-এর প্রতি যে দরদ ছিলো তা যে-কোনো জনদরদী নেতার পক্ষেও শেখবার।

কার জন্যে কী-না করেছেন! করার জন্যে করেন নি, মানে, করে তাদের কৃতার্থ করেন নি। তাদের সমানভাবে দেখেছেন বলেই করেছেন। গণশার ছেলেরা সবাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত, একজন বিহার স্টেট সার্ভিসের অফিসার, অন্যজন ডাক্তার। চাঁইবাসাতে প্র্যাকটিস করে। জামাই সেলস-ট্যাক্সের ইনসপেক্টর। দশ বিঘে হালের জমি, এক জোড়া বলদ, বাড়ি, টিউবওয়েল সবই উনি নিজেই গণশার জন্যে করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর খরচও উনিই দিয়েছেন।

আজ কেবলই মনে হচ্ছে যে, এতোখানি করাটা বোধহয় উচিত হয় নি। গণশার প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে পড়াশুনা শেখানোটা উচিত হয় নি। আজকে কেউ-কেটা লোকেদের বাবা আর শ্বশুর হয়ে গিয়ে বিধুভূষণের সেবা করতে ইজ্জতে লাগে গণশার। অথচ এইসব সুযোগ না দিলে গণশার আজও বিধুভূষণের পদতল ছাড়া গতি ছিলো না। যাদের কৃতজ্ঞতাবোধই নেই তাদের জন্যে কিছুমাত্রই করতে নেই। ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অনুসারে কোন শ্রেণীর কর্মীর কত বাজার দর তা জেনে নিয়ে তাকে সেই হারেই মাইনে দেওয়া উচিত। উপরি হিসেবে চারবেলা খাওয়া, কাপড়-চোপড় বছরে দু’বার, মাস দুয়েকের মাইনে পুজোর সময়ে, পয়লা বৈশাখে। ব্যস্‌স্‌। আর কিছুই নয়। আপনজন ভাবা নয়। তাদের সুখ দুঃখে বিচলিত হওয়া নয়। তারা অন্য শ্রেণীর, বিধুভূষণ অন্য শ্রেণীর। তেলে-জলে মিশ খায় না। কখনইও নয়। উনি বুর্জোয়া, বুর্জোয়া হয়েই চিরদিন থাকা উচিত ছিলো। প্রলেতারিয়েত নামক এই সমষ্টি এমন নিমকহারামী করতে পারতো না তবে ওঁর সঙ্গে।

বাঙালেরা ঠিকই বলেন, কী যেন কথাটা?

‘জন, জামাই, ভাগ্না,
কভু না-হয় আপনা।’

ঠিক।

গণশা শুধু সেই সময়েই যে তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে তাই নয়,

কালির মেয়ে পুঁটি তাকে বলেছে, 'জানেন বড়দাদু! গণশা জ্যাঠা-না,. আপনাকে খচ্চর বলে।'

কী বলে?

খচ্চর।

তাই?

হ্যাঁ বড়দাদু।

বিধুভূষণের এই নোংরা পৃথিবীর বিচিত্রগতি জানার কথা নয়। গণশার সৌভাগ্যে ঈর্ষাকাতর কালি যে তার মেয়েকে দিয়ে মিথ্যে করে তাঁর কাছে চুকলি করাচ্ছে একথা তাঁর ভাবনারও বাইরে। এই পৃথিবীতে অনেকই গলিঘুঁজি। বিধুভূষণ সোজা মানুষ বলেই তাঁকে ওয়েলেইড করে খুন করে দেওয়া সোজা। মানে, তাঁর সারল্যকে; শান্তিকে।

এই গণশার যখন সতেরো বছর বয়েস, তখন তার যক্ষ্মা হয়েছিলো। সেকালে যক্ষ্মার কোনো চিকিৎসা ছিলোই না বলতে গেলে। বন্ধু ডাক্তার রণেশ বললেন, ওকে দেশে পাঠিয়ে দাও। মাস দুয়েক থাকুক সেখানে। সেই যুগে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে মানি-অর্ডার পাঠাতেন বিধুভূষণ, প্রতি মাসে মুরগি-ডিম সব খাবার জন্যে। আজকের দিনে সেদিনকার পঞ্চাশ টাকার দাম দু'হাজার টাকা হবে।

কিন্তু ওর একার খাওয়ার জন্যে কি করে পাঠান? অভাবের সংসার। সকলে মিলে খাবে তাই পঞ্চাশ টাকাই পাঠাতেন। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে।

সবই ভুলে গেছে গণশা। আজকের কেউকেটা নিমকহারাম। হারামজাদা। ডাক্তারের বাবা, এ. ডি. এম-এর বাবা, সেলস ট্যাক্স ইনসপেক্টরের শ্বশুর তুই। তোকে অন্য দশজন মালিক যেভাবে চাকরদের রাখে সেইভাবে রাখলে আজও তো তুই শুধু আমার উপরে নির্ভর করতিস। বিধুভূষণ স্বগতোক্তি করলেন, না না, এদের লাই দিতে নেই। কক্ষনো স্বাবলম্বী করে দিতে নেই। ওদের চিরজীবন পরনির্ভর করে রাখলেই বিধুভূষণদের আখেরে সুবিধা। মানুষ যদি বেড়াল-কুকুরদের চেয়েও ছোট হয়; নীচ হয়, তবে তাদের জন্যে এতো দরদ রাখাটাই ভুল হয়েছে তাঁর। গণশা তাঁর বুকে যে আঘাতটা দিয়েছে তা বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

বাটু এসেছিলো ড্রাইভারী করতে। অবশ্য সে অন্যরকম মানুষ ছিলো। তবু তখনকার দিনে কী এখনকার দিনেও, ড্রাইভারকে তো মানুষ ড্রাইভার হিসেবেই দেখতো বা দেখে! তার ছেলে প্রণয় এবং মেয়ে হনুস্যোকে তো নিজের নাতি-নাতনির মতো করেই মানুষ করেছেন।

অবশ্য বাটু ছিলো প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ। য়্যুনিভার্সিটির ছাপ গঁছিলো না বলেই হয়তো তার শিক্ষায় কোনো খাদ ছিলো না। কিন্তু বাটুও তো গণশার মতোই ব্যবহার করতে পারতো। তার অকাল মৃত্যুর আগে এক-মুহূর্তের জন্যেও বাটু বিধুভূষণকে দুঃখ দেয়নি। মানুষটার কোনো লোভ ছিলো না জাগতিক। গাড়ি চালাবার দরকার হতো না শেষের দিকে। কারণ.

বিধুভূষণ বাইরে বেরুনো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তবু ড্রাইভার ছিলো। ছেলের গাড়ি চালাতো তখন। সব ড্রাইভারদের উপরে ছিলো বাঁটু। সাইকেল নিয়ে আসতো রোজ ঠিক ডিউটির সময়ে চিকনডিহ্ থেকে কাঁটায় কাঁটায়। সারাদিন লাইব্রেরী ঘরে বসে পড়াশুনা করতো। এখানে কিছু খেতো না, বিকেলের এক কাপ চা ছাড়া। তারপর ডিউটি যখন শেষ হওয়ার কথা, তখন সাইকেলে উঠে চিকনডিহ্‌তে চলে যেতো। ওর বাড়ি পাকা করে দেওয়ার কথা তিনি আর তাঁর পুত্রও কতদিন বলেছেন! বাঁটু বলতো, ঐ গ্রামের পরিবেশ ঐ একটি পাকা বাড়ির জন্যেই নষ্ট হয়ে যাবে বড়বাবু। লোভ জাগবে সকলেরই মনে। আমি এমন ক্ষতি করতে পারবো না ওদের গ্রামের। বেশ তো আছি এতো মানুষের সঙ্গে, এতো মানুষের মতো—এতে যা আনন্দ তা কি নিজে বড়লোকী করে হতো?

অথচ ঐ গণেশ শালা এমনই লোভী, একবার বলতেই জিভে লাল এসে গেছিলো। তার বাড়ি পাকা। ছোট ছেলেটা ভটভটিয়া হাঁকিয়ে তার দোকানে যায়। সে দোকানও করে দিয়েছিলেন বিধুভূষণই।

নাঃ। যা করে ফেলেছেন করে ফেলেছেন। ওকে কালই তিনি ছাড়াবেন। ওরকম নীচ চরিত্রের মানুষের কোনো সেবাই অরে তিনি গ্রহণ করবেন না। সে কিনা তাঁকে বলে 'খচ্চর'! কী কারণে বলে? কারণটা কি?

শব্দটা উচ্চারণ করতে গেলেও কষ্টে বুক ভেঙে যায় তাঁর।

পর্ণা পাশ ফিরে শুলো ঘুমের মধ্যে। সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলো।

স্টেশনের প্লাটফর্মের একটি বেঞ্চে বসে আছে ও প্রণয়ের সঙ্গে।

দূর থেকে পায়জামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক হেঁটে আসছিলেন! হাঁটার ভঙ্গীটা একটু অভিনব।

পর্ণা সেদিকে তাকাতেই প্রণয় বললো, চুরুলিয়াতে বাড়ি নিশ্চয়ই এই স্যাম্পেলের।

সেটা কোথায়?

ঐ। পুরুলিয়ার কাছে!

চেনেন আপনি ওকে!

আমি? না।

চেনেন না? তবে জানলেন কি করে? দেখেছেন কোথাও আগে?

না তাও না।

সে আবার কী!

আমি যা বললাম, বা বলি, তাই ঠিক। দেখবেন?

বলতে বলতেই ভদ্রলোক প্রায় ওদের একেবারে সামনেই পৌঁছে গেছেন ততক্ষণে।

হঠাৎই প্রণয় উঠে পড়ে বললো, একসকিউজ মী! দাদার বাড়ি নিশ্চয়ই চুরুলিয়াতে।

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, হ্যাঁ! আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

আমি পুরুলিয়ার ইনকাম ট্যাক্স অফিসের ক্লার্ক! ইউ. ডি. সি.।

প্রণয় বললো।

তাই?

বলতে বলতেই ভদ্রলোকের মুখ কালো হয়ে গেলো।

প্রণয় বললো, আপনাকে ইনকাম ট্যাক্স অফিসেই দেখেছি তাহলে। তাই নয়?

হবে।

বলেই, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।

প্রণয় বললো, দেখলেন তো! দেখেই বুঝেছি ব্যবসাদার। আর গ্রামের লোকমাত্রই পুলিশকে ভয় পায় আর শহর এবং আধা-শহরের লোক ইনকাম ট্যাক্সকে। ঠেকায় তো 'উড়ো খই গোবিন্দায়ে নমঃ'। আরে সকলে যদি ট্যাক্সোই দিতো তবে কি দেশের এই অবস্থা হতো? না, যারা দেয়, তাদের দমবন্ধ হতো? ইনকাম ট্যাক্সের ক্লার্ক বলতেই মুখের জিওগ্রাফি একেবারে পালটে গেলো।

পর্ণা হাসছিলো। পর্ণা বললো, চেনেন না, তা চুরুলিয়ার লোক তা বুঝলেন কি করে?

ঐ! তা না হলে কি আমার নাম প্রণয় রুদ্র। ঐ একমাত্র জায়গাই আপনাদের মা দুর্গা, আমাদের যত বুরু সবাই মিলে সৃষ্টি করেছিলেন। সেখানকার···

সেখানকার কি?

সেখানকার··। আচ্ছা ভদ্রলোকের হাঁটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখলেন?

পর্ণা বললো, হ্যাঁ। কী রকম করে যেন হাঁটেন।

ঐতো! আমি চুরুলিয়ার মানুষকে রেলস্টেশনে, কী এয়ারপোর্টে, কী রাস্তায় দেখলেই বলে দিতে পারি যে উনি চুরুলিয়ার মানুষ। দুটি হাত আর দুটি পা একই সঙ্গে চারটি বিভিন্ন দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাঁটতে একমাত্র চুরুলিয়ার মানুষই পারে। আপনি উঠে চেষ্টা করুন। ধাঁই করে পড়ে যাবেন প্লাটফর্মে চিৎপটাং হয়ে। পারলে, একশো টাকা বাজী। উঠুন।

পর্ণা হো হো করে হাসছিলো। প্রণয়ের সঙ্গে থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে, কী করে কেটে যায়! হয়তো সারা জীবনটাই এমন হাসতে হাসতেই কেটে যেতে পারতো। যদি···

কলি বললো, কী হয়েছে! এই পর্ণা, কি হয়েছে তোর? হলোটা কি?

পর্ণা উত্তর দিলো না। ঘুমের মধ্যে হাসি থেমে গেলো। তারপর কী একটু বিড়বিড় করে আবার অন্য পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো।

কলির ঘুম আসছিলো না। যদিও ও এসে পর্ণার পাশে শুলো কিন্তু ঘুম এলো না।

কলি ভেবেছিলো, ওর যৌবন আর কতদিন থাকবে? এই আকর্ষণ? চেহারার এই বাঁধুনি? মুখের এই সজীবতা? পথে, ঘাটে, অফিসে, বাসে, ট্রামে পুরুষদের এই লোভাতুর দৃষ্টি আর কতদিন তাকে রোমাঞ্চিত করবে?

ওর মতো বয়সে সব মেয়েই বর্তমানের গৌরবে,তার সমারোহেই মোহাবিষ্ট থাকে। পনেরো দশ এমনকি পাঁচ বছর পরের কথাও একবারও মনে আনে না। কিন্তু তখন বসন্ত যাবে! যদি বাসা বাঁধতেই হয় তবে এখনও, মানে এক-দু'বছরের মধ্যেই বাঁধতে হবে। যৌবনে কুকুরীও সুন্দর। কিন্তু এই নির্মম সত্যি কথাটা মানুষীরা কোনোদিন বোঝা তো দূরের কথা—মানতে পর্যন্ত চাননি।

কলির মনটা বড় উচাটন হলো। সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কী যে করবে তা ভেবেই পায় না। কিছু একটা করতে হবে বলে তো আর আগুনে বা জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না, পর্ণার মতো। তারপরে দীর্ঘ অনুশোচনার জীবন। অথচ তবু কিছু একটা করতেই হবে আর ছ'মাস একবছরের মধ্যে। কলকাতাতে কত পুরুষই তো তাকে ভালো-বাসে। ফোন করে, আসে; ফ্রাইডে বা স্যাটারডে নাইটে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে যায়, রবিবার দুপুরে লাঞ্চে। কিন্তু কলি বুঝতে পারে যে, ওদের সকলেই কলির শারীরিক সান্নিধ্য খোঁজে। প্রায় সবাই-ই। বড়-আদর করতে চায়। কিন্তু কলি তো ভিতরে ভিতরে এখনও কনসার্ভেটিভ। এখনও নানা এবং নানারকম বাধার বেড়াজাল তার মধ্যে কখনও কখনও বিদ্রোহী হতে চাওয়া মনকেও বার বার নিষেধ করে। অথচ পশ্চিম দেশে স্বাবলম্বী মেয়েরা তো জীবনকে জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দেয়, জীবনকে ভোগ করে, চেটেপুটে খায়, তারপর আবার ভাঁটিতে অন্যত্র ফিরে আসে। জোয়ারের পরই যে ভাঁটা এই সত্যটা ওরা জোয়ারের তীব্রতম পুলকের চরমে থাকার সময়ও মনে রাখে। তাই ভাঁটিতে ফিরতে ফিরতে নদীপারের শক্ত, ছায়াদাত্রী, বিশ্বস্ত কোনো গাছতলিকে নির্বাচন করে তার নিচে কুঁড়ে বানিয়ে বাকি জীবন পান্‌সির মাঝির সঙ্গে কাটিয়ে দিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থিতু হয়। রবীন্দ্রনাথের সেই গান আছে না? সত্যি। আজও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া গতি নেই ওদের। ধন্য বঙ্গ-ভূমির বুদ্ধিজীবীরা আর তাদের চিল-চিৎকার, ফাঁকা-হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়ে 'হালুম্‌' 'হুলুম্‌' করে বাঘের ডাক! ময়ূরপুচ্ছ পরা একদল কাক এরা। এরাই রাজা মহারাজা! পুঃ।

"আশ মেটালে ফেরে না কেহ
আশ রাখিলে ফেরে।"

কলি যদিও শুয়ে পড়েছিলো, তবু একবার উঠে ড্রেসিং টেবলের সামনে গিয়ে বসে ড্রেসিং-টেবলের আলোটা জ্বালালো। দেখলো, নিজেকে একবার। সিন্ডারেলার মতো আয়নাকে জিগেস করতে ইচ্ছা করলো, আয়না, বলো তো কে বেশি সুন্দরী? তুমি না আমি? কে?

আয়নার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কলির দু'চোখ জলে ভরে এলো।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বুকের মধ্যেই যে একজন ছেলেমানুষ বাস করে তার খোঁজ কেউ রাখে না। সে নিজেই তো নয়ই!

সৃষ্টির এই বিপুলতার ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই মন আর মান দিয়ে বড় জটিল করে রেখেছেন সৃষ্টিকর্তা। সে সুখী হয়েও সুখী নয়! সে সবসময় ভাবে আর ভাবে আর ভাবে। যে কারণে তার প্রতিটি কর্ম বা কর্মহীনতাই মস্তিষ্ক-নির্ভর। মস্তিষ্করই দাস সে। হৃদয়, তার চোখের সামনে কিশলয়ের আর পলাশের শিমুলের সবুজ লাল ধ্বজা নাড়ায়, কোকিলের বুক হু-হু করা ডাক হয়ে আসে। আর মস্তিষ্ক ভিতর থেকে কেবলই ধমকায়। চুপ। চুপ করো। থামো! বলে, ভেসে গেলেই পস্তাবে। নৌকো বেঁধে রাখো। গা-আলগা কোরো না।

অথচ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে চিরদিনের এক তীব্র বাসনা থাকে, জোয়ারে ভাসবার, হৃদয়ের হাতে হাতে রেখে বিবাগী হওয়ার ; সেই বাসনা তাকে কুরে কুরে খায়। তার বসন্তের গান, তার হৃদয় ; তাকে দলছুট করিয়ে দূরে নিয়ে যেতে চায় আর তার মস্তিষ্ক তাকে দলবদ্ধ করে রাখতে চায় ঘেরাটোপের মধ্যে। হৃদয় ফিরিওয়ালা হয়ে গোড়ালিতে ঝুমুর বেঁধে ঝুমঝুমিয়ে নেচে যায়, খুশি ফিরি করে, বহুবর্ণ-পাঞ্জাবি-পরা হাত নেড়ে নেড়ে। আর রাশভারী মস্তিষ্ক, চোগা-চাপকান পরে ইয়া-ইয়া গোঁফ ঝুলিয়ে টাক মাথা নিয়ে বলে, বোসো খুকি, চুপ করে বোসো ; সুখ পাবে। হৃদয়ের খুশিতে ভেজাল আছে। তুমি নিজেই বুঝতে পেরে ছুঁড়ে ফেলবে দুদিন বাদে। কিন্তু আমার সুখ থাকবে, স্থায়ী হবে ; নিত্য হবে।

মানুষের অনিত্য অস্থায়ী জীবনে স্থায়ী ও নিত্য বলে যে কিছুমাত্র নেই এই কথা ভালো করে জেনেও মানুষ মস্তিষ্কর এই টাকে-চুল-গজানোর ওষুধের বিজ্ঞাপনে চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছে। আশ্চর্য!

এই মানুষকে বাঁচাবে কে? যদি নিজেই সে নিজেকে না বাঁচায়?

কলি জলভরা চোখে আয়নায় চেয়ে বললো, কি? তুমি কি নিজেকে বাঁচাবে? হৃদয়ের নবীন সাথী হবে? না মস্তিষ্কর নস্যি-নেওয়া মুহুরীবাবু বা নায়েব? বলো?

স্নিগ্ধবাবু, বলুন, প্লীজ বলুন! আপনি কি বাঁচাবেন আমাকে? প্রণয়-বাবু, আমাদের বাঁচাবেন?

স্নিগ্ধর ঘুম ভেঙে গেলো। ভীষণ পিপাসা পেয়েছে ওর। ঐসব খাওয়ার অভ্যাস নেই। জানে না, একটি রাম্-এই অমন হলো, না বেশি রাতে পোলাউ মাংস খাবার জন্যেই হলো!

উঠে জল খেলো ও, ড্রেসিং টেবলের পাশের সাইড টেব্‌ল-এ রাখা জাগ থেকে। তারপর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চাঁদ দিগন্তে ঢলছে ; রাত নিশ্চয়ই এখন দুটো থেকে তিনটে হবে।

হঠাৎই কানে এলো উপর থেকে ভেসে-আসা সরোদের শব্দ। কী রাগ তা বুঝলো না স্নিগ্ধ। ও সব বোঝে না। তবে ভালোবাসে। শুনতে ভালো লাগে। মনটা এই দৈনন্দিনতা এই খাড়া-বড়ি-থোড়, থোড়-বড়ি-খাড়া থেকে অন্যত্র উধাও হতে চায়।

কিন্তু দাদু এখনও বাজনা শুনছেন? শোননি এতো রাতেও? তাহলে হুইস্কিও খাচ্ছেন নিশ্চয়ই।

বড়ই চিন্তা হলো স্নিগ্ধর দাদু জন্যে। দরজাটা খুলে, চটি পায়ে গলিয়ে পা টিপে টিপে উপরে গেলো। সিঁড়ি থেকেই দেখতে পেলো যে, দরজা খোলা হাট করে। অন্যদিন গণশাদা দাদুর পাশের ঘরে শোয়। আজ সে নেই। খুবই অন্যায় করেছে। সে যে থাকবেনা, তা জানালে স্নিগ্ধ অথবা প্রণয় কেউ থাকতো। কালিদাকেও বলতে পারতো থাকতে। দরজাটা অমন হাঁ করে খোলা, বারান্দায়ও আর চাঁদের আলো নেই। জোলো অন্ধকার।

স্নিগ্ধ দোতলার বারান্দায় উঠে এলো। দেখলো, দাদু ইজিচেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। গাঢ় ঘুম। ডান হাতটি বাড়ানো, শ্বেতপাথরের টেবলের উপরে রাখা। হাতের মুঠিটি হুইস্কির গ্লাসের কাছে। বোতলটি খালি হয়ে গেছে। বাগান থেকে বৃষ্টি-ভেজা শেষ-চৈত্রর রাত শেষের তীব্র মিশ্র গন্ধ এসে ঘর-বারান্দা ভরে দিয়েছে। দাদুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলো স্নিগ্ধ অনেকক্ষণ। তারপর ঘরে গিয়ে বিছানা থেকে বালাপোশটি এনে তাঁর গায়ে ভালো করে দিয়ে দিলো। হুইস্কির গ্লাসের কাছ থেকে হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে হাতটিকে কোলের উপর রেখে বালাপোশ তুলে আবার ঢেকে দিলো। দাদুর জ্ঞান নেই। অজ্ঞানের মতো ঘুমোচ্ছেন নেশার ঘোরে। ঘরে গিয়ে রেকর্ড প্লেয়ারটা বন্ধ করে দিলো। বছর কুড়ি আগে কেনা সোনোডাইন্-এর। এখনও চমৎকার পারফরমেন্স্। স্নিগ্ধই দাদুর সঙ্গে গিয়ে পছন্দ করেছিলো টাটাতে গিয়ে, বিষ্টুপুরের একটি দোকান থেকে। তখন স্নিগ্ধর বয়স এগারো-বারো বছর ছিলো বেশি হলে।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো দাদুর জন্যে। তাঁর নিজস্ব দুঃখ কষ্টও কম নেই। কোন্ মানুষেরই বা নেই? মানুষ হয়ে জন্মালে তাকে কষ্ট তো পেতে হবেই! তবু সেই মুহূর্তে নিজের কষ্টর কথা মনেই এলো না। শুধু দাদুর কষ্টর জন্যে মনের মধ্যে ভীষণই .কষ্ট হতে লাগলো। অথচ জীবনে পূর্ণতার এতো কাছাকাছি খুব কম মানুষেই আসতে পারেন। তেমন মানুষকেও যদি দিনশেষে, বলতে শোনে, 'সব ভুল করেছি, সবই ভুল করেছি' তবে তো যে শোনে তার বুকও হাহাকারে ভরে যায়। এই যদি পূর্ণতার শেষ পরিণতি তবে তো অপূর্ণ থাকলেই হয়। বড় একা হয়ে গেছেন দাদু। অথচ তাঁর চারদিকে ঘিরে জীবন ঠিকই চলেছে। দুরন্ত দুর্বার গতিতে, কালিঝোরার বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে-যাওয়া বর্ষার তিস্তার মতো তুমুল কলরোলে জীবন আবর্তিত হচ্ছে। তারই কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছেন দাদু! স্থির, অনড়; বলতে গেলে চলচ্ছক্তিহীন।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

ল্যান্ডিংয়ে নামতেই দেখল কলি। নিশ্চয়ই ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছে। শুধুই নাইটি পরে। হাউসকোট পরার সময় পায়নি। অবশ্য রাতের বেলা পুরো প্যাসেজটা অন্ধকারই। বাইরে যে আলোগুলো জ্বলে তা থেকেই যতটুকু আলো আসে তাতেই অন্ধকারটা জোলো হয় মাত্র।

আপনি ?

স্নিগ্ধ বললো।

দাদু ?

আপনি কী করে জানলেন ?

নিচু পর্দাতে বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম। সারা রাত। এখন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো।

হ্যাঁ। আমিই বন্ধ করলাম।

কেমন আছেন ?

ঐ। একেবারে ড্রাংক হয়ে বারান্দাতেই চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছেন। গায়ে বালাপোশ দিয়ে এলাম। জানি না, ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা লেগে গেছে কি না! হুইস্কির গরম চলে গেলেই ঝপ্ করে ঠাণ্ডা ধরে নেবে।

তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে স্নিগ্ধ বললো, যান! শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আই অ্যাম সরী।

কলি বললো, সো অ্যাম আই।

বলেই বললো, আপনি……

স্নিগ্ধ একেবারে তার বুকের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো। স্লিপিং-স্যুটের টপ-এর বোতাম খোলা। ঘন-লোমে-ভরা বুক থেকে কিউটিকুরা পাউডারের সুগন্ধ আসছিলো। আর ওডিকোলনের।

স্নিগ্ধ বললো, কী ? আমি কি ?

আপনি খুব ভালো। ভালো মানুষ।

বলেই, স্নিগ্ধর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো হ্যান্ডশেক-এর মতো করে। স্নিগ্ধও হাত বাড়ালো। হাতের সঙ্গে হাত লাগতেই দুজনের শরীরেই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো।

এমনও হয় নাকি ?

স্নিগ্ধ ভাবলো।

কলিও ভাবলো, এমনও হয় ?

চলুন, আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

চলুন।

পাছে পর্ণা বা অন্য কেউ শুনতে পায়, তাই আধখোলা দরজায় দাঁড়িয়ে, প্রায়ান্ধকার প্যাসেজের মধ্যে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী সুপুরুষ, বুদ্ধিমান স্নিগ্ধকে হাত তুলেই নিঃশব্দে বিদায় জানালো। স্নিগ্ধ হাত না তুলে হাসলো। তারপর হঠাৎই, যে একগুচ্ছ অলক কলির কপাল গড়িয়ে ডান কপোলে এসে পড়েছিলো, তাকে তুলে কানের পেছনে করে দিয়েই চলে গেলো।

ঘটনাটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটলো যে কিছু বোঝার আগেই শেষ হয়ে

গেলো।

গরম হয়ে উঠলো কান। গরম হয়ে উঠলো সারা শরীর। জীবনে আর কারো ছোঁয়াতে এতো আনন্দ এবং কষ্ট পায়নি কলি।

যেখানে স্নিগ্ধর হাত লেগেছিলো গালে, সেইখানটাতে তর্জনী চেপে রাখলো কিছুক্ষণ! তারপর নিঃশব্দে দরজাতে ছিটকিনি লাগিয়ে ঘরে এসে শুলো।

কিন্তু ঘুম কি আসবে?

আজ রাতে?

পর্ণার যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলো কলি তখনো ঘুমোচ্ছে। গভীর ঘুম। একটু অবাক হলো পর্ণা। কলি খুব ভোরেই ওঠে। নিদপুরাতে না এলে, একঘরে পাশাপাশি না শুলে, এইসব ব্যক্তিগত অভ্যেসের কথা এমন করে জানতেও পারতো না।

আজ কলির ঘুমন্ত সুখ-জর্জর মুখ দেখে মনে হচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে যেন কোনো রূপকথার রাজকুমার এসে ওর গালে চুমু খেয়ে গেছে শেষ রাতে। নাইটির বুকের দ্বিতীয় বোতাম খোলা। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে উঠতে-নামতে থাকা ঘুমন্ত-কলির বুক দুটিকে দুটি গোলাপী-রঙা পদ্মর মতো দেখাচ্ছে। সুবর্ণর সঙ্গে যে-ক'দিন ছিলো, সে-ক'দিনে জেনেছে পর্ণা যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে পুরুষদের পেট ওঠানামা করে, আর মেয়েদের বুক।

কলকাতায় যে-পরিচিতি কুড়ি বছরের, সেই পরিচিতিই অন্য মাত্রা পায় কলকাতার বাইরে একসঙ্গে দুদিন থাকলেই। নিদপুরাতে এসে ওদের এতো-দিনের বন্ধুত্বর রকমটাও অনেকই বদলে গেছে। না এলে, জানতো না। অথচ ওরা কতদিনের বন্ধু!

দরজাতে কে যেন টোকা দিচ্ছে। কালিদাই হবে। কালিদা খুবই বিবেচক। ভোরের চা নিয়ে এসে কখনও বেল বাজায় না, পাছে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় ওদের। একদিন অনেকক্ষণ টোকা দিয়েও, সাড়া না পেয়ে, চা নিয়ে ফিরেও গেছিলো। যদিও ওদেরই বলে দেওয়া সময়ে নিয়ে এসেছিলো চা।

পর্ণা গিয়ে দরজা খুললো। নাইটির উপরে হাউসকোটটা জড়িয়ে নিয়ে।

কালিদা হেসে বললো, একটু দেরী হয়ে গেলো আজ। কাল রাতে শুতে শুতেও একটু দেরী হয়ে গেছিলো তো! দিদি কি উঠেছেন?

ওঠেননি। তবে তুমি ট্রে-টা এখানেই রেখে যাও। এখুনি উঠে যাবেন।

দরজা থেকে বিছানা দেখা যায় না। যখন বাড়ি তৈরী হয় তখনই ঘরটার একপ্রান্ত এল্-শেপ্এর করা হয়েছিলো। অতদিন আগে এই সব খুঁটি-নাটির দিকে কেউই নজর দিতেন না! তাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছিলো প্রথমে ওরা।

কালিদা ট্রে-টা নামিয়ে রেখে দিলে পর্ণা বললো, থ্যাঙ্ক'উ্য! এসো তুমি

কালিদা।

আরেকটা কথা ছিলো।

কালিদা বললো।

কি ? বলো।

আজ তো বড়বাবুর ওখেনে আপনাদের নেমন্তন্ন ছিলো দুপুরে। সেটি কেন্‌সেল হয়ে গেছে।

পর্ণা একটু অবাক হলো।

বললো, ক্যানসেল হয়ে গেছে মানে ? কে ক্যানসেল করলেন ?

এঁজ্ঞে ম্যানেজারবাবু।

ইতিমধ্যে ঘুমজড়ানো গলায় কলি বললো, কে রে ? কি হয়েছে ?

তুই বাথরুমে যা। আমি কালিদার সঙ্গে কথা বলছি এখানে। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। উঠে পড়।

কী, হয়েছে কি ? তা তো বলবি ?

এমন কিছুই নয়। চা খেতে খেতেই বলবো'খন।

কি ? কালিদা ? কিছু বলছো না যে !

পর্ণা জেরা করার মতো বললো।

তা নেমন্তন্ন তো বড়বাবুই করেছিলেন কিন্তু তাঁর তো জ্ঞান নেই। ধুন্ধুমার জ্বর। কাল শেষরাত অবধি নাকি বারান্দাতেই বসে ছিলেন আর ঐসব, বলেই, হাতের মুঠি বন্ধ করে বুড়ো আঙুল মুখে ঢুকিয়ে দেওয়ার মুদ্রায় বললো, ঐসব খেয়েছেন ঢুকু ঢুকু। ম্যানেজারবাবু তো সেই কাকভোর থেকে বড়বাবুর কাছেই আছেন। প্রণয়বাবু গেছেন টাটাতে গাড়ি নিয়ে। প্রসাদ ডাক্তারকে আনতে। ডাক্তার না এলে, কী হয় না হয়, কিছুই তো বলা যায় না। একেবারে বে-হোঁশ। শ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। নাড়িও অতি ক্ষীণ।

তাই ? তা তোমার গণশাবাবু কোথায় ?

তিনি তো এখন বড়বাবুর পায়ের কাছেই মাথা দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লেগেছেন। যত্ত ন্যাকামি ! ওর জন্যেই তো কাণ্ডটা ঘটলো। ম্যানেজারবাবু আমাকে বলে গেছেন আপনাদের বলে দিতে যে, আজ দুপুরের খাওয়াটা হোটেলেই। ওপরে নয়।

তারপর একটু থেমে বললো, এখন আমি যাই।

এ আর কী এমন জরুরী কথা যে, সাত সকালেই বলতে হবে ? তোমার ম্যানেজারবাবু বড় ব্যস্তবাগীশ। আমরা কি খবরটা পরেই জানতে পারতাম না ?

চা খাওয়া হলে বেল দেবেন, এসে ট্রে নিয়ে যাবো। আর ব্রেকফাস্ট খেতে কি ওখানে যাবেন ! না, ঘরে এনে দেবো ?

না, না। আমার চা খেয়ে চান করে একবার উপরে যাবো। বাবু কেমন আছেন তাঁর খোঁজ নেবো না গিয়ে ? এতো ভালোমানুষ। চমৎকার মানুষ, দেবতুল্য।

সে কী! ব্রেকফাস্ট খেয়েই-না ও দিদিমণি 'চান করতে যান। আজকে ব্রেকফাস্ট আগে খাবেন, না পরে খাবেন?

ও, হ্যাঁ। তাই তো। তবে তুমি ব্রেকফাস্টটা ঘরেই নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি। এখন ক'টা বাজলো?

এখন তো সাড়ে সাতটা।

সাড়ে সাতটা? বলো কী! তাই ভাবি, এতো আলো! তবে তুমি সোয়া আটটাতেই নিয়ে এসো। যা-হয় অল্প কিছু।

কী যে বলেন। তাড়াতাড়ি আনতে হবে বলে অল্প আনবো কেন?

কলি বাথরুম থেকে বেরুতেই পর্ণা বললো, কাল কোথায় গেছিলি রাতে? অভিসারে?

যত বাজে কথা তোর, সকালে উঠেই!

বাজে কথা মানে? তুই কাল শোবার সময়ে বিনুনি তো করে শুসনি? রাতারাতি বিনুনি গজিয়ে গেলো?

ধরা পড়ে গেলো কলি।

কিন্তু বললো, তা তো বটেই। তুই তো কুম্ভকর্ণর মতো ঘুমোস। তুই ঘুমুবার পরে কতবার উঠলাম, কতবার শুলাম। তোর মতো কি সুখী লোক আমি যে, শুলাম আর ম'লাম!

তা শুয়ে পড়ার পর ডন-বৈঠক মারাটা তো কারোই কর্তব্যর মধ্যে পড়ে না। এদিকে কি হয়েছে, শুনলি? তোকে বলিনি আমি? বেড়াল কি আর অমনি অমনি কাঁদে? কান্না শুনেই আমার মনে 'কু' ডেকেছিলো। আমি জানতাম এরকম কিছু হবে একটা। দেখলি তো! মনেও করালি না একবার! মাকে একটা ফোন করতেই হবে আজকে।

কি হয়েছেটা কি, তা বলবি তো?

স্নিগ্ধবাবুর দাদুর জ্ঞান নেই। জ্বরে বেহোঁশ। কাল নাকি বারান্দাতেই বসেছিলেন। সারারাত। আর খুব নাকি ড্রিঙ্ক করেছেন। হাই প্রেসারের রুগী।

তা তো আমি জানি। সারারাত প্রায় সকাল শুনছিলেন। সরোদ। সেই জন্যেই তো বার বার জানলাতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলাম।

মাঝ রাতে?

হ্যাঁ।

কেন? জানলাতে গিয়ে দাঁড়ালে যদি শোনা যাচ্ছিলো তো খাটে শুয়ে কি শোনা যেতো না?

খুব আস্তে চালানো ছিলো তো মিউজিক-সিস্টেমটা।

কাল ঘুম এলো না কেন তোর? হঠাৎ ইন্‌স্‌মনিয়া? ইচ্ছা-ইন্‌স্‌মনিয়া?

জানি না। তবে মনে হয়, ঝুম্‌কার হাটে হাঁটাহাঁটি করে ওভার-একসারসাইজ হয়ে গেছিলো। ওভার-একসারসাইজ হলে এরকম হয় অনেক সময়।

নে, চা খা।

দে।

বলে হাত বাড়িয়ে নিজের কাপটা নিলো কলি বিষন্নমুখে।
চা খেতে খেতে পর্ণা বললো, ঈশ্বর যা করেন তা ভালোর জন্যে।
কেন ?
কাল স্নিগ্ধবাবু আমাদের কেমন চার্জ করলেন দেখলি না ? ভাবখানা এমন যেন আমরা ওঁদের গলায় মালা পরাবার জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এই জন্যেই কারো ভালো করতে নেই। হোটেলে এসে উঠেছি, খাবো-দাবো বেড়াবো-টেড়াবো আর কাল তো ড্যাং ড্যাং করে চলেও যাবো। কী দরকার পরের উপকার করতে গিয়ে এতো ফ্যাচাং-এর ? তাছাড়া দ্যাখ, তোর কিন্তু ইমিডিয়েটলি বলে দেওয়াও উচিত ওদের।
কি বলে দেবো ? আর আমিই বা কেন ?
কী আবার ? দ্যাট আই অ্যাম আ ডিভোর্সি।
সো হোয়াট ? বুকে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বেড়ালেই হয় যে, আমি স্পিনস্টার আর তুই ডিভোর্সি। ডিভোর্সিরাও তো স্পিনস্টারই এক ধরনের। নয় কি ? তোর মাথার মধ্যে থেকে এই ডিভোর্স-এর ভূতটাকে তাড়া তো! আর যেন কারও ডিভোর্স হয় না! তুই একটা Bore হয়ে গেছিস।
পর্ণা এক চুমুকে চা-টা শেষ করে দিয়ে কিছু একটা বলতে গেলো কলিকে। কিন্তু না বলে, জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটি বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললো।
কী হলো আবার ? আরেক কাপ চা দিবি না ?
দিচ্ছি।
বলেই, পর্ণা চুপ করে গেলো।
লিকার ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে চামচে দিয়ে নেড়ে এগিয়ে দিলো কলির দিকে।
ভাবছিলাম, এখানে না এলেই ভালো করতাম।
কেন ?
এমনি। আমার এরকমই মনে হয়। কোথাও যাবার আগে মনে মনে কত আকাশ-কুসুম কল্পনা করি। ভাবি, এটা করবো, সেটা করবো, একেবারে নতুন মানুষ হয়ে ফিরে আসবো কলকাতাতে। রি-চার্জড, রি-বর্ন। কিন্তু বাইরে এলেই মনে হয়, দূর ছাই! কেন যে এলাম! আসলে, মনে যদি শান্তি না থাকে, আনন্দ না থাকে; তবে কিছু করলেই আনন্দ হয় না। সেই যে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে না ? 'পুষ্প বনে পুষ্প নাহি রে, পুষ্প আছে অন্তরে'—সেই আর কী!
যাঃ, আর কথা না বাড়িয়ে চানটা করে ফ্যাল। ব্রেকফাস্ট এলে আমি তাড়াতাড়ি খেয়েই বাথরুমে যাবো। আমাদের কিন্তু এখুনি একবার যাওয়া উচিত ছিলো। চান করে উঠে সেজেগুজে যাওয়ার দরকার কি ? নেমতন্ন খেতে তো যাচ্ছি না। রুগী দেখতে যাওয়া।
তা নয়। তবে সারাদিনের মতো তৈরী হয়ে নেওয়া যাবে এই আর কী। ভদ্রলোকের উপরে মায়া পড়ে গেছে। ভারী চমৎকার মানুষ কিন্তু। তাই না।

কে প্রণয় ?

পর্ণা কলির দিকে মুখ ফিরিয়ে ওর দুচোখে দুচোখ রেখে বললো, প্রণয় তো ভালোই ! সন্দেহ নেই কোনো। আজকালকার দিনে এমন সারল্য দেখা যায় না। সবসময়ে হাসছে, হাসাচ্ছে। তবে আমি স্নিগ্ধর দাদুর কথা বলছিলাম। তুই তা ভালো করেই জানিস।

নিশ্চয়ই।

কি নিশ্চয়ই ?

যে উনি ভালো মানুষ! লাইক গ্রান্ড-পা, লাইক গ্রান্ডসান !

চান করে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে ওরা যখন ওপরে গেলো, দেখলো, স্নিগ্ধ স্লিপিং-সুট পরেই বসে আছে বিধুভূষণের মাথার কাছে।

ওদের দেখেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বারণ করলো কথা বলতে। বসতে বললো ইশারাতে ঘরের সোফাতে।

ওরা গিয়ে বসতে না বসতেই সিঁড়িতে প্রণয়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। প্রণয়, ডঃ প্রসাদকে নিয়ে ঘরে এলো। সঙ্গে হন্সো। তার পেছনে ডাক্তারের দুই অ্যাসিসট্যান্ট। অক্সিজেনের সিলিন্ডার নিয়ে এলো কালিদা। গণশাদা নিয়ে এলো পোর্টেবল ই. সি. জি. মেসিনের বাক্স।

কলিরা উঠে দাঁড়ালো।

ডঃ প্রসাদের বেশ ইম্প্রেসিভ চেহারা। পঁয়তাল্লিশ মতো বয়স। কিছু প্রফেশানাল মানুষ থাকেন না ? ডাক্তার, উকিল, আর্কিটেক্ট যাঁদের দেখলেই মনে হয়, আর ভয় নেই, যাঁদের দেখলেই ভরসা হয় ; এঁর চেহারাও সেইরকম।

ডঃ প্রসাদকে নিজের চেয়ারটা ছেড়ে দিলো স্নিগ্ধ। নানাভাবে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। একজন অ্যাসিসট্যান্ট ই.সি. জি.-র মেশিনটা বাক্স থেকে বের করলেন। ডঃ প্রসাদ ই.সি.জি করলেন। তারপর নিজের ব্রিফকেস খুলে দু'রকমের ওষুধ বের করে প্লাস্টিকের সিরিঞ্জ দিয়ে আঙুল দিয়ে দিয়ে শিরা খুঁজে নিয়ে পর পর দুটি ইন্জেকশান দিলেন। স্নিগ্ধর দাদুর চোখের নিচে একবার দু'হাতের আঙুল দিয়ে কী পরীক্ষা করলেন। পায়ের গোড়ালির কাছে কী দেখলেন আঙুল দিয়ে টিপে টিপে। স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করলেন, হার্ট-এর বিট শুনলেন, তারপরই উঠে পড়ে স্নিগ্ধকে ফিস ফিস করে বললেন, বসার ঘরে চলুন।

পাশের বিরাট ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলেন উনি। ওরা সকলে দাঁড়িয়ে রইলো।

হন্সো আর পর্ণা রইলো বিধুভূষণের কাছে। এবং গণশাদাও।

কী দেখলেন ডঃ প্রসাদ ?

ডঃ প্রসাদ পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। হার্টে কিছু নেই। এখনও 'কোমাতে' আছেন। ওঁকে এখান থেকে রিমুভ করা দরকার।

অত্যধিক ড্রিঙ্ক করার জন্যেই হলো কি ?

নট .নেসেসারিলি। তবে তাতে প্রেসারতো অনেক বেড়ে যাবারই কথা।

সেরিব্রাল অ্যাটাক যে ঠিক কিসে হয় তা পিন-পয়েন্ট করে বলা মুশকিল। তবে বোঝেনই তো সেরিব্রাম থেকেই হয়। মস্তিষ্ক-ঘটিত ব্যাপার।

তারপর একটু থেমে বললেন, আমি টেল্‌কো হাসপাতালের ডঃ সরকারকে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি। নিয়ে গেলেই ভর্তি করে নেবেন। তাছাড়া রায়চৌধুরী সাহেবকে কে না চেনেন! আপনাদের টেলিফোনটা ঠিক থাকলে তো কথাই ছিলো না। দেখি, এখান থেকে চাঁইবাসায় যাবো। ওখান থেকেই ফোনে বলে দেবো'খন।

নিয়ে যাবো কিসে? ওঁকে? অ্যাম্বুলেন্স?

ফোন করুন অন্য কোথাও থেকে। গাড়ি দিয়ে প্রণয়বাবুকে পাঠান। অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলে দিচ্ছি আমার ক্লিনিকে। সেই অ্যাম্বুলেন্স-এ আমার জুনিয়রেরা সবরকম প্রিকশান নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবেন ওকে। বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে তো কিছুই বলা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে মাঝে মাঝে ইন্‌জেকশান দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই। ওয়াচ্‌-এ রাখতে হবে। এই 'কোমা'র স্টেজটা কাটিয়ে উঠলে তারপরই চিকিৎসা ভালো করে আরম্ভ করা যাবে। অ্যান্টি-কোয়াগুলেটর এজেন্টস্‌ অ্যান্ড ড্রাগস্‌ দেওয়া ছাড়া এক্ষুণি কিছু করণীয় দেখছি না।

হার্টে কিছু নেই তো?

নোঃ। হি হ্যাজ আ লায়নস্‌ হার্ট। হার্ট পারফেক্টলি অলরাইট।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন, আচ্ছা, উনি কোনো শক্‌-টক্‌ পেয়েছিলেন কি? ইন দ্যা রিসেন্ট পাস্ট?

কী শক্‌? মানে কিসের শক্‌?

স্নিগ্ধ জিগগেস করলো।

মানে, ধরুন, কোনো গ্রেট এক্সপেক্‌টেশান ছিলো কোনো ব্যাপারে? যে এক্সপেক্‌টেশান নিয়ে উনি খুব এক্সাইটেড ছিলেন, তা হঠাৎ মিথ্যে হয়ে গেলো, পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নির্মূল হলো। কেউ কোনো আঘাত কি দিয়েছিলো? কথায়-বার্তায় এও হতে পারে যে, কোনো একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে রাত দিন ভাবনা-চিন্তা করতে করতে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যা বাইরে থেকে বোঝা পর্যন্ত যেতো না। ভেতরে ভেতরে ওয়ার্ক্‌ড-আপ্‌ হয়েছিলেন?

কলি মুখটা নিচু করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দেখতে লাগলো।

স্নিগ্ধ একবার কলির দিকে তাকালো তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, একটা ব্যাপার ঘটেছিলো, দাদুকে যে-মানুষটি দেখাশোনা করেন, আমাদের গণশাদা, তিনি কিছু রূঢ় কথা বলেছিলেন ওঁকে।

কখন? কাল রাতেই কি?

হ্যাঁ। ন'টা নাগাদ।

ও। আই সী। এ ছাড়া অন্য কিছু?

নট, দ্যাট আই নো অফ্‌।

তবে কী জানেন, এখন এ নিয়ে আলোচনা না করে, ওঁকে অ্যাজ সুন

অ্যাজ পসিবল্ হসপিটালাইজ করা দরকার।

না নিয়ে গেলে হয় না? হাসপাতালে? মানে, যা যা দরকার সব এখানে নিয়ে-আসা যায় না? খরচার জন্যে চিন্তা করবেন না ডঃ প্রসাদ। দাদু নিজের ঘর, নিজের বারান্দা, বই-পত্র, গান-বাজনার রেকর্ড এসব ছাড়া গত পনেরো কুড়ি বছর একমুহূর্তের জন্যেও কোথাওই যায়নি। হি উইল ফীল লাইক আ ফিশ আউট অফ ওয়াটার। দোতলা থেকে নিচে পর্যন্ত নামেননি একবারও বেশ কয়েক বছর হয়ে গেলো।

আই ক্যান কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। কিন্তু ওঁকে ই. ই. জি. করানো এক্ষুণি দরকার তারপর ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিট-এ রেখে কনস্ট্যান্টলি মনিটরিং করা দরকার।

বাড়িতে কোনোক্রমেই হবার নয়? না?

স্নিগ্ধ হতাশ গলায় বললো।

ডঃ প্রসাদ বললেন, আই অ্যাম সরী বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। তবে সব যদি ঠিক থাকে, জ্ঞান আসার পর তখন পোর্টেবল্ ই. ই. জি. মেসিন সঙ্গে দিয়ে ওঁকে পাঠিয়ে দেবো। আমার জুনিয়র ডঃ চ্যাটার্জি থাকবেন এখানে। আমিও আসবো দুদিন পর পর। নাথিং টু ওয়ারী বাউট।

ইতিমধ্যে রামদয়ালবাবুকে উঠে আসতে দেখা গেলো সিঁড়ি দিয়ে। রামদয়াল হেমব্রম।

স্নিগ্ধ বললো, তুমি একবার এক্ষুণি যাও ভাই। দেখোতো শর্মাদের স্টোন কোয়ারীর ফোনটা কাজ করছে কি না। করলে…। করলে এই নাম্বারে ফোন করে…

কী বলবে, ডাক্তারসাহেব?

চ্যাটার্জি, তুমি বরং যাও ওঁর সঙ্গে। আমার গাড়িটা নিয়েই যাও। অ্যাম্বুলেন্সটা পাঠাতে বোলো। আর টেলকোর হাসপাতালেও একটা ফোন করে দিও।

ঠিক আছে। বলেই, রামদয়ালবাবু ডঃ প্রসাদের জুনিয়র ডঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে চলে গেলেন।

চা খাবেন না এককাপ?

প্রণয় বললো ডঃ প্রসাদকে।

খেতে পারি। ওনলি লিকার। একটু লেবু দিয়ে। নো-মিল্ক, নো-সুগার।

কলি ওঘর ছেড়ে বিধুভূষণের শোবার ঘরে চলে গেলো। হন্সো আর পর্ণা বসেছিলো সেখানে।

কলি বললো, আপনি খবর পেলেন কি করে?

দল্মা রিকশাওয়ালাকে সাইকেল দিয়ে পাঠিয়ে ছিলো দাদা। দেখুন তো! এখন ভালো হয়ে উঠলেই হয় মানে মানে।

কলি বললো, তাই তো!

পর্ণা ভাবছিলো, চিরদিন কি আর কেউই বেঁচে থাকেন? বিধুভূষণ তো

বাঁচার মতোই বেঁচে ছিলেন। আরও বাঁচা কিসের জন্যে? জীবিত থাকা আর বেঁচে থাকায় তো অনেক তফাৎ। যতদিন জীবিত থাকা যায় ততদিন বাঁচাই ভালো। একদিক দিয়ে ভালোই হলো। ওঁর ঐ ম্যাগনিফিসেন্ট অবসেশানের হাত থেকে ওরা দুজন অন্তত বেঁচে গেলো। পাগলের মতো করছিলেন বৃদ্ধ।

আজকাল তো সে যুগ নেই, কাউকে পছন্দ হলো আর অমনি নাত-বৌ করে ঘরে তুলে আনবেন। এখন প্রত্যেকটি মানুষই স্বতন্ত্র। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। বিয়ের মতো একটা সিদ্ধান্ত, একটা বয়স পেরিয়ে এসে, শিক্ষার একটি ধাপ পেরিয়ে এসে; অমন হুট করে এখন আর কেউই নিতে পারে না। কী পুরুষ, কী নারী!

পর্ণা ওরকম প্রায় হুট করেই একবার বিয়ে করে ফেলে এই কথার তাৎপর্য ভালো করেই বুঝেছে। বিয়ে করা ছাড়াও আজকালকার ছেলেমেয়েদের অনেক কিছুই করণীয় আছে। যারা কাজ করে, তারা তাদের কাজ নিয়েই এমন ব্যতিব্যস্ত থাকে যে অন্য কিছু করার কথা ভাবার সময়ই তাদের থাকে না। সে কারণেই বিয়ের ভাবনাটাও আজকাল বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। ঠাণ্ডা মাথায়, অসীম অবকাশে, নিভৃতে যে এই ভাবনা ভাববে, ভাবনাটা অত্যন্ত জরুরী বলে জানলেও; তার সময়ই করে উঠতে পারে না। তাছাড়া, হয়তো পর্ণারই মতো অগণ্য বন্ধুদের, সহকর্মীদের; বিয়ের পরেই ডিভোর্স করতে দেখে প্রত্যেকেরই মনে, বিশেষ করে মেয়েদের, একটা ভীতি জন্মে গেছে। 'হান্ড্রেড পার্সেণ্ট শিওর' হয়েই সকলে বিয়ে করতে চায় আজকাল অথচ বিয়ে ব্যাপারটাই এমন যে, তাতে কোনোকালেই সুখী হওয়ার 'হান্ড্রেড পার্সেণ্ট গ্যারান্টি' ছিলো না। থাকবেও না। সুখী আগেকার দিনের মানুষেরা হতেন, তার কারণ তাঁদের বিয়ে হতো অল্প বয়সে, একে অন্যর মনোমতো করে নিজেরা তৈরী করে নিতেন নিজেদের। অনেক চাহিদাকেই, দাম্পত্য সুখের জন্যে তাঁরা ছাড়তে তৈরী ছিলেন। অথবা, কথাটা রূঢ় শোনালেও বলতে হয় যে, সে যুগে সুখ কাকে বলে তাই জানা ছিলো না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, আত্মসম্মান, ব্যক্তিগত রুচি এসব অটুট রেখেও সুখী হওয়া যে কী ব্যাপার সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাও ছিলো না সেই সময়ে কারোই। বিশেষ করে, মেয়েদের। মেনে নেওয়া আর মানিয়ে-নেওয়টাই ছিলো সুখী হওয়ার সহজ ফর্মুলা। সেই অবস্থাটাই ভালো ছিলো, না আজকের অবস্থাটা; সে আলোচনাতে না গিয়েও বলা যায় যে, যুগ সত্যই পাল্টে গেছে, মানুষ পাল্টে গেছে। বিধুভূষণদের সরল জগৎ আর নেই। নিটোল, নির্মল, সরল পথে, অখণ্ড, অভগ্ন মানসিকতার জীবনে আর কোনো প্রাপ্তিই পাওয়ার উপায় নেই। পেলেও, তাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখার উপায় নেই আদৌ। এ বড়ই অস্থির, অশান্ত, দ্বিধাগ্রস্থতার, অনিশ্চিতির দিন। এ যুগের অন্ধ ঘেরাটোপ থেকে বিধুভূষণেরা যত তাড়াতাড়ি ছুটি পান তাঁদের পক্ষে ততই মঙ্গল। কিন্তু এতো কথাতো বিধুভূষণকে বুঝিয়ে বলা যেতো না। যেতো না বলেই ঐ সরলমতি, well-meaning সুন্দর বৃদ্ধকে দুঃখ দিতে না পেরে পর্ণা, কলি,

স্নিগ্ধ ও প্রণয় এক ধরনের দুঃখমেশা অসহায় হতাশার শিকার হয়েছে। সেই মিশ্র অনুভূতির বেড়াজাল পেরিয়ে নিজেদের নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে অক্ষত মনে বেরিয়ে আসাটা জরুরী জেনেও তারা কী করবে বুঝে উঠতে পারে নি; পারছে না।

অথচ একথাও খুবই সত্যি যে, কলির স্নিগ্ধকে খুবই ভালো লেগেছে। স্নিগ্ধরও কলিকে। পর্ণাকে ভালো লেগেছে প্রণয়ের। আর প্রণয়কে পর্ণার। সুবর্ণ আর প্রণয় দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। কে জানে কেন? প্রণয়কে এতো ভালো লেগে গেছে পর্ণার!

কিন্তু বিয়ে? সে যে এক বড়ই ঝুঁকির ব্যাপার। পুরো জীবনের ব্যাপার। সে যে তারের উপরে হাঁটার মতোই বিপজ্জনক। তাকে যতদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়, ততই মঙ্গল।

রামদয়ালবাবু ফিরে এলেন চ্যাটার্জির সঙ্গে। পর্ণা এবারে গেলো ওঘরে। অ্যাম্বুলেন্স এসে যাবে আধঘণ্টা পৌনে একঘণ্টার মধ্যেই।

কলি শুনতে পেলো, বেড়াল দুটো আবার কান্না শুরু করেছে বাগানে! ভাগ্যিস পর্ণা শুনতে পায় নি। কে জানে! হয়তো পেয়েছেও। কলির মনটাও কী দুর্বল হলো? আর দুর্বল মনই তো কুসংস্কারের জন্মদাতা!

ডঃ প্রসাদ ও অন্য জুনিয়র চলে গেলেন। ডঃ চ্যাটার্জি রয়ে গেলেন। যাওয়ার সময়ে বললেন, চাঁইবাসা হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁরা টাটায় পোঁছে বিধুভূষণকে অ্যাটেন্ড করবেন।

কী করে যে সময় যায়, বিশেষ করে অসুস্থ মানুষকে ঘিরে, মৃত মানুষের শোকে, তা বোঝা পর্যন্ত যায় না।

বিধুভূষণের পোশাক বদলে দেওয়ার সময় হলো। মেয়েরা সবাই নিচে নেমে গেলো। গণশাদাও বিধুভূষণের সঙ্গে যাবেন। ক্যাবিনেই থাকবেন। প্রণয় ও স্নিগ্ধও থাকবে বদলে, বদলে। রামদয়ালবাবুও বললেন, তিনিও থাকবেন। কারণ কলেজ খুলতে তিন-চার দিন দেরী আছে। কলেজ খুলে গেলেও ছুটি নিয়ে নেবেন তিনি। হুনসোও থাকবে।

এই সব শুনতে শুনতে কলির মনে হলো দূরের মানুষের পক্ষে অনেক সময় কারো কাছের মানুষ হবার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও তাড়াতাড়ি তা হওয়া যায় না। হওয়া উচিতও নয়। তাতে দুপক্ষেরই অস্বস্তি বাড়ে। যে সময় লাগে কাছের মানুষ হয়ে উঠতে, সে সময় দিতেই হয়। দেওয়া উচিত।

ওরা ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই অ্যাম্বুলেন্স এসে গেলো। ওপর থেকে স্ট্রেচার-এ করে বিধুভূষণকে নামিয়ে এনে যখন অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো তখন শুধু 'রায়চৌধুরী লজ'-এর মানুষেরাই নন, চিকনাডিহ্ গ্রামের বহু মানুষ, নিদপুরার বহু মানুষ এবং এমনকি 'মন্দার হোটেল'-এর অনেক বোর্ডাররাও অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে ভীড় করে দাঁড়ালেন এসে।

স্নিগ্ধর গাড়িটা প্রণয় নিয়ে এলো। ডঃ চ্যাটার্জি রয়ে গেছিলেন। তিনি, হুনসো এবং স্নিগ্ধ অ্যাম্বুলেন্সে উঠলেন। প্রণয়ের গাড়িতে গণশাদা এবং রামদয়ালবাবু। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের দরজা বন্ধ হলো তারপর ছেড়ে

দিলো ভ্যান। তার পেছনে প্রণয়ও স্টার্ট করলো গাড়ি । ওরা চলে গেলো ?

নিস্তব্ধ হয়ে গেলো পোর্টিকোটা। ভীড় পাতলা হয়ে গেলো। হঠাৎই আবিষ্কার করলো পর্ণা আর কলি যে, ওরা দুজনেই শুধু তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধ বিধুভূষণের জন্যে একটি চাপা অসহায় কষ্ট ওদের দুজনেরই বুকের মধ্যে ধামা-চাপা-দেওয়া কবুতরের মতো ঝট্‌পট্‌ করতে লাগলো।

বিধুভূষণকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময়ে স্নিগ্ধর সঙ্গে কলির একবার চোখাচোখি হয়েছিলো ।

মানুষের দুটি চোখ যে কী বিপুল অর্থবাহী তা কখনও কখনও বোঝা যায়। আর বোঝা যায়, তখন মনে হয় পৃথিবীতে মিছিমিছি এতো কথা বলাবলি হয় কেন ? মুখে কিছু না বলেও যদি দুটি চোখ দিয়ে এতো কথা বলা যায়, তবে কথা বলার দরকারই বা কি ?

স্নিগ্ধর দু চোখ যেন বলছিলো, দাদু চলে যাচ্ছেন। তুমি আসছো তো ? আমার, আপন বলতে আর কেউই রইলো না। তুমি থাকবে তো ?

কলির চোখ বললো, আমরা সবাই আসলে একাই। তবু, ভয় নেই কোনো। আমি আছি। অনেকে আছে। কেউ চিরদিন একা থাকে না, যদিও একাকীত্বই আমাদের শেষ গন্তব্য ! একমাত্র সঙ্গী।

প্রণয় কিন্তু পর্ণার দিকে তাকায়-টাকায় নি। কিছু মানুষ থাকেন সংসারে, যাঁরা কাজ হাতে পেলে বা কর্তব্যর মুখোমুখি হলে, জঙ্গলে ভালুকের মুখোমুখি পড়লে একজন মানুষ তাকে নিয়ে যেভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, তেমনই হয়ে পড়েন। ওর চোখ-চাওয়া, মজা করা, সবই অবকাশের সময়ে। কাজেরই মধ্যে থেকে ছুটিকে, দুঃখের মধ্যে থেকেই সুখকে ছিনিয়ে নেওয়ার শিক্ষা ওর এখনও হয়নি। তাই পর্ণার দুঃখ হলো ওর জন্যে। আবার সুখীও হলো ও প্রণয়ের কোনো কিছুতেই আসক্তি নেই বলে। কোনো কিছু না হলেও ; পর্ণাকে না হলেও ওর চলে যাবে। তরতাজা একটি মন, হিপ-পকেটে রাম-এর পাঁইট্‌, ডান পকেটে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই থাকলেই হলো। প্রণয়ের জীবনের দর্শন বোধহয় 'যানে দো কন্‌ডাক্টর'।

চারদিক সুনসান। নিস্তব্ধ পোর্টিকোর নিচে দাঁড়িয়ে প্রথমে কথা বললো কলি। নিচু গলাতে। কী করবি এখন ?

বলেই, সে নিজের শুকিয়ে যাওয়া গলায় জোর এনে বললো, জল খাবো।

তারপর ?

তারপর চল্‌ একটা রিকশা নিয়ে ঝিলটার দিক থেকে ঘুরে আসি। কালতো সকাল দশটাতেই ফেরার ট্রেন।

তাই চল্‌।

পর্ণা বললো।

বলেই বললো, বেড়াল দুটো আবার কাঁদছিলো। শুনেছিস ?

ইচ্ছে করেই ও সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললো, কই ? আমি তো

শ্রনিনি।

হ্যাঁরে। কাঁদছিলো। যখন আমরা দাদ্র ঘরে বসেছিলাম। আমি ড্রয়িং র্মে ছিলাম তখন ইন-ফ্যাক্ট।

তাই?

কলি বললো।

উনি আর ফিরবেন না।

আমি খ্শি হবো না ফিরলে।

কলি বললো। বলেই, এদিক-ওদিক তাকালো।

হাউ ক্র্য়েল অফ উ্য! এ কথা তুই কি করে বলতে পারলি?

আই হ্যাভ মাই 'রীজনস্। উনি তো দার্ণই বেঁচেছেন, যে-ক'দিন বেঁচেছেন। এখন দার্ণ-মরার সময় ওঁর।

বলেই, ভিতরের দিকে পা বাড়ালো, জল খাবে বলে।

পর্ণাও ওর সঙ্গে এগোলো।

জল খাওয়া হয়ে গেলে, পর্ণা বললো; আমার কলকাতায় ফিরে যেতে ভালো লাগছে না।

কেন?

অবাক হয়ে কলি শ্ধোলো।

মন-টন ভালো লাগছে না। একেবারেই ভালো লাগছে না।

ডোন্ট বী সিলী! আমরা বেড়াতে এসেছি। কাল চলেও যাবো। হোটেলের ম্যানেজারের দাদ্ অস্স্থ হয়ে পড়েছেন বলে আমরা আমাদের 'ওয়েলডিসার্ভড হলিডে'টাকে স্পয়েল করবো কেন? তুই সবকিছ্ বড় বেশি পার্সোনালি নিয়ে ফেলিস। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখ। ওঁরা আমাদের কে? একট্ আলগা দিতেও শিখিস নি?

আর তুই?

আমি কখনও জড়ালে, তবেই তো আলগা দেওয়ার কথা আসে?

তুই একটা হার্টলেস পার্সন। নইলে এক'নাম্বারের হিপোক্রিট।

যা ভাবিস, তাই। নিজের জীবনটা আমি নিজের ট্যাঁকেই রাখতে চাই। প্রোপ্রি নিজেরই কন্ট্রোলে। চারপাশে এতো মান্ষকে অন্যরকম দেখে আমি সাবধানী হয়ে গেছি খ্বই।

অন্যরকম মানে?

মানে, নিজের নিজের জীবন, তাদের নিজেদেরই অলক্ষ্যে কোমরে-গোঁজা র্মালেরই মতো অজানিতে পথে পড়ে গেছে আর তাই মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে তারা। কেউ বা পরে ব্ঝতে পেরে, পেছিয়ে এসে; তা তুলে নিয়েছে। কিন্তু তুলেই দেখেছে, পথের ধ্লো-কাদা, নোংরা, অন্যর হাতের ছাপ সব জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে সেই র্মালে। নিশ্চিতভাবেই ব্ঝেছে যে, তাকে আর ব্যবহার তো করা যাবেই না, এমনকি তা কোমরে গ্রঁজে পর্যন্ত রাখা যাবে না আর!

পর্ণা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললো, ব্ঝেছি। তুই আমার কথা বলছিস।

শুধু তোর কথাই কেন ? আমার চারধারে এমন অগণ্য মানুষকে দেখি। আমি তাদের মতো হতে চাই না। এতো দেখেও যদি নিজের চোখ না ফোটে তাহলে···।

তারপরই প্রসঙ্গ বদলে কলি বললো, চল্ চল্, বাইরে বেরোই। কাল রাতেও নতুন করে ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে আজকেও কেমন প্লেজেন্ট আছে দেখেছিস ওয়েদার ? কাল তো সকালে আর বেরোবার সময় হবে না। চল্ চল্।

তার চেয়ে চল্ বাগানে গিয়ে বসি। কোথায় যাবি আবার ?

ঝিল্-এর দিকে।

ওদের সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিলো।

তা তো আর হবে না।

চল্।

কোথায় ?

বাগানে।

মনটা খারাপ হয়ে গেছে বড়। আজই কোনো ট্রেনে ফিরে গেলে বেশ হতো। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন হয়ে গেলো।

পর্ণা বললো।

যাবো তো বটেই ! আমরা তো আর থাকতে আসিনি এখানে। তাড়া কি তোর অত ? কালকের টিকিট কাটা আছে, আজ গেলে তো সে টিকিট নষ্ট হবে। তাছাড়া ওদের দাদুর খোঁজ না নিয়েই···?

বাগানে ছায়া দেখে বসলো বেঞ্চে ওরা দুজনে।

কলি হাই তুললো মস্ত একটা।

তুলেই, হেসে ফেললো।

পর্ণা বললো, সত্যি ! যা খাওয়া আর ঘুম হচ্ছে না এসে অবধি ! ক'কিলো ওজন বেড়ে গেলো কে জানে !

তোর যত কথা ! কিলো কিলো ওজন যেন এতো তাড়াতাড়ি বাড়ে !

বাড়ে রে ! এই তো ক'দিন আগে বম্বে গেছিলাম। বাথরুমে ওজনের মেশিন ছিলো। পৌঁছেই ওজন নিলাম। তারপর ভাবলাম যে, তিনদিন স্ট্রিক্ট-ডায়াটে থাকবো, দেখি কত ওজন কমে ! কী বলবো তোকে, পুরো তিনদিন শুধুই গ্রীন স্যালাড আর লস্যি খেয়ে থাকলাম। আসবার দিন ওজন নিয়ে দেখি দেড় কে. জি. বেড়ে গেছি। এত্ত রাগ হলো। তখন মনে হলো, তার চেয়ে জম্পেস্ করে খেলেই হতো।

মেশিন নিশ্চয়ই খারাপ ছিলো।

কলি বললো।

কে জানে ! হতেও পারে।

আমার ঠাকুমা কী বলে জানিস ? বলেন, "রাখ্ ছেমরী, তদের যত্ত বাড়া-বাড়ি।" এতো বড় পৃথিবীতে বেঁটে মানুষ, রোগা মানুষ, মোটা মানুষ সকলেই না থাকলে পৃথিবী তো শ্রীহীন হয়ে যাবে। খোদার উপর খোদকারী করতে যাস না। তাতেই বিপদ। যার যেমন গড়ন তা নিয়েই সুখী থাকা

উচিত। মনে আনন্দ আর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মোটা রোগা সকলকেই সুন্দর দেখি আমি। সৌন্দর্য একটা অন্য ব্যাপার। ডায়েট করে করে চামড়া ঝুলিয়ে দিয়ে চোখের নিচে কালি ফেলে কী ছিরিই না খোলে! খবরদার ওসব করবি না। সবাই যা করে তা কখনোই করবি না। ঠাকুমা বলেন, 'শরীরের, মুখের ওরিজিনালিটিই হইতাছে গিয়া মানুষের হকল্ হম্পত্তির বড় হম্পত্তি। তরা, আজকালকার মাইয়ারা হেইটাই বোঝস্ না।'

পর্ণা হো-হো করে হেসে উঠলো কলির কথা শুনে।

বললো, তোর ঠাকুমা কিন্তু দারুণ ইন্টারেস্টিং মহিলা। এখনও কী চেহারা রে! মাথাভরা সাদা চুলের মধ্যে চওড়া সিঁথিতে দগদগে লাল সিঁদুর, আগুনের মতো গায়ের রঙ, কস্তাপাড়ের শাড়িতে দেখায় যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!

তা ঠিক। ঠাকুমা চলে গেলে একটা প্রজন্ম শেষ হয়ে যাবে। স্নিগ্ধর দাদু চলে গেলেও যেমন হবে। ওঁরা হলেন গিয়ে, লাস্ট অফ দ্যা মোহিকানস্।

ঠিক।

ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছিলো। পাতায় পাতায় ঝরঝরানি শব্দ উঠছিলো। আলো-ছায়া নাচছিলো ঘাসের উপরে। এক্কা-দোক্কা খেলছিলো, 'এই কুমির তোর জলে নেমেছি' বলেই, গাছের পাতা থেকে প্রতিসরিত আলোর ডোরাকাটা কাঠবিড়ালি ছায়া থেকে হঠাৎ-হঠাৎ সরে যাচ্ছিলো আবার ফিরে আসবে বলে। এই যাওয়া-আসা নাচা-নাচির মধ্যে কোনো বিশেষ ছন্দ বা তাল ছিলো না। এবং ছিলো না বলেই এই আন্দোলিত আলো-ছায়ায় ভরা বাগানের এক বিশেষত্ব ছিলো। ওরা দুজনে মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিলো সেদিকে। কী কথা বলছিলো যে, তাই ভুলে গেছিলো।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর কলি বললো, এই অবকাশ, এই কিছুই-না-করে বসে থাকার, আলসেমি করার; আরেক নামই তো ছুটি। তাই না? বার্টান্ড রাসেল-এর একটি বই আছে, পড়েছিস? 'ইন প্রেইজ অফ আয়ডলনেস।'

না।

কলকাতায় গিয়ে মনে করিয়ে দিস। তোকে দেবো পড়তে। আলসেমি যে কত দামী, তা বইটা পড়লেই বুঝবি। কতকিছুই যে থাকে আলসেমির গর্ভে!

বলেই বললো, তুই কিন্তু মাসীমাকে ফোন করলি না। রোজই যদিও, করবো করবো বলছিস।

সত্যি!

লজ্জিত হয়ে বললো, পর্ণা।

আজ যখন খেতে যাবো, মনে করিয়ে দিস। ভুলিস না কিন্তু। আজ করবোই করবো।

ঠিক আছে।

আমারও কেন জানিনা আজ সকাল থেকেই বাবার কথা মনে পড়ছে। বিশেষ

করে।

তাই?

পর্ণা বললো অন্যমনস্ক গলাতে।

তারপরই মনস্ক হয়ে বললো, কেন? শরীর কি খারাপ মেসোমশায়ের? বেড়াল ডাকছে বলে?

নাঃ! তোর এই বেড়াল-ডাকার প্রসঙ্গটা বন্ধ কর তো। সত্যিই আর ভালো লাগছে না।

তবে? কেন মনে পড়ছে, তা তো বলবি!

আসার আগে ভারী একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে আছে। বাবার মন হয় তো আমার মনের চেয়েও অনেক বেশি খারাপ। অথচ আগেকার দিনে যখন কুড়ি বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো তখন বাবা ও মেয়ের মধ্যে এমন কথোপকথন, বাদানুবাদের কথা ভাবা পর্যন্ত যেতো না।

কী হয়েছিলো কি?

না। একটা সামান্য ব্যাপার থেকেই···। খেতে বসে, খাবার টেবলে হঠাৎই রাজনীতি নিয়ে তর্ক উঠলো। তর্কে তর্কে বাবা হঠাৎ বললেন, 'আমার মতটা তো তোর মত নয়! তুই তো সবজান্তা হয়ে গেছিস। এতোদিন ধরে খাইয়ে পরিয়ে বড় করলাম, তোর কাছে এখন আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার দাম কি? তুই তো স্বয়ম্ভু। আমার কাছ থেকে শেখার তো কিছুই নেই? বই পড়েই সব জেনে গেছিস।'

তুই কি বললি?

আমি বললাম, সব বাবাই ছেলে মেয়েকে 'খাইয়ে পরিয়ে' বড় করে। কিন্তু কেউই তোমার মতো ব্র্যাগ করে না। দিস ইজ ইনটলারেবল্। তাছাড়া, ফর ইওর ইনফরমেশান, আমি এম. এ. পড়েছি নিজের স্বোপার্জিত টাকাতে। তোমার কাছ থেকে কিছু নিইনি। চাকরি করার পর থেকে তোমার সঙ্গে কোনো হলিডে'তেও যাইনি। তুমি মাকে নিয়ে দাদুকে নিয়ে গেছো।

কেন? যাসনি কেন? তুই তো প্রত্যেকবার বলেছিস তোর অফিস থেকে ছুটি পাবি না।

যাইনি, তুমি ফিরে এসে কথা শোনাবে বলে। হ্যান করেছি, ত্যান করেছি···

তুই বললি? মেসোমশায়ের মুখের উপর? এমন কথাটা?

বললাম। বাবা ঠাস্ করে আমাকে এক চড় মেরে দিলো যে।

চড়?

তবে আর বলছি কি?

পর্ণা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, মেসোমশাই আসলে মানতে রাজী নন যে, তুই বড় হয়ে গেছিস। আমার বাবাও আমাকে চিরদিনই ছোট ভাবতেন। যদি না এই···এই ডিভোর্সটা···এতেই আমি রাতারাতি বড়ই শুধু নয়, বোধহয় বুড়িও হয়ে গেছি।

কলি চুপ করেই ছিলো।

পর্ণা বললো, মেসোমশাই কতটা হার্ট হতে পারেন তোর এই কথাতে তুই অনুমানও হয় তো করতে পারিস না।

কলি দু কাঁধ শ্রাগ করে বললো, ক্যুড নট কেয়ারলেস্! আমিও কম হার্ট হইনি। আমি কিছু কেয়ার করি না। আমি স্বাবলম্বী। হাউস-রেন্ট অ্যালাউন্সও পাই। যথেষ্ট ভালো মাইনে পাই। পাঁচ মিনিটের নোটিস-এ চলে যাবো। পেয়িং-গেস্ট হয়েও তো থাকতে পারবো কোথাও, যতদিন না ফ্ল্যাট খুঁজে নিতে পারছি।

পর্ণা চুপ করে চেয়ে রইলো কলির মুখে। এই কলিকে ও চিনতো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, বিয়েই যখন করিসনি তখন আলাদা হয়ে চলে যাবার জন্যেই কি বাবা মা তোকে এতো বছর ধরে আগলে আগলে বুকে করে মানুষ করেছিলেন? এম. এ-টা না হয় নিজের খরচেই পড়েছিলি। তাতে কি সমস্ত অতীত মিথ্যে হয়ে গেলো?

আমার বাবা টাকা রোজগার ছাড়া আর কিছুই করেননি। নিজের বন্ধু-বান্ধব। বাড়িতে রোজ তুমুল-আড্ডা। মদের আসর। যা করবার তা আমার মা করেছেন। মা-ই আমার সব। আই হ্যাভ নো ফীলিং ফর মাই ফাদার। নো ফীলিং অ্যাট ওল। হি ইজ ডেড টু মী। ডেড অ্যাজ হ্যাম।

তুই বোধহয় ব্যাপারটা···ঠিক···

পর্ণা প্রতিবাদের গলাতে বলতে গেলো।

ইয়েস। ব্যাপারটাই ঠিক বুঝেছি। পুরোপুরিই ঠিক বুঝেছি। মানুষটার মুখের উপরে কথাগুলো বলা দরকার ছিলো। তখন যদি মুখটা দেখতিস। সবসময় ব্র্যাগিং করা স্ফীত-মুখটা চুপসে একেবারে শুকনো বেগুনের মতো হয়ে গেছিলো। কালো, বেগুনে আভা···

পর্ণা বিরক্ত গলাতে বললো, চুপ কর কলি। তুই এমন ভাবে বলছিস 'লোকটা' 'লোকটা' করে যেন রাস্তার কেউ, তোর বাবা, মানে, মেসোমশাই প্রসঙ্গে বলছিস না।

বলেছিতো। মিঃ পি. কে. ঘোষ আমার কেউই নন। আমার মা-ই সব। আই হেইট হিম!

তাহলে আর তাঁর কথা মনে করে দুঃখ পাচ্ছিস কেন?

দুঃখ পাবো কোন দুঃখে? যা সেন্টিমেন্টের বড়ি। সারা জীবনই তো মাকে জ্বালালো। আমাদের জ্বালালো। এখন ট্রামের তলায়, বা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আমাদের হাত-কড়া না পরায়। সেই জন্যেই চিন্তা। দুঃখ-ফুঃখ কিছু নেই আমার।

মেসোমশাইতো যথেষ্ট সাকসেসফুল মানুষ। তুই যে ভাবে মানুষ হয়েছিস আমি বা আমার মতো অনেকেতো তা ভাবতেও পারি না। তোর মতো মেয়ের তো বাবা সম্বন্ধে এতো অনুযোগ থাকার কথা নয়। মেসো-মশাইকে ট্রামে-বাসে করে যাতায়াত করতে দেখেছি কিন্তু তোদের বাড়ি কাছে হলেও সেই কে. জি ওয়ান থেকে তোকে তো কোনোদিন গাড়িতে ছাড়া যেতে-

আসতে দেখিনি। তোরও এতো অনুযোগ !

পুরুষমানুষকে সাকসেসফুল তো হতেই হবে। বিয়ে করেছেন, সন্তান হয়েছে, সাকসেসফুল না হলে চলবে কি করে ! সেটা আবার একটা ক্রেডিটের কিছু না কি ?

পর্ণা আর তক্‌রার করলো না। চুপ করে নিজের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা চটির মধ্যে ঘষতে লাগলো। এই কলিকে পর্ণা চিনতো না। এই কলিকে পর্ণার ভালো লাগলো না। মেসোমশাইয়ের মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ও নিজে ডিভোর্স করতে তার বাবার মুখে যে ব্যথা দেখে, যে ব্যথার কথা ভেবে ও নিজে ব্যথিত হয় ; সেই ব্যথার চেয়েও মেসোমশাইয়ের এমন কৃতি মেয়ের দেওয়া ব্যথা নিশ্চয়ই অনেক গভীর। কলি ওর ছেলেবেলার বন্ধু। কে-জি-ওয়ান থেকে দুজনে একসঙ্গে পড়ছে অথচ কখনও একমুহূর্তের জন্যেও ভাবেনি যে, কলির মধ্যে এমন একজন নিষ্ঠুর, দাম্ভিক মানুষের বাস।

কলি স্বগতোক্তি করলো, এবারে ফিরে কলকাতাতে, আমিও দেখিয়ে দেবো। বাবা বলে ডাকবো না পর্যন্ত, কথা বলবো না ; আর যত শিগগির পারি ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

আর মাসীমা ?

মা তার হ্যজব্যান্ডের সঙ্গে থাকবে ? শী ইজ স্টাক ফর লাইফ। আমি তো নই ! মাকে মাসে মাসে টাকা দিয়ে দেবো। পশ্চিমের দেশে কী হয় ? আমাদের মতো সারাজীবন কি মা-বাবা-কাকা-কাকী নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়ে থাকে ? দে এনজয় দেয়ার লাইভস। দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

আমাদের দেশে, অন্তত আমাদের প্রজন্ম পর্যন্ত যে মা-বাবারা আমাদের মুখ চেয়েই নিজেদের জীবন উপভোগ করতে পারে নি ! কত বাধা, কত বিপত্তি ; নিজেদের কতভাবে বঞ্চিত করে আমাদের 'মানুষ' করেছেন··· অবশ্য মানুষ আমরা হয়েছি কী না আদৌ তা জানি না।

পর্ণা এতোখানি বলতে গিয়ে হাঁফিয়ে গেলো। কথার দৈর্ঘ্যে নয়, কথার ভারে !.

ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ-এর সব জায়গাতে আঠারো বছর বয়সেই ছেলেমেয়েরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়। বাবা মার সঙ্গেই থাকে না। ইচ্ছেমতো 'ডেট' করে, ফ্রাইডে-নাইটে নাচতে যায়···। পার্সোনাল লাইফ বলে কিছু থাকে প্রত্যেকেরই।

তা ঠিক। একশোবার ঠিক। কিন্তু আমাদের দেশে আঠারো বছর বয়সেই কি আমরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠি ? তার সুযোগই নেই। আমার বয়স তিরিশ হতে চললো। আমি তো এখনও মা-বাবার সঙ্গেই থাকি। ডিভোর্স-এর পর তো আবার সেখানেই ফিরে গেছি। কই, আলাদা তো থাকিনি ! থাকতে পারিনি। শুধু ইকনমিক কারণেই নয়, নানারকম কারণে। মা-বাবাকে কাছে পায় না ওদেশের ছেলে-মেয়েরা, হয়তো কাছে চায়ও না ; তাকে তারা যে কী হারায় সেটুকুও কি তুই একবারও ভেবে দেখিস নি ?

না। তুই একেবারেই ব্যাক-ডেটেড, তোর ধ্যান-ধারণাতে। না হলে সামান্য কারণে সুবর্ণর মতো ভালো ছেলেকে ডিভোর্সও করতিস না।

পর্ণা হঠাৎ চোখ তুলে কলির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললো, অন্য কথা বল কলি। এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। তোর কথাতেই বলছি।

ওক্কে। আমার সময় বা ইচ্ছেও নেই তোর ব্যাপারে মাথা ঘামাবার।

উদ্ধত গলায় বললো কলি।
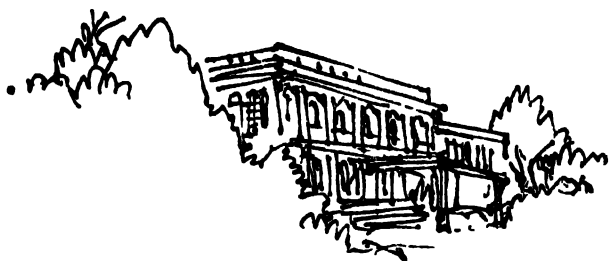
কাল পর্ণা আর কলি যখন ডাইনিং হল-এ ডিনার খাচ্ছিলো তখন প্রণয় ফিরলো গাড়ি নিয়ে। মুখ চোখ দেখেই বুঝেছিলো ওরা যে, সারাদিন খাওয়া হয়নি।

কেমন আছেন? উনি?

পর্ণা শুধিয়েছিলো।

ঐ রকমই। এখনো অজ্ঞান।

তাই?

কলি বলছিলো।

তবে অজ্ঞান হলেই যে কোনো মানুষের জীবন সংশয় হবেই তেমন কোনো কথা নেই। যদি তাই হতো, তবে তিরিশটা বছর আমার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব ছিলো। প্রণয় বললো।

ওরা হেসে উঠেছিলো প্রণয়ের কথাতে।

আমরা খুবই দুঃখিত। আপনাদের বোধহয় কষ্ট হলো খুবই আজ আমরা সকলেই এখানে না-থাকাতে।

কলি ও পর্ণার সঙ্গে যাঁরা খাচ্ছিলেন বসে ডাইনিং হল-এ তাঁরা সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন, না না। কষ্ট কিসের?

টেলকোর চ্যাটার্জি সাহেবও সপরিবারে বসে খাচ্ছিলেন কাল রাতে। ওঁরা সকাল ছ'টার ট্রেনে টাটাতে ফিরে যাবেন আজ। ওঁরা বললেন, কেন? কালিদা তো ছিলোই। তাছাড়াও কত জন! কোনোরকম কষ্টই হয়নি খাওয়া-দাওয়ার।

অন্য কিছুর?

না। অন্য কোনো কিছুরই নয়।

উনি বলেছিলেন।

আমি আবার হাসপাতালেই ফিরে যাবো আধঘণ্টা পরেই। স্নিগ্ধ আর গণিশাদা ওখানেই আছে। রামদয়াল আর হন্‌সোও আছে।

প্রণয় বললো।

কলিরা খেয়ে উঠে ঘরে বসে যখন স্যুটকেস গোছাচ্ছে তখন দরজাতে বেল বাজালো প্রণয়। তারপর ঘরে এসে বললো, এতো জনের সামনে বলতে পারিনি, কাল রামদয়াল ও হনুসোকে হাসপাতালে রেখে আমি আর স্নিগ্ধ আপনাদের সী-অফফ্ করতে আসবো। সোজাই স্টেশনে আসবো। কিন্তু কোনো-ক্রমেই কি আর ক'টা দিন থেকে যাওয়া যেতো না? দাদুর গেস্ট হয়ে? পয়সা দিতেও হতো না কিন্তু।

ওদের নিরুত্তর দেখে, প্রণয় বললো, তারপর স্টেশন থেকে আবার সোজা হাসপাতালে ফিরে যাবো। আমরা ফিরে গিয়েই রামদয়াল আর হনুসোকে পাঠিয়ে দেবো নিদপুরাতে, ট্যাক্সিতে। ওরাই এ-ক'দিন, মানে দাদু যতদিন ভালো না হচ্ছেন, 'মন্দার হোটেল' চালাবে। দাদুকে দেখাশোনা করতে গিয়ে হোটেল উঠেও যায়, তো যাবে। কী আর করা যাবে!

তা তো নিশ্চয়ই।

পর্ণা বললো।

একশোবার।

কলি বললো।

আমি চলি। বেরোতে হবে এখুনি।

এতো রাতে যাবেন? সাবধানে গাড়ি চালাবেন, বুঝেছেন!

কলি বললো, দাঁড়িয়ে উঠে।

ইয়েস ম্যাডাম। কোনো চিন্তা নেই। গাড়ির মালিক হলেই কি আর গাড়ি ভালো চালানো যায়? গাড়িটা আমি রাজাবাবুর চেয়ে ভালোই চালাই; আরও অনেক কিছুই ভালো করি। কিন্তু কী আর করা যাবে! জন্মেছিই প্রজার কপাল নিয়ে। এ-জন্মে রাজত্ব, রাজকুমারী, কিছুমাত্রই পাওয়ার যোগ্যতা হলো না শুধু সেই জন্যেই। আচ্ছা! চলি। জয় রাম্‌জীকি।

বলেই, হিপ্-পকেট থেকে থ্রী-এক্স রাম্-এর পাঁইট বের করে দেখিয়েই, আবার পকেটে ভরে ফেললো।

ওরা দুজনেই হেসে উঠলো।

পর্ণা বললো, আপনি কি কখনওই সীরিয়াস হতে পারেন না?

না ম্যাডাম। সেই এলাকা স্নিগ্ধ রায়চৌধুরীকে ছেড়ে দিয়েছি। সম্পত্তি ওর, দায়-দায়িত্ব, গোমড়ামুখ, সীরিয়াসনেস এসবও তো ন্যায্যত ওরই হওয়া উচিত। আমি প্রলেতারিয়েত্। রাজার খিদ্‌মদ্‌গার। দিন-আনা দিন-খাওয়া লোক। জয় রাম্‌জীকি!

এসব খেয়ে গাড়ি চালাবেন না কিন্তু। শুনছেন!

কী করবো! স্নিগ্ধ রায়চৌধুরীর গাড়িও যে তেমনই! শুধুই তেলে-মবিলে চলে না। ডেরাইভারের পেটেও পিটেল্ থাকা অবশ্যই জরুরী। চাই। আর কথা নয়।

যাওয়া নেই। আসুন।

কলি বললো।

সাবধানে যাবেন।

পর্ণা বললো।

ওকে। গুড নাইট।

প্রণয় চলে যাবার পরে ওরা টুকটাক গল্প করতে করতে স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়েছিলো। শুধু বাথরুমের জিনিস আর পরদিন সকালে পরে যাবার শাড়ি-জামা বের করে রাখলো। নাইটি ভরে দেবে সকালে চান করে ওঠার পর। আটটাতে ব্রেকফাস্ট খাবে বলে দিয়েছিলো। দুবেজীকে বিল-টিল ঠিক করে রাখতেও বলেছে। ব্রেকফাস্টের পরই সোজা স্টেশনে চলে যাবে। এই দুবেজীকে প্রথম দিন থেকেই দেখছে, নাম জানলো আজ সকালে, দাদুকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো যখন ওরা।

যেতে যখন হবেই তখন একটু আগে আগে যাওয়াই ভালো। টেনশান্ কলিই বেশি করে। ও যে এইরকম বাতিকগ্রস্ত, তা পর্ণা ওর সঙ্গে না বেরোলে জানতো না।

কলি নিজেই হাসতে হাসতে বলে, আমরা বাঙাল তো! ঠাকুমা বলেন, স্টিমারের ভোঁ আর ট্রেনের হুইসেল্ শুনলেই বাঙালরা ভাবে, তার ট্রেন বা স্টিমারই বুঝি ছেড়ে গেলো। ঘড়ির দিকে একবারও তাকায় না।

দল্‌মা রিকশাওয়ালাকেও বলে রেখেছে। দুজনের ছোট দুটি ব্যাগ। পায়ের কাছে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো কলির। পাখি ডাকছে নানারকম। বাগানে। আকাশ মেঘলা। ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছে একটা। এপ্রিলের গোড়াতে যে লাগাতার এতোগুলি দিনই এইরকম প্লেজেন্ট আবহাওয়া পাবে তা স্বপ্নেরও অতীত ছিলো। কী আলসে, কী অনাবিল অবকাশে যে কাটলো ক'টা দিন! ঘড়িকেও ছুটি দিয়ে দিয়েছিলো। চলে যেতে হবে ভাবলেই মন খারাপ লাগছে। আবার সেই কলকাতা। ধোঁয়া, ধুলো, চিৎকার! ট্রাম, বাস, মিনি, ট্যাক্সি। সেই কর্কশতা। সেই অফিস। সেই বাড়ি!

পর্ণা ঘুম থেকে উঠেই বললো, আমাকে তুলে দিলি না কেন? অদ্যই তো শেষ রজনী।

রজনী নয়; দিবস। চল্, চান করতে যাওয়ার আগে বাগানে একটু বসি গিয়ে। চলে যেতে হবে ভাবলেই আমার মনটা খারাপ লাগছে ভারী।

কী জানি! আমার তো ভাবতেই ভালো লাগে যে কলকাতাতে ফিরে যাচ্ছি।

প্রতিবারেই বাইরে থেকে ফেরার সময়ে যেই ট্রেনটা হাওড়া স্টেশনের কাছে আসে, হাওড়া ব্রিজ দেখা যায়! তখুনি আমার মনে হয়, আমার নিজের জায়গাতে এলাম। যতই অসুবিধে থাকুক, কলকাতা; কলকাতা।

এই সহজ আত্মতুষ্টির জন্যেই তো আমাদের কিছু হলো না।

যাকগে! না হলো তো না হলো। বেলটা দে। কালিদা এলে, বলে দে যে আজ বাগানেই চা দিতে। চল্, শেষবারের মতো রাজবাড়িতে একটু ঝুলনা ঝুলে নিই।

পর্ণা বললো!

কেন? শেষবার কেন? ইচ্ছে করলেই আবারও তো আসতে পারিস যখন তখন।

যেখানেই যখন-তখন আসা যায়, সেখানেই আদৌ আর আসা হয়ে ওঠে না। অংকটা খুবই গোলমেলে। বুঝেছো!

তা অবশ্য ঠিক।

ভেবেছি, একবার মা-বাবাকে নিয়ে আসবো। দ্রষ্টব্য স্থান কিছুই নেই অথচ রিল্যাক্স করার এমন জায়গা খুব কমই আছে।

তা কেন? বাড়িটাই তো দ্রষ্টব্য।

তাছাড়া, হোটেল তো পৃথিবীতে কতই আছে। 'মন্দার হোটেল'-এর মতো হোটেল, এমন ম্যানেজার আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোথায় পাবি?

কলি বললো।

বলতেই, নিজেরই মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ভাবলো, স্নিগ্ধরা যদি না আসতে পারে স্টেশনে? বিধুভূষণের যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয়? তবে হয়তো আর দেখাই হবে না। আর এখানে দেখা না হলে আর কোনোদিনও কি হবে? কলকাতার মতো জঙ্গল পৃথিবীতে কমই আছে। সেখানে মানুষ যেভাবে হারিয়ে যায় তা আর কোথাওই নয়। সেখানে কেউ হারিয়ে গেলে শত খুঁজলেও তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ইচ্ছে করে হারিয়ে গেলে তা কথাই নেই। যে জানে, সেই জানে।
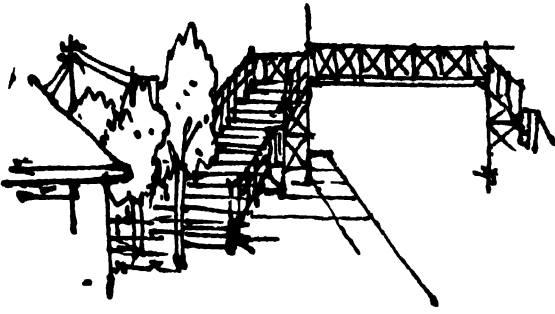
'মন্দার হোটেল' থেকে সকাল দশটার এই গাড়িতে কলকাতা ফিরছে শুধু ওরা দুজনেই। যদিও ছুটি আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ ফিরে গেছেন ভোবের গাড়িতে টাটা, খড়্গপুর, কী কলকাতা। কেউ ফিরবেন রাতের গাড়িতে যাতে কাল ভোরে পৌঁছে অফিস করতে পারেন।

দলমাকে পয়সা মিটিয়ে বকশিস দিয়ে ওরা ওয়েটিং-রুম-এ এসে বসলো। পুরো দিনের লম্বা হাতলওয়ালা ইজিচেয়ারে একজন মোটা-সোটা মহিলা বসেছিলেন। পাশে রুপোর পিকদানি, গাড়ু, হংসাকৃতি পানের বাটা। সঙ্গে সুবেশা প্রৌঢ়া আয়া। সম্ভবত বড় খানদান-এর বিহারী-মুসলমান পরিবারের। এই যুগেও এই 'রহিসী' দেখলে খুবই অবাক লাগে। মন খুশীতে ভরে যায়। যে-যাই বলুন, বুর্জোয়াদেরও ভালো বলতে এখনও অনেক কিছুই আছে।

ওয়েটিং-রুমটি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ছোট্ট স্টেশন বলেই হয়তো স্টেশন মাস্টারের হাতে এখনও কর্তৃত্ব আছে, নব্যযুগের ইউনিয়নের হাতে চলে যায়নি। যার যেটুকু কাজ, কর্তব্য, স্টেশনে এলেই বোঝা যায় যে, সেটুকু বিবেকসম্পন্ন হয়ে প্রত্যেকেই করেন। সব জায়গাতেই যদি এমন হতো কী ভালোই না হতো!

পর্ণা বললো, ভাঁড়ের চা খাবি?

আমার ভাঁড়ের মা-ভবানী। লিটারালি, কপর্দকশূন্য। তাছাড়া, এই তো ব্রেকফাস্টের পরই এক পট চা খেয়ে এলাম দুজনে।

তাতে কী! কী যে বলিস। স্টেশনে এসে, ট্রেনে চড়ে, ভাঁড়ের চা না খেলে চলে? তবে ছেলেবেলায় যেমন চা খেতাম তেমত এখন আর দেখা যায় না। নাকে এখনও সেই লাল-রঙা মোটা ভাঁড়ের গন্ধ আর বেশি-চিনি বেশি-দুধ দেওয়া চায়ের গন্ধ লেগে আছে।

ছেলেবেলাটাই যে হারিয়ে গেছে! সেই বেলার জিনিস এখন এই অবেলাতে পাবি কোথায়? যতই খুঁজিস না কেন! যা গেছে, তা গেছে।

দেখতে দেখতে সময় হয়ে এলো। প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেলো।

নিদপুরা স্টেশন এখনও বহুকষ্টে অতীতকে ধরে রেখেছে। প্লাটফর্মের উপরে বড় বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ। লাল, হলুদ, নীল ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলো। একটি রেল-এর টুকরো তার দিয়ে বেঁধে ঝোলানো আছে। নীল-উর্দিপরা রেলের কর্মচারী একটা লোহার টুকরো দিয়ে তাতে আঘাত করে ঘণ্টি দিচ্ছে। স্বপ্নের স্টেশনের মতো।

আজকাল তো সব খাকি উর্দি। এ নীল উর্দি পেলো কোথা থেকে? কে জানে!

কলি বললো।

চল্, ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওদিকের প্লাটফর্মে যেতে হবে তো!

হুঁ।

ওরা তাহলে আর এলো না।

হতাশ গলায় বললো পর্ণা।

কলি আর পর্ণা এদিক ওদিক তাকিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়লো। একজন লাল উর্দি-পরা কুলী দৌড়ে এলো। রিকশা থেকে নেমে নিজেদের ওভার-নাইটার আর মেক-আপ বক্স দুটি নিজেরাই বয়ে এনেছিলো। কিন্তু এখন কে জানে কী হলো, কুলী ব্যাগদুটি উঠিয়ে নিতে কুলীকে বারণ করলো না। নিদপুরার সকলকেই কিছু কিছু দিয়ে যেতে পারার মতো সুখ বোধহয় আর বেশি নেই। নিজেকেও দিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিলো। বিধুভূষণের হঠাৎ অসুস্থতাটাই সব কিছু গোলমাল করে দিলো।

কলি ভাবছিলো।

পর্ণা শুধালো, কী ভাবছিস রে?

নাঃ? এমনি। কিছু না।

এতো চুপচাপ হয়ে গেলি যে! হঠাৎ?

এই……।

ওরা যখন ওভারব্রিজে উঠছে তখন পর্ণা হঠাৎ বললো, ওই দ্যাখ, এসে গেছে ওরা।

কলি তাকিয়ে দেখলো, প্রণয় গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে ওভারব্রিজে উঠে আসছে আর স্নিগ্ধ গাড়িটা পার্ক করছে বাইরের মস্ত মহানিম গাছের ছায়াতে। মনটা খুশিতে ভরে গেলো।

তর্‌তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে প্রণয় ওদের দুজনের হাত থেকেই কেড়ে মেক-আপ বক্স দুটি নিয়ে নিলো। বললো, সরী। দেরি হয়ে গেলো আমাদের। হাসপাতাল থেকে বেরুতেই দেরি হলো।

আমরা তো ভাবলাম আর এলেন না! দাদু? দাদু কেমন আছেন?

পর্ণা বললো।

সেইটেই তো খবর!

কি?

ওঁর জ্ঞান ফিরেছে। তবে আমাদের সকলের খুবই অভিমান হয়েছে দাদুর উপরে।

কেন ?

চোখ মেলেই বললেন কি জানেন ?

কি ?

বললেন কই ? কলি কই ? পর্ণা মা ? হন্‌সো তো একদম ফায়ারই হয়ে গেছে দাদুর উপরে। দাদু বলেছেন, আপনাদের নিয়ে এখুনি হাসপাতালে যেতে। আপনাদের আজ কিছুতেই যাওয়া হবে না। কবে যাওয়া হবে সে-কথাও আমি জোর করে বলতে পারি না। চলুন, চলুন। নেমে চলুন ওভারব্রিজ থেকে। ওদিকে কেন যাচ্ছেন ম্যাডাম ?

প্রণয় অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললো।

কলির পা দুটি আটকে গেলো একবার। তারপরেই পা বাড়ালো।

ইতিমধ্যে স্নিগ্ধও এসে গেলো।

প্রণয়কে বললো, দাদুর কথা বলেছিস ?

এই তো বললাম।

ও। বলেছিস তাহলে ?

স্নিগ্ধ স্বগতোক্তি করলো। মনে হলো, একটু ব্যথিত গলায়।

আমি কিন্তু আপনাদের অত্যন্ত সীরিয়াস্‌লিই বলছি। দাদুও তাই বলেছেন। মানে, অত্যন্ত সীরিয়াস্‌লি। তাছাড়া, আপনারা কি বলুন তো ? একজন মৃত্যুপথ-যাত্রীর ইচ্ছের চেয়ে কলকাতা-যাত্রীর ইচ্ছেটাই কি বড় হবে ?

ওভারব্রিজের উপবে দাঁড়িয়ে দূরে দুচোখ মেলে কলি বললো, ওরকম করে বলবেন না প্রণয়। কত কী-ই তো করতে ইচ্ছে করে কিন্তু ক'টি ইচ্ছেই বা· ·। আমাদেরও বুঝি কষ্ট নেই ? কষ্ট কি সবই আপনাদের ?

স্নিগ্ধ বললো, এখানে দাঁড়ান। ট্রেন এলেই নামা যাবে।

ট্রেন ছেড়ে দেয় যদি ?

কলি ভয়ার্ত গলায় বললো।

মন্দার হোটেল-এর গেস্ট্‌দের না নিয়ে নিদপুরা স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লে রামখিলাওন পাঁড়ের টাকে যে-ক'টা চুল আছে তাও থাকবে না।

তিনি কে ?

স্টেশন-মাস্টার ! রাজাবাবু না বললে নিদপুরা স্টেশন থেকে কোনো ট্রেনই ছাড়তে পারে না। কী আপ্‌ ; কী ডাউন। আজও এই নিয়ম।

তাই ? রিয়্যালি গ্রেট !

পর্ণা বললো।

বলেই, বললো, আরে আমাদের ব্যাগ দুটো ? কুলী কোথায় গেলো ? কুলী ! কলি, তুই না একটা একনম্বরের কেবলি।

প্রণয় ওভারব্রিজের উপরে দাঁড়িয়েই হাঁক দিলো : আরে, এ শনিচ্চরা !

জী বাবু।

নিচ থেকে ওদের কুলীই সাড়া দিলো।

ফাস-ক্লাস। সমঝা, না ?

জী বাবু।
শনিচ্চর মানে?
পর্ণা শুধোলো।
শনিবার।
ওর নাম শনিবার।
হ্যাঁ। শনিবারে জন্মেছিলো, তাই।
স্নিগ্ধ পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজলো। তারপর হাওয়া আড়াল করে দেশলাই জেবলে সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, থেকে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, না? থাকতে পারলে, দাদুর ভালো হয়ে ওঠা নিয়ে আর আমাদের কোনো চিন্তাই থাকতো না।
কথা না বলে, কলি ওর চোখে চোখ রেখে শুধু মাথা নাড়লো। নেতিবাচক।
একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো কলির। ভাগ্যিস স্টেশনের হট্টগোলে স্নিগ্ধ তা শুনতে পেলো না।
হাসপাতালের ঠিকানাটা লিখে দেবেন একটু?
নিশ্চয়ই।
প্রণয় স্নিগ্ধর পকেটে হাত চালিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে উত্তর দিলো।
পর্ণা বললো, আপনারা কি প্রত্যেক গেস্টকেই এমনই সী-অফ্ফ কবতে আসেন স্টেশনে?
নেভার। নেভার। নেভার।
প্রণয় প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললো।
তবু আমাদের বেলায় এলেন যে?
বলেই বললো, কেন এলেন?
কলি ভাবছিলো, পর্ণাটা বড় বেশী কথা বলে। বিশেষ বিশেষ গভীর মুহূর্তে কথা না বলেই যে সব কথা বলা যায়, তা ও···
ঐ যে! ট্রেন আসছে। চলুন এবারে নামি ওভারব্রিজ থেকে!
সেকেন্ড বেল তো পড়েনি! পড়েছিলো কি? ট্রেন এসে গেলো কি করে?
পর্ণা বললো।
আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম তখনই সেকেন্ড বেল পড়েছিলো।
প্রণয় বললো।
সে কী? খেয়াল-করিনি তো?
হুঁ! এমন হওয়াটা আশ্চর্যর নয়। কখনও কখনও হয় এমন।
প্রণয় আবার বললো।
কখন?
নামতে নামতে পর্ণা শুধোলো।
মানুষ যখন প্রেমে পড়ে।

স্নিগ্ধ আর কলি হেসে উঠলো প্রণয়ের কথা শুনে। কিন্তু পর্ণা হাসলো না।

আমি অত সহজে প্রেমে পড়ি না।

পর্ণা বললো।

বুক-খোলা, সাদার উপর লাল-স্ট্রাইপের সস্তা একটি জামা, উস্কো-খুস্কো চুল, ডান হাতে একটি রুপোর বালা, সর্দারজীদের মতন ; বুক-পকেট থেকে ছোট চিরুনি উঁকি দিচ্ছে ; প্রণয় দুদিকে মাথা নেড়ে হেসে বললো, কে বলতে পারে ম্যাডাম ! উ্য কান্ট বী শ্যুওর। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কখন ধরা পড়ে, কে জানে ?'

কলি আবার হেসে উঠলো।

স্নিগ্ধও হাসলো। কিন্তু পর্ণা নয়।

ট্রেনটা আসছে। দেখা যাচ্ছে এবারে। সিগন্যালের লাল হাতটা সবুজ হয়েছে অনেকক্ষণ। তখনও সেই ঝিরঝিরে হাওয়াটা আছে। কৃষ্ণচূড়াদের ফিনফিনে পাতাদের মাথায় চিরুনি বুলিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে পাতাগুলি। ফুলে দোল খাচ্ছে। একটা বাঁক-নেওয়া লাইন দিয়ে দূরের মানুষের আর ধুলোর গন্ধ গায়ে মেখে খয়েরি ট্রেনটা হঠাৎই পুরো চেহারা দেখালো। তরপরই ঢুকে পড়লো প্লাটফর্মে।

টেলিগ্রাফের তারে এক জোড়া মসৃণ কালো-রঙা ফিঙে ঘন হয়ে বসে ছিলো। সেদিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যেটা হঠাৎ হু হু করে উঠলো কলির। জোরে শব্দ করে কেঁদে উঠতে চাইলো ভেতরটা। কিন্তু স্নিগ্ধর দিকে চেয়ে বললো, হাসপাতালের ঠিকানাটা······

ট্রেনটা এলে, ট্রেনে উঠে বসলো ওরা। প্রণয় ওদের সঙ্গে কামরাতে উঠে গিয়ে ওদের মেক-আপ বক্স দিয়ে এলো। মাল ঠিক করে রাখলো। তারপর নেমে এলো প্লাটফর্মে।

বিধুভূষণের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো একবার কলির। হাস-পাতালের ছবি।

স্নিগ্ধ তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেটে, হাসপাতালের ঠিকানা ; ক্যাবিন নাম্বার সব লিখে দিলো।

কুলী ডাকলা, মাইজী !

প্রণয় বললো, চাল্, হট শনিচ্চর। হাম দে দেগা। ইনলোগ হামলোগোঁকো মেহমান। ফিকার্ মাত করনা ?

একী ! একী !

পর্ণা প্রতিবাদ করে উঠলো।

সত্যি ! এতো কিছু দিলাম আপনাদের এ-ক'দিনে, প্রতি মুহূর্তে আর আপনারা শুধু কুলী-ভাড়াটুকু দেওয়াই দেখলেন ? আশ্চর্য !

প্রণয় বললো।

পর্ণা স্তব্ধ হয়ে গেলো।

মুখ নামিয়ে নিলো কলি।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, কলকাতাতে এলে অবশ্যই আসবেন কিন্তু। দুজনকেই বলছি। আর দাদু কেমন থাকেন না থাকেন জানাবেন। একটি পোস্ট কার্ড ফেলে দেবেন অন্তত।

মাথা নাড়লো স্নিগ্ধ। কলির চোখে চোখ রাখলো এক মুহূর্ত।

আর, ঠিক সেই সময়েই ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করলো।

কামরার জানালা দিয়ে হাত বের করলো ওরা দুজনেই। হাত নাড়লো।

কলি গলা তুলে বলতে গেলো, ভালো থাকবেন।

কিন্তু আওয়াজ বেরুলো না।

প্রণয় ওদের দুজনকেই স্যালুট করে বললো, জয় রামজীকি।

স্নিগ্ধ দাঁড়িয়েছিলো ট্রাউজারের দু পকেটে দুটি হাত ঢুকিয়ে; দুটি পা স্ট্যান্ড-অ্যাট-ইজ এর ভঙ্গীতে ছড়িয়ে দিয়ে।

পর্ণা শেষ মুহূর্তে কী যেন বললো। মুখ জানালার শিকএ ঠেকিয়ে। শোনা গেলো না কিছুই।

প্রণয় চলে-যাওয়া ট্রেনটির দিকে চেয়ে খুব নিচু গলায় বললো স্বগতোক্তির মতো; "দিন গিন্ গিন্ করু তেরা ইন্তেজার..."।

পাশে-দাঁড়ানো স্নিগ্ধও শুনতে পেলো না।

ট্রেনটা ক্রমশই দূরে, আরো দূরে চলে যেতে লাগলো। তারপর বাঁক নিলো আউটার সিগন্যালের কাছে গিয়ে, কৃষ্ণচূড়ার রঙের দাঙ্গা-বাঁধানো বনের মধ্যে। দেখা গেলো না আর।

হঠাৎই প্লাটফর্মটা বড় ফাঁকা হয়ে গেলো। রৌদ্রালোকিত; কিন্তু অন্ধকার। মানুষে-ভরা; কিন্তু খাঁ-খাঁ।

স্নিগ্ধ রায়চৌধুরীর বুকেরই মতো।